ahlussunnah-bd.blogspot.com

কাসাসুল আম্বিয়া

বা

নবীদের জীবনী

[১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে]

মূল : ইমাম আব্দুল গাফুর

অনুবাদ : অধ্যক্ষ মাওলানা আল মুমিন

কাসাসুল আম্বিয়া
বা
নবীদের জীবনী

[১ম ও ২য় খন্ড একত্রে]

মূল ঃ ইমাম আব্দুল গাফুর

অনুবাদ ঃ
অধ্যক্ষ মাওলানা আল মুমিন
বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বহু ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা

শামীম পাবলিশার্স
সৃজনশীল পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
শিকদার ম্যানশন ১২, বাংলাবাজার (নীচ তলা)
ঢাকা-১১০০।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ahlussunnah-bd.blogspot.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর– ২০০৫ ইং

প্রকাশক ঃ মোঃ শামীম

শামীম পাবলিশার্স, শিকদার ম্যানশন, ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল ঃ ০১৭১-৭০৬৮৯৬

কম্পোজ ঃ শাকিব কম্পিউটার, ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ রাজু আহমেদ

মুদ্রণে ঃ মডেল প্রিন্টিং প্রেস, ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ২৪০.০০ (দুই শত চল্লিশ) টাকা মাত্র।

Kasasul Ambia ba nabidar jibani
By - Mawlana Al-Momin

Published by- Samim Publisher's
Sikdar Manson 12, Banglabazar, Dhaka-1100.
Composed By : Shakib Computer
38 Banglabazar, Dhaka-1100
Print : Model Printing works-39 Banglabazar
© Publishers.
First Edition : Septembar-2005.

Price : 240.00 Taka. US-4.00 Only.

ISBN : 984-8666-01-X

ভূমিকা

পবিত্র কোরআনে নবীদের সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা একত্রিত করার কাজ শুরু করেছিলাম প্রায় এক বছর পূর্বে। এ কাজে হাত দেবার পূর্বে আমার ধারণাও ছিল না, এ কাজ কত কঠিন। কাজে হাত দিয়ে অনুভব করতে পারলাম, আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে এ কাজে হাত দেয়া মোটেও উচিত হয়নি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম রহমত দিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ রহমতেই আমি এ কাজ শেষ করতে পেরেছি। এ জন্য বিনয়াবনত চিত্তে উচ্চারণ করছি–আল হামদুলিল্লাহ।

শতকোটি দরুদ ও সালাম মানবতার মহান মুক্তির দূত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরে–যিনি সমস্ত নবী ও রাসুলদের মধ্যমণি এবং শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে যত নবী ও রাসুল এসেছেন, তাঁরা সবাই বিশ্বনবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর আগমনের সুসংবাদ সমকালিন জাতিকে প্রদান করেছেন। অতীতে আগমনকারী নবী ও রাসুলদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানার একমাত্র মাধ্যম হলেন তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কারণ তাঁর ওপরেই অবতীর্ণ হয়েছে পবিত্র কোরআন–যে কোরআনে রয়েছে নবী ও রাসুলদের কার্যক্রম সম্পর্কিত আলোচনা। মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করুন। মুসলিম জাতির ইতিহাস এবং পৃথিবীতে টিকে থাকার একমাত্র মাধ্যম হলো অতীতে আগমনকারী নবী-রাসুলদের শিক্ষার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলা। এ সম্পর্ক যখনই তাঁরা বিচ্ছিন্ন করেছে বা শিথিলতা প্রদর্শন করেছে, তখনই তাদের অবনতি শুরু হয়েছে। অতীতকাল জাতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তিই শুধু দান করে না, ভবিষ্যতের পাথেয় দান করে। ভবিষ্যতের চলার পথে দান করে নানাবিধ বাস্তব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত মহামূল্যবান জ্ঞান।

এ কারণেই পবিত্র কোরআন ও হাদীসে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও বহু প্রাচীন জাতির ইতিহাস বর্ণনা করে এবং সেসব জাতির জীবনধারা, সভ্যতা সংস্কৃতি, উত্থান-পতন ও কল্যাণ-অকল্যাণের হৃদয় স্পর্শী ঘটনা থেকে এক জীবন্ত নির্ভুল ইতিহাস–দর্শন গড়ে তুলেছে। আর এ কারণেই ইসলাম হয়েছে প্রতিটি যুগের প্রতিটি জাতির জন্য এক অতুলনীয় জীবন ব্যবস্থা ও আলোক মালায় সজ্জিত কল্যাণ পথের দিশারী। মানুষের কল্যাণকামী নেতৃস্থানীয় মানবদের নানা ধরণের শ্রেণী রয়েছে। এসব শ্রেণীর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক উন্নতমানের কল্যাণকামী নেতৃস্থানীয় শ্রেষ্ঠ মানবগণ হচ্ছেন আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসুলগণ। তাঁরা যে কোন ধরণের পাপ থেকে মুক্ত। যে কোন ধরণের ভুল ভ্রান্তির কালো স্পর্শ থেকে মুক্ত। যে কোন ধরণের অবাধ্যতা ও কলুষতা থেকে চিরমুক্ত। তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ, মহান কথা ও কাজ, সর্বোত্তম চিন্তা-চেতনা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তথা সমগ্র তৎপরতাই ছিল প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে শুধু ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্রই নন–গোটা মানব জাতির জীবনের প্রতিটি দিকের একমাত্র অনুসরণ যোগ্য নেতা। সমস্ত নবী-রাসুলই এই আলোকিত কাফেলার অগ্রপথিক, একই মূলনীত ও আদর্শভিত্তিক জীবন-দর্শন, জীবন ব্যবস্থার উদ্‌গাতা, মহান প্রচারক এবং একই বিশ্বাসের প্রবর্তক।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে যেসব নবী-রাসুল ও অনুসরণীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, আমরা সে আলোচনা একত্রিত করে নবীদের ইতিহাস বা আরবী ভাষায় যাকে বলা হয় তাযকেরাতুল আম্বিয়া–নাম দিয়ে উপস্থাপন করলাম। তাযকেরাতুল আম্বিয়া নাম শুনলেই বিজ্ঞ পাঠকদের মানস পটে ভেসে ওঠে রূপকথার কল্পকাহিনী সম্বলিত অদ্ভূত এক গ্রন্থের। আমরা এ গ্রন্থকে সেসব কল্পকাহিনীর স্পর্শ থেকে স্বযত্নে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। আমার ভাষা জ্ঞানের বড় অভাব। বিষয় বস্তু সাজিয়ে গুছিয়ে উপাদেয় করে পরিবেশন করার ক্ষমতা মোটেও নেই। এ কারণে পাঠকদের কাছে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে আবেদন করছি, কোন বিষয়ে যদি তথ্যগত কোন ভুল আপনাদের কাছে ধরা পড়ে, তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় পত্র মারফত অবগত করার জন্য অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সংস্করণে প্রকৃত ভুল ইনশাল্লাহ সংশোধন করা হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে নবী-রাসুলদের শিক্ষা অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

–মাওলানা আল মুমিন

ahlussunnah-bd.blogspot.com

মহান আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি	১৭
মানব মনের জিজ্ঞাসা ও নবীদের আগমন	১৮
নবীকে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা	২৫
নবী ও রাসুলদের প্রধান দায়িত্ব	২৭
প্রথম মানব হযরত আদম	৩১
আল্লাহর সামনে ইবলিসের যুক্তি	৩৩
আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আদম	৩৫
হযরত হাওয়াকে দায়ী করা অপরাধ	৩৯
পবিত্র কোরআনে হযরত আদম সম্পর্কে আলোচনা	৪৫
আল্লাহর নবী হযরত ইদ্রিস	৪৬
আল্লাহর রাসুল হযরত নূহ	৫৪
হযরত নূহের দীর্ঘ জীবন	৫৫
আল্লাহর নবী হযরত হুদ	৫৭
আল্লাহর নবী হযরত ছালেহ	৫৮
মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম	৫৯
হযরত ইবরাহীমের বংশ পরিচিতি	৬০
হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রার্থনা	৬৪
হযরত ইবরাহীমের আগমন কাল	৬৫
হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক মূর্তি ধ্বংস	৬৬
বাইবেলের বিকৃতি ও হযরত হাজেরা	৬৯
ইবরাহীম ও সন্তান ইসমাঈল	৭১
পিতা-পুত্রের প্রচেষ্টা-কা'বা নির্মাণ	৭৩
আল্লাহর নবী হযরত ইসহাক	৭৮
আল্লাহর নবী হযরত লূত	৮১
আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব	৮২
হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনীর পটভূমি	৮৪
ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র	৮৭

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বিষয়	পৃষ্ঠা

আমিই তোমার হারানো ভাই ইউসুফ ৮৯
হযরত শুআইব ও তার জাতি ৯৭
হযরত মুসার ইতিহাসের পটভূমি ১০০
শিশু মুসার লালন-পালন ১০৩
অনুতাপে নতশীর হযরত মূসা ১০৬
যেভাবে অলৌকিক লাঠিটি লাভ করলেন ১১০
আমি মুসার প্রভুকে দেখতে চাই ১১৮
হযরত মুসাকে হত্যার হুমকি ১২৪
হযরত মূসাকে কিতাব দান ১২৭
হযরত হারুণের প্রতি বাইবেলের অপবাদ ১৩৪
হযরত মূসা ও খিযির-এর ইতিহাস-আল্ কোরআন ১৪২
হযরত মূসার ইন্তেকাল ১৫৩
হযরত দাউদ ও সোলাইমান ১৫৪
আমি দাউদকে জবুর দিয়েছি ১৫৬
হযরত দাউদের ওপর মারাত্মক অপবাদ ১৫৯
হযরত সোলাইমান সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা ১৬৫
আল্লাহর নবী হযরত আইয়ুব ১৭২
আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস ১৭৬
শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো ১৭৮
হযরত যাকারিয়া হযরত ইয়াহ্ইয়া ১৮৪
হযরত লুকমান ১৮৮
মাতা-পুত্র গোটা পৃথিবীর জন্য নিদর্শন ১৯১
হযরত ঈসার পবিত্র জন্ম ১৯৩
পিতা ব্যতীতই হযরত ঈসার আগমন ১৯৫
শিশু কণ্ঠের কলকাকলী-আমি আল্লাহর নবী ১৯৯
জাতির প্রতি হযরত ঈসার আহ্বান ২০৩
হযরত ঈসা মানুষ ও রাসুল ছিলেন ২০৫

ahlussunnah-bd.blogspot.com

খৃষ্টানদের ধারণার তীব্র প্রতিবাদ	২০৬
ঈসা আলাইহিস সালামের অভিশাপ	২০৯
হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মোজেযাসমূহ	২১২
হযরত ঈসার রক্ষাকারী স্বয়ং আল্লাহ	২১৭
বিশ্বনবী ও হযরত ঈসার ঘোষণা	২২৮
বিশ্বনবীই শেষ নবী	২৩২
নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা আর নেই	২৩৪
দাজ্জালের আগমন-মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে	২৩৬
কাদিয়ানী প্রতারকের প্রতারণা	২৩৯

ahlussunnah-bd.blogspot.com

মহান আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি

পবিত্র কোরআনে এবং হাদীস শরীফে মহান নবী ও রাসুলদের সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হবার পূর্বে আমাদেরকে সর্বপ্রথমে মহান আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে সর্বপ্রথমে আমাদের সামনে যে প্রশ্ন দেখা দেয় তাহলো, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জানার মাধ্যম কি ? মানুষ হিসেবে আমাদের যে জ্ঞান আছে, এই জ্ঞান কি আমাদেরকে কোন নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনিত করে ?

এই প্রশ্নের সঠিক এবং একমাত্র জবাব হলো, না। মানুষের জ্ঞান হলো সসীম, এই সসীম জ্ঞান মানুষকে সকল বিষয়ে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনিত হতে সাহায্য করে না। মানুষের জ্ঞান মানুষকে ভুল পথেও পরিচালিত করে। মানুষের দৃষ্টি শক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। শ্রবণ শক্তি, অনুভব শক্তি, বাক শক্তি তথা সমস্ত শক্তিই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একজন মানুষ রেল লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালে অনেক দূরে সে দেখতে পায়, দু'পাশের রেল লাইন যেন এক হয়ে গিয়েছে। রেল লাইন আর দুটো নেই, একত্রে মিশে গেছে। আকাশের প্রান্তের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক দূরে আকাশ পৃথিবীর মাটির সাথে মিশে গেছে।

বিশাল জলধী সমুদ্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, শুধু পানি আর পানি। ওপার দেখা যায় না। ওপারে যে বৃক্ষ-তরু লতার অস্তিত্ব রয়েছে, জনবসতী রয়েছে, দৃষ্টি শক্তি তা অনুভব করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং মানুষের দৃষ্টি শক্তি মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত দান করতে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়।

মানুষের শ্রবণশক্তির অবস্থা আরো শোচনীয়। একত্রে পাঁচজন মানুষ যদি কোন শব্দ শোনে, পাঁচজন পাঁচ ধরণের মন্তব্য করে। প্রকৃত যে কিসের শব্দ, তা আড়াল থেকে অনুভব করা বড় কঠিন। মানুষের শ্রবণ শক্তিও মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে দেয় না বা ব্যর্থ হয়। মানুষের ত্বক, যা দিয়ে মানুষ স্পর্শ অনুভব করে, ত্বকও মানুষকে প্রকৃত সত্য অবগত করতে ব্যর্থ হয়। আড়াল থেকে একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ স্পর্শ করলে সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় চোখে না দেখে বলতে পারে না।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর যুগের একটি ঘটনা, আল্লাহর রাসুলের যাহের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নামক একজন বেদুঈন সাহাবী ছিলেন। রাসুলকে তিনি নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। তিনি মাঝে মাঝেই রাসুলের জন্য উপহার প্রেরণ করতেন। একদিন তিনি তাঁর এলাকা থেকে শহরের বাজারে এলেন কিছু জিনিষ বিক্রি করার জন্য। তিনি দাঁড়িয়ে জিনিষি বিক্রি করছেন, এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর পেছন দিক দিয়ে যেয়ে তাকে নিজের বুকের সাথে জাপটে ধরলেন।

হযরত যাহের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখতে পাননি কে তাকে জাপটে ধরেছে। তিনি একটু কঠিন কণ্ঠেই বললেন, 'এই কে ? ছেড়ে দাও বলছি।'

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তারপর দেখলেন, দুই জাহানের সম্রাট তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেছেন। তখন তিনি নিজের শরীরটা আরো বেশী করে নবীর শরীরের সাথে মিশিয়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কৌতুক করে লোকজনকে বললেন, 'তোমরা কি কেউ এই গোলামটি কিনবে ?'

হযরত যাহের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হাসতে হাসতে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! আমার মত মূল্যহীন গোলাম যে কিনবে সেই ঠগবে।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর কাছে তোমার মূল্য কিন্তু অনেক বেশী।' (সীরাৎ উন্ নবী)

হযরত যাহের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যদি অনুভব করতে পারতেন যে, তাঁকে যিনি অনুগ্রহ করে জড়িয়ে ধরেছেন, তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং আল্লাহর হাবিব। তাহলে তিনি অমন করে, 'এই কে ? ছেড়ে দাও বলছি' বলতেন না। অর্থাৎ দেখা গেল, মানুষের অনুভব শক্তি তথা ত্বক মানুষকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে দেয় না।

সুতরাং আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হলে নবী এবং রাসুল ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ মানব জাতির সামনে খোলা নেই। এ ব্যাপারে মানুষের বিবেক বুদ্ধিও রায় দেয়, ওহী জ্ঞান ব্যতীত প্রকৃত সত্য জানার আর কোন মাধ্যম নেই। আর ওহী জ্ঞান কোন নবী বা রাসুল ব্যতীত মানব জাতি লাভ করবে, সে উপায়ও নেই। মানুষের বিবেক কিভাবে রায় দেয়, এখন আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

মানব মনের জিজ্ঞাসা ও নবীদের আগমন

অলৌকিক কোন কিছু ঘটতে দেখলে মানুষ তার মূল রহস্য জানার জন্য কৌতুহলী হয়ে ওঠে। নতুন ধরণের কোন মেশিন দেখলে সে মেশিন কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে তা জানার জন্য মানুষ উদগ্রিব হয়ে ওঠে। বর্তমান এই শতাব্দীতে প্রতিটি দেশেই কম বেশী বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার হচ্ছে। কম্পিউটার কর্ম সম্পাদন করছে। ইয়ার কুলার, ফ্যান, টেলেক্স, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, লিফ্ট, বৈদ্যুতিক সিঁড়ি, ওয়ারলেস যন্ত্র ইত্যাদী ব্যবহার হচ্ছে।

গোটা পৃথিবীতেই এ সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। এ সমস্ত যন্ত্র কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে, এ সম্পর্কে আমাদের ভেতরে কোন দলাদলি নেই, কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু কেন দ্বিমত নেই ? কি কারণে দ্বিমত নেই ? কারণ আমরা অবগত আছি, কিভাবে এসব যন্ত্র কর্ম সম্পাদন করে। এ সমস্ত যন্ত্র ক্রয় করার সময় এর সাথে একটি অপারেটিং গাইড দেওয়া থাকে, আমরা তা পাঠ করলে বুঝতে পারি, কিভাবে এ সব যন্ত্র পরিচালিত করতে হবে এবং কোন পন্থায় এসব যন্ত্র বিদ্যুতের সাহায্যে, বা ব্যাটারীর সাহায্যে বা সৌর শক্তির সাহায্যে পরিচালিত হবে।

যদি এসব মেশিনের কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা না থাকতো, তাহলে কি ঐ সমস্ত মেশিনের কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সমস্ত মানুষ একমত হতে পারতাম ? অবশ্যই একমত হতে পারতাম না। আমরা নানাজনে নানা মতামত পেশ করতাম। ফলে আমাদের ভেতরে নানা দল উপদল সৃষ্টি হত।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কারণ, মেশিনগুলো কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে, তার কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকতো, তখন আমাদের মনে একটা বিরাট বিস্ময় সৃষ্টি হত, সেই সাথে মন অস্থির হয়ে উঠতো। মেশিনসমূহ কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে, এ রহস্য অনুসন্ধানে মানুষ এগিয়ে যেত, মানুষ বিভিন্ন ধরণের মতামত পেশ করতো, নানা রকমের অনুমান করতো এবং এই ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

বর্তমান পৃথিবীতে যত যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, এসব যন্ত্র কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে, কোথেকে এসব যন্ত্র শক্তি লাভ করে, আসুন আমরা ক্ষণিকের জন্য মেনে নেই যে, আমরা এসব সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমরা শুধু দেখছি, আমাদের দৃষ্টির সামনে এসব যন্ত্র বিভিন্নভাবে তাদের কর্ম সম্পাদন করছে। কিন্তু কিভাবে, কোন শক্তিতে করছে, আমরা তার কিছুই জানিনা। টেলিফোন কিভাবে কাজ করে, টেলেক্স কিভাবে কাজ করে, মোবাইল ফোনে কিভাবে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে কথোপকথন করা যায়, টেলিভিশনে কিভাবে সমস্ত কিছু জীবন্ত দেখা যায়, কথা শোনা যায়, ছাপাখানার মেশিনগুলো কিভাবে কাজ করে, মাথার ওপরে ফ্যান কিভাবে ঘোরে, বৈদ্যুতিক আলো কিভাবে জ্বলে, বৈদ্যুতিক সিঁড়ি কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে, লিফ্‌ট কিভাবে ক্ষণিকের ভেতরে ৫০ তলায় পৌছে যায়, বিভিন্ন ধরণের ণঢধডটফ অর্ড্ররলবণর্ভ মেডিকেল যন্ত্রসমুহ কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে, আমরা তার কিছুই জানিনা। আমরা শুধু অবাক বিস্ময়ে এসব মেশিনের অলৌকিক কর্মকান্ড দেখছি।

অবস্থা যদি এমনই হত, তাহলে এই পৃথিবীর মানুষের অবস্থা কি হত ? মানুষতো নানাজনে নানা রকম মতামত পেশ করতো। একদল মানুষ বলতো, এসব মেশিন স্বয়ংক্রিয়। প্রয়োজন মত এসব মেশিন স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে, কর্ম সম্পাদন করে পুনরায় আবার তা বন্ধ হয়ে যায়। এ সমস্ত মেশিনের পেছনে কোন শক্তিই ক্রিয়াশীল নেই। আরেক দল মানুষ তাদের ধারণা ব্যক্ত করতো যে, এসব মেশিনের গঠন প্রকৃতির ভেতরেই তাদের কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা নিহিত রয়েছে। এ কারণেই তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম। এক সময় এই ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবে, তখনই ঘটবে মহাপ্রলয় বা ধ্বংস। কিছু মানুষ আবার এই ধারণা পেশ করতো যে, একজন স্রষ্টা এসব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। তিনি হাজার হাজার দেবতা সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা প্রতিটি দেবতাকে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেছেন। স্রষ্টা বর্তমানে অবসর ভোগ করছেন। এ সমস্ত মেশিনের পেছনে একজন করে দেবতা রয়েছে। তারা প্রয়োজন মত এসব মেশিন দিয়ে কর্ম সম্পাদন করাচ্ছেন।

আরেকদল মানুষ এসব মেশিনের কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন কুল কিনারা করতে না পেরে হতাশ হয়ে বলতো, এসব কিছুর লীলা খেলা বুঝতে পারা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং এসব মেশিনের কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়া মানুষের জন্য বোকামী ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানুষের কাজ হলো, মেশিনগুলো থেকে উপকৃত হওয়া। প্রতিদিন মেশিনগুলোর সামনে হাত জোড় করে সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। মেশিনগুলোর পেছনে কোন স্রষ্টা আছে কি নেই, এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা ঠিক নয়।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

অর্থাৎ এ ধরণের প্রতিটি দলের ধারণা অনুমান বিশ্বাস এবং চিন্তাধারার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রকৃত সত্য বলতে কিছুই নেই। মেশিনগুলো কিভাবে কর্ম সম্পাদন করছে, এ জ্ঞান তাদের নেই। এ কারণে তারা নানা মত আবিষ্কার করেছে। তাদের এই আবিষ্কারের পেছনেও কোন সত্য নেই। সবই তাদের ভ্রান্ত কল্পনা মাত্র। মনে করুন, এই ভ্রান্ত কল্পনার ওপরে নির্ভর করে যুগের পরে যুগ, শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরে এই মানব গোষ্ঠী মত বিরোধে লিপ্ত রয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ করে একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটলো। একজন ব্যক্তি এসে হঠাৎ করে দাবী করলো যে, তোমরা এসব মেশিনগুলো সম্পর্কে যে মতামত পেশ করছো। তোমাদের সবার মতামত ভুল। কারণ যেখানে এসব মেশিন প্রস্তুত করা হচ্ছে আমি সেখানে দেখে এলাম, কিভাবে এসব মেশিন প্রস্তুত করা হচ্ছে। যিনি এসব মেশিন আবিষ্কার করেছেন, তিনি কিভাবে এসব পরিচালনা করছে, আমি তা দেখে এসেছি। তোমরা যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলতে দেখছো, একজন সুদক্ষ কারিগর তোমাদের চোখের আড়ালে বিশেষ একস্থান থেকে এসব কিছুই পরিচালিত করছেন।

এই ব্যক্তি তাঁর দাবীতে অটল রইলেন। মানুষ তাঁর দাবী গ্রহণ করলো না। তারা তাদের বিভিন্ন বিশ্বাসে অটল রইলো। প্রত্যক্ষদর্শীর দাবীকে তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো। শুধু তাই নয়, মানুষ তাঁকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা শুরু করলো। গোটা দেশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেল। তাঁকে শারীরিকভাবে প্রহার করা হলো, সমাজের সর্বস্তরে তাঁকে অপমানিত লাঞ্ছিত করা হলো। তাঁকে বাড়ি-ঘর ছাড়া করা হলো। তাঁকে দেশ থেকেও বহিষ্কার করা হলো।

তাঁর ওপরে মানুষ নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দিল। কিন্তু তিনি তাঁর দাবীতে অটল রইলেন। সমস্ত বিপদ নির্যাতন তিনি হাসি মুখে বরণ করে নিয়েও তিনি তাঁর দাবী মানুষের সামনে পেশ করতে থাকলেন। মানুষ তাঁকে তাঁর দাবী প্রত্যাহার করার জন্য ভীতি প্রদর্শন করলো, লোভ লালসা দেখালো, নির্যাতন করলো, অবশেষে তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়ে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করলো, তবুও তিনি তাঁর দাবী হতে সামান্য বিচ্যুত হলেন না। তাঁর দাবীর সপক্ষে তিনি নানা ধরণের প্রমাণ পেশ করতে থাকলেন। তিনি তাঁর সমস্ত আচার আচরণ দিয়ে, কথা বার্তা দিয়ে, তাঁর কার্যাবলী দিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, তিনি তাঁর দাবীতে পাহাড়ের মতই অটল রয়েছেন।

এই দাবী করতে করতে এক সময় তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। আবার দীর্ঘ দিন পরে আরেক ব্যক্তি এসে ঐ পূর্বের লোকটির মত একই দাবী করতে থাকলো। অথচ এই দুই ব্যক্তির ভেতরে কোন সময় দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। প্রথম ব্যক্তির ইন্তেকালের বহু দিন পরে পরবর্তী ব্যক্তি পৃথিবীতে এসে প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ দাবী পেশ করতে থাকলো। মানুষ এই দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথেও একই আচরণ করলো, যেমন তারা প্রথম ব্যক্তির সাথে করেছিল।

এভাবে একদিন এই ব্যক্তিও ইন্তেকাল করলো। দীর্ঘদিন পরে আরেক ব্যক্তি এলেন। তিনিও ঐ একই দাবী দৃঢ়তার সাথে পেশ করলেন। তিনিও নির্যতিত হলেন। এভাবে এই দাবীদারদের আগমন ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকলো। এদের সংখ্যা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বৃদ্ধি হতে হতে এক সময় লক্ষাধিক হয়ে গেল। তাঁরা সবাই ঐ প্রথম ব্যক্তির অনুরূপ দাবী করতে থাকলেন। প্রথম ব্যক্তি যে শব্দে দাবী পেশ করেছিলেন, শেষের ব্যক্তিও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ঐ একই শব্দে দাবী পেশ করলেন। স্থান কাল অবস্থার পার্থক্য ছিল, পরিবেশের পার্থক্য ছিল তবুও তাদের দাবীর মধ্যে সামান্য পার্থক্য সূচিত হলো না। দেশের সমস্ত লোকজন তাঁর সাথে শত্রুতা করলো। তাঁকে পাগল, যাদুকর, মিথ্যাবাদী ইত্যাদী বিশেষণে বিশেষিত করলো। তাঁর দেহের রক্ত মাংশ ছিন্ন বিছিন্ন করলো। নানা ধরণের লোভ দেখালো। তবুও তিনি বা তাঁরা তাদের দাবী হতে সরে দাঁড়ালেন না অথবা তাদের দাবীর মধ্যে কোনই পরিবর্তন আনলেন না। তাদের ভেতরে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেখা দিল না।

পৃথিবীর কোন শক্তিকেই তাঁরা পরোওয়া করলেন না। সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে, তাঁর প্রাণ হরণ করার জন্য ওৎ পেতে থেকেছে। তাঁকে দেশের বাদশাহ বানানোর প্রস্তাব দান করেছে। শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী তাঁকে ভোগের জন্য দিতে চেয়েছে। সম্পদের পাহাড় এনে তাঁর পায়ের কাছে জমা করেছে। তবুও তাঁরা তাদের দাবী হতে এক চুল এদিক ওদিক হননি। গোটা পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে তাদের মানসিক দৃঢ়তা অবলোকন করেছে। দেখেছে তাদের অসীম ধৈর্য। তাঁরা সবাই এই দাবী করেছেন যে, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই।'

আর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হলো, যারা এই দাবী করতেন, তাঁরা সে সমাজের সমস্ত দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কোন মানুষ কোনদিন তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে দেখেনি। কোন ধরণের দুষ্কর্মের সাথে তাঁকে কেউ কোনদিন সামান্যতম জড়িত হতে দেখেনি। কোন নারীর প্রতি তাঁকে কেউ কখনো খারাপভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখেনি। কারো আমানতের সামান্য খেয়ানত করতে দেখেনি। তিনি কারো সাথে কোনদিন অন্যায় আচরণ করেছেন, তা কেউ দেখেনি। তিনি অপরের দ্রব্য চুরি করেছেন, এমন ঘটনা কোনদিন ঘটেনি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সে সমাজের সবচেয়ে চরিত্রবান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। তাদের একজনের সাথে আরেক জনের দেখা সাক্ষাৎও হয়নি যে, তাঁরা পরস্পর পরামর্শ করে মানুষের কাছে একই দাবী পেশ করবে।

তিনি কোন সময় অসংলগ্ন কোন কথা বলেছেন, তা কেউ কোনদিন প্রমাণ করতে পারেনি। এক কথায় তিনি ছিলেন সবদিক দিয়ে কলুষমুক্ত। তাঁর মত সুন্দর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে সমাজে কেউ ছিল না, এ কথা তাঁর প্রাণের শত্রুগণও স্বীকার করতো। তিনি এমন সব কথা বলতেন, এমন শিক্ষা মানুষকে প্রদান করতেন, এমন ধরণের আইন কানুন মানুষের সামনে পেশ করতেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন মানুষ উপস্থাপন করতে পারতো না। গোটা পৃথিবীর বিখ্যাত জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীগণ তাঁর শিক্ষা ও বিধান সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সামনে দুটো দল বর্তমানে আছে। একটি দল হলো, পরস্পর বিরোধী চিন্তার অধিকারী দল। কিন্তু তাদের ভেতরে চিন্তা ও মতামতের পার্থক্য বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই ঐ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একজোট

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হয়ে বিরোধীতা করছে, যিনি বা যারা বলছেন, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই।'

আরেকটি দল হলো, সে সমাজের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী এবং ব্যক্তির দল, যিনি বা যারা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দাবী করছেন, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই।'

এই দুটো দলের ভেতরে কোন দল মহাসত্যের ওপর অবস্থান করছে, এই বিচার করবে কে ? পৃথিবীর বুকে এমন কোন আদালত বর্তমানে রয়েছে, যে আদালত এই দুই দল অর্থাৎ নবীদের বা রাসুলদের দল এবং তাদের বিরোধীতাকারী দল, এই দুই দলের যাবতীয় কার্যাবলী সামনে রেখে রায় দেবে অমুক দল মহাসত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ?

হ্যাঁ, সেই আদালত বা বিচারক হলো মানুষের বিবেক আর বুদ্ধি। এই বিবেক বুদ্ধির আদালতে উভয় দলের মোকদ্দমা পেশ করে তারপর বিচার করে দেখতে হবে, কোন দল সত্য। কিন্তু তাঁর পূর্বে বিচারক হিসেবে বিবেক বুদ্ধির দায়িত্ব হলো, সর্ব প্রথমে সে নিজের অবস্থা অনুধাবন করবে। কেননা, স্বয়ং বিচারক অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধির অবস্থা হলো, তাঁর কাছেও প্রকৃত সত্য জানার কোন মাধ্যম বর্তমানে উপস্থিত নেই। বিচারক বা বিবেক বুদ্ধি স্বয়ং সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। বিচারকের সামনে শুধুমাত্র উভয় পক্ষের অর্থাৎ নবী রাসুলদের এবং তাদের অস্বীকারকারী দলের যুক্তি প্রমাণ, বক্তব্য, তাদের নৈতিক চরিত্র, সামাজিক চরিত্র, জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি ও কিছু নিদর্শন রয়েছে।

এসবের প্রতি বিচারক সুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এ সমস্ত দিক বিস্তারিত পর্যালোচনা করে তাকে দেখতে হবে, এই দুই দলের ভেতরে কোন দল সত্যের কাছাকাছি অবস্থান করছে বা কোন দলের দাবী সত্য অথবা কোন দল সত্য হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত বিবেক বুদ্ধি নামক বিচারককে গ্রহণ করতে হবে।

বিচারককে প্রথমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে ঐ দলের প্রতি, যেদল বিরোধীতা করছে। সে দলের অবস্থা কি ? সে দলের অবস্থা হলো, তারা যে সত্য বিশ্বাস করছে, তাদের বিশ্বাসের ভেতরে একতা নেই। তাদের বিশ্বাস নিয়ে তারা বিভক্ত। নবীর সাথে বিরোধীতার ব্যাপারে তারা একজোট হলেও তারা নিজেরা নিজেদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা বিভিন্ন পথ ও মতের অনুসারী। তারা নিজেরাও স্বয়ং স্বীকার করছে যে, প্রকৃত সত্য জানার কোন মাধ্যম তাদের কাছে নেই। তারা পরস্পরে শুধু এ দাবী করছে যে, তোমাদের তুলনায় আমরা অধিক সত্যের অনুসারী। আমরা যে অনুমান করছি, আমাদের অনুমান তোমাদের অনুমান অপেক্ষা শক্তিশালী। বিবেক বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটা সামনে রাখতে হবে।

তাদের বিশ্বাসের প্রতি তারা অটল নয়। তাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তারা ততই নিজেদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। নিজেরা নিত্য নতুন মত ও পথ আবিষ্কার করছে। ক্ষণে ক্ষণে তারা তাদের মত পরিবর্তন করছে। কোন একটি বিশ্বাসের ওপর তারা অটল থাকছে না। তারা আজ যে বিশ্বাস নিয়ে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

উল্লসিত হচ্ছে, পরের দিন তা পরিত্যক্ত ঘোষনা করে নতুন মত গ্রহণ করছে। বিবেক বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটা সামনে রাখতে হবে।

'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই।' এই দাবীর দাবীদার নবীদের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান গ্রহণ করেছে, তাদের যুক্তি হলো, নবী যে দাবী করছেন, তিনি তা দেখে এসেছেন, উক্ত মেশিনগুলো একজন পরিচালিত করছেন, কিন্তু তিনি কিভাবে পরিচালিত করছেন তা নবী দেখাতে পারেননি। টেলিফোন কিভাবে কাজ করে, টেলেক্স কিভাবে কাজ করে, মোবাইল ফোনে কিভাবে কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে কথোপকথন করা যায়, টেলিভিশনে কিভাবে সমস্ত কিছু জীবন্ত দেখা যায়, কথা শোনা যায় ছাপাখানার মেশিনগুলো কিভাবে কাজ করে, মাথার ওপরে ফ্যান কিভাবে ঘোরে, বৈদ্যুতিক আলো কিভাবে জ্বলে, বৈদ্যুতিক সিঁড়ি কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে, লিফ্‌ট কিভাবে ক্ষণিকের ভেতরে ৫০ তলায় পৌছে যায়, বিভিন্ন ধরণের মেডিকেল যন্ত্রসমুহ কিভাবে কর্ম সম্পাদন করে, এসব কিছুই নবী বা রাসুলগণ দেখাতে পারেননি। অথচ তিনি দাবী করছেন, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই।' তাদের এই দাবীর ওপরে কিছুই না দেখে কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় ? বিবেক বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটাও সামনে রাখতে হবে।

এবার বিবেক বুদ্ধি নামক আদালতকে বা বিচারককে এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যে, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই' এই দাবী যারা করছেন, তাদের প্রকৃত অবস্থা কি ? তাদের প্রথম অবস্থা হলো, তাঁরা সবাই তাদের দাবীর ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ এবং যাবতীয় মৌলিক বিষয়ে তাদের ভেতরে চিন্তা ও মতের কোনই পার্থক্য নেই। তাদের একজনের সাথে আরেকজনের কোন দেখা সাক্ষাৎ নেই, অথচ যে দেশে বা স্থানেই তাঁরা আগমন করেছেন, তাঁরা অভিন্ন দাবী পেশ করেছেন। তাদের সে অভিন্ন দাবী হলো, 'প্রকৃত সত্য অবগত হবার এমন একটি মাধ্যম আমাদের কাছে আছে, যা অন্য কোন মানুষের কাছে নেই।' বিবেক বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটা সামনে রাখতে হবে।

এই দাবী যারা করছেন, তাঁরা কখনো একথা বলেননি যে, তাঁরা পর্যবেক্ষণ করে বা অনুমান করে অথবা কল্পনার ভিত্তিতে এই দাবী করছেন। বরং তাঁরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এই দাবী করছেন যে, উক্ত মেশিনসমূহের কর্ম যারা সম্পাদন করাচ্ছেন, যারা উক্ত মেশিন পরিচালিত করছেন এবং যিনি করাচ্ছেন, তাঁর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিচালকের নির্দেশে সেখান থেকে কর্মচারীগণ আমার কাছে আসা যাওয়া করেন, তাঁরা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছেন। আমি নিজের চোখে উক্ত মেশিন পরিচালনার অবস্থা দেখে এসেছি। সুতরাং আমাদের দাবী কল্পনা বা অনুমান নির্ভর নয়। আমরা নিজের চোখে দেখেছি, আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আমাদের দাবী পেশ করছি। বিবেক বুদ্ধি নামক আদালত বা বিচারককে এই দিকটাও সামনে রাখতে হবে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

প্রথম ব্যক্তি যে দাবী করেছিল, তারপর থেকে যত ব্যক্তির আগমন ঘটেছে, তাঁরা সবাই ঐ একই দাবী করেছে। জীবনের প্রথম থেকে তাঁরা অন্তিম মূহুর্ত পর্যন্ত একই দাবী করেছেন। তাঁরা তাদের দাবীর ভেতরে কখনো বৃদ্ধি করেননি। কখনো কমও করেননি। প্রথম ব্যক্তি যা বলেছেন, শেষের ব্যক্তিও একই কথা বলেছেন। তাঁরা তাদের বর্ণনার ভেতরে কোন সময় কখনো হ্রাস বৃদ্ধি করেননি। বিবেক বুদ্ধি নামক বিচারককে এই দিকটির প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি দান করতে হবে।

যারা এই দাবী করতেন, তাঁরা সে সমাজের সমস্ত দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কোন মানুষ কোনদিন তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে দেখেনি। কোন ধরণের দুষ্কর্মের সাথে তাঁকে কেউ কোনদিন সামান্যতম জড়িত হতে দেখেনি। কোন নারীর প্রতি তাঁকে কেউ কখনো খারাপভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেখেনি। কারো আমানতের সামান্য খেয়ানত করতে দেখেনি। তিনি কারো সাথে কোনদিন অন্যায় আচরণ করেছেন, তা কেউ দেখেনি। তিনি অপরের দ্রব্য চুরি করেছেন, এমন ঘটনা কোনদিন ঘটেনি। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সে সমাজের সবচেয়ে চরিত্রবান এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি কোন সময় অসংলগ্ন কোন কথা বলেছেন, তা কেউ কোনদিন প্রমাণ করতে পারেনি। এক কথায় তিনি ছিলেন সবদিক দিয়ে কলুষমুক্ত। তাঁর মত সুন্দর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে সমাজে কেউ ছিল না, এ কথা তাঁর প্রাণের শত্রুগণও স্বীকার করতো। তিনি এমন সব কথা বলতেন, এমন শিক্ষা মানুষকে প্রদান করতেন, এমন ধরণের আইন কানুন মানুষের সামনে পেশ করতেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন মানুষ উপস্থাপন করতে পারতো না। গোটা পৃথিবীর বিখ্যাত জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীগণ তাঁর শিক্ষা ও বিধান সম্পর্কে গবেষণা করতে করতে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। যারা জীবনের সমস্ত দিকে ছিলেন সত্যবাদী এবং সত্য নিষ্ঠ তাঁরা মাত্র এই একটি বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিথ্যাদাবী পেশ করতে পারেন না, এদিকটা বিবেক নামক বিচারককে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

তাঁরা যে দাবী করতেন, এই দাবী তাদের জন্য শেষ মুহূর্তে এমন কঠিন অবস্থা সৃষ্টি করেছিল যে, হয় তাঁরা এই দাবীর প্রতি দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে প্রাণ দান করবেন নতুবা তাঁরা তাদের দাবীর ব্যাপারে বিজয়ী হবেন। এ কারণে তাদেরকে সংগ্রাম মুখর হতে হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন। রক্তদান করেছেন, নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। তবুও তাঁরা তাদের দাবীর প্রতি অবিচল থেকেছেন। এই দাবীদারগণ তাদের ব্যক্তিস্বার্থের কারণে দাবী করেছেন, এ কথা তাঁদের প্রাণের শত্রুগণও প্রমাণ করতে পারেনি। এদিকটা বিবেক নামক বিচারককে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

এই দাবীদারগণ সমকালিন মানুষকে এ কথা বলেননি যে, তোমরা আমার দাবী গ্রহণ করছো না কেন ? তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাও ? ঠিক আছে, আমি তোমাদের সামনে তাদেরকে উপস্থিত করছি, যারা উক্ত মেশিনসমূহ পরিচালিত করছেন। তোমাদেরকে আমি ঐস্থান থেকে ভ্রমণ করিয়ে আনছি, যেখান থেকে এ সমস্ত মেশিন শক্তি লাভ করে কর্ম সম্পাদন করছে। যে অদৃশ্য জগৎ থেকে এ সমস্ত কিছু পরিচালিত হচ্ছে, তোমাদেরকে আমি সেই অদৃশ্য জগতের কর্ম সম্পাদন পন্থা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

দেখাতে পারি। এ সমস্ত কথা তাদের একজনও বলেননি। বরং তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন, এ ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে কিছুই দেখাতে পারবো না। আমার প্রতি তোমাদেরকে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করছি, তা তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। এদিকটা বিবেক নামক বিচারককে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

নবীকে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা

জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির বিচারে যখন একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রকৃত সত্য জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। প্রকৃত সত্য অবগত হবার একমাত্র মাধ্যম হলো নবী বা রাসুল। আমরা এ কথাও জানি যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ও রাসুলগণ মানুষের জন্য সহজ সরল পথ প্রদর্শন করেন, তখন একথাও আমাদের কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়, নবীর ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর যে কোন আদেশ পালন করা, তাঁর প্রদর্শিত পথ যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে অনুসরণ করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

নবীর বিধান থাকার পরেও যদি কোন ব্যক্তি নিজের খেয়াল খুশী মত চলে বা অন্য কোন মানুষের আদর্শ অনুসরণ করে, তাহলে সে যে পথভ্রষ্ট হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের ভেতর থেকেই আরেকজন মানুষ যদি মানুষকে পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হত, তাহলে নবী প্রেরণের তো কোন প্রয়োজনই হত না। জীবন ব্যবস্থা দানের কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই মহান আল্লাহ নবী প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে জীবন ব্যবস্থা দান করেছেন।

একশ্রেণীর মানুষের অস্তিত্ব রয়েছে, যারা নবুয়্যাত এবং রিসালাতকে স্বীকৃতি দান করে। নবীকেও স্বীকৃতি দান করে। কিন্তু নবীর ওপর নির্ভর করে না এবং নবীর আনুগত্যও করে না। তাদের ধারণা হলো, নবীকে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হবে বটে, তাঁর আনিত আদর্শও ছিল অদ্ভুত সুন্দর কিন্তু তা ছিল তাঁর যুগের উপযোগী। নবীর আদর্শ সার্বজনীন নয়। বর্তমানে চলার জন্য আদর্শ নির্মাণ করতে হবে বা নবীর আদর্শ ভেঙ্গে চুরে নতুন একটি আদর্শ দাঁড় করাতে হবে এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করে বর্তমানে চলতে হবে। এদের জ্ঞানের দৈন্যতা দেখলে এদের ওপর করুণা হয়। আরেক শ্রেণীর লোক রয়েছে, যারা দাবী করে নবীকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজনই নেই।

কারণ আমাদের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি দিয়ে আমরা সত্য পথের সন্ধান করতে সক্ষম। এই শ্রেণীর মানুষ মারাত্মক ভ্রমে নিমজ্জিত। এরা বুঝতে চায় না যে, জ্যামিতিতে একটি বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দু পর্যন্ত সরল রেখা মাত্র একটিই হয়। এছাড়া যত রেখা অঙ্কন করা যাবে তা সরল রেখা হবে না। সুতরাং নবীদের আনিত পথই হলো সহজ সরল পথ। এই পথ ব্যতীত অন্য কোন পথ সহজ সরল হয় না এবং হতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষ যদি নবীর আনিত সহজ সরল পথ ত্যাগ করে অন্য পথ অবলম্বন করে, ব্যক্তি তা করতে পারে। এ স্বাধীনতা তার রয়েছে। কিন্তু এই পথ মানব মনের চাহিদা অনুসারে তাকে শান্তি দিতে পারবে না।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

গোটা পৃথিবীর ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। পৃথিবীর দু'একটি দেখে যেখানে নবীর আনিত আদর্শ ছিটে ফোটা বাস্তবায়িত রয়েছে, আর যেখানে সামান্যমতও নেই, এই দুই স্থানের অপরাধের পার্থক্য দেখলেই অনুধাবন করা যায়, নবীর আনিত আদর্শ অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। মানুষ মুখে স্বীকৃতি না দিলেও তার মনের চাহিদা এবং বিবেকের দাবী হলো, সে সত্য সহজ সরল পথে চলতে আগ্রহী। যে পথে কোন কন্টক নেই, কোন বাধা নেই, কোন ধরণের সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু মানুষ পার্থিব স্বার্থে এবং অহমিকা বশতঃ সেই পথেই চলতে গিয়ে ধ্বংসের অতলে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

মানুষ দেখেও শিখে না। প্রাণী জগতের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সে দেখতে পেত, একটি ইতর প্রাণীও তার গন্তব্যে পৌছার জন্য সহজ সরল পথ অনুসরণ করে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা এই মানুষ বড়ই বিচিত্র। এরা সহজ সরল পথ দেখলে চিন্তা করে, এই পথে চলতে গেলে পার্থিব স্বার্থে আঘাত আসবে। আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো। সুতরাং আমরা নিজেরাও এই পথে চলবো না, অন্য কাউকেই এই পথে চলতে দেব না। আল্লাহর কোন নেক বান্দাহ যখন এদেরকে সহজ সরল পথের দিকে সহানুভূতির সাথে আহ্বান জানায়, তখন সে ঘাড় বাঁকা করে থাকে। নিজের আবিষ্কার করা ভুল পথের ওপরেই সে দৃঢ় থাকে।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যাপার যে, নবীকে অস্বীকার করে বা তাঁর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে কোন ব্যক্তি বা কোন জাতি সহজ সরল পথ লাভ করতে পারে না। তার কাংখিত শান্তি সে লাভ করতে পারে না। নবীকে ত্যাগ করেও কোন ব্যক্তি আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। পৃথিবী এবং আলমে আখেরাতে শান্তি লাভ করতে হলে তাকে অবশ্যই নবীর ওপর ঈমান আনতে হবে এবং নবীকে অনুসরণ করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ মানুষের সামনে উন্মুক্ত নেই।

কোন ব্যক্তি বা জাতি সহজ সরল পথ অবলম্বন করতে চায় অথচ সে ব্যক্তি বা জাতি একজন নবীর মত সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ সত্ত্বার কথা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে, সেই ব্যক্তির বা জাতির যে বুদ্ধির বৈকল্য ঘটেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটলে, বুদ্ধি ভ্রষ্ট না হলে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সত্য বিমুখ হওয়া যায় না। তার জ্ঞান বিবেক বুদ্ধির দৈন্যতা সৃষ্টি হতে পারে, তার মনের জগতে অহংকার নামক নিকৃষ্ট স্বভাব বাসা বাঁধতে পারে, অথবা সে স্বয়ং বাঁকা স্বভাবের হতে পারে, যে কারণে তার মন মানসিকতা সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না।

এ সমস্ত কারণেই সে তার পূর্ব পুরুষ যা করে এসেছে, তারই অন্ধ অনুসরণ করে। সমাজে বা বংশে শতাব্দী ধরে যে প্রথা চলে আসছে তা অনুসরণ করে। পূর্ব পুরুষ যা করে এসেছে এবং দেশ ও সমাজে কয়েক শতাব্দী ধরে যে প্রথা চলে আসছে, এ সবের বিরুদ্ধে সে কথা শুনতে চায় না। এই ব্যক্তি ধারণা করতে পারে, পৃথিবীতে আমি যা খুশী তাই করবো, যেভাবে খুশী জীবন যাপন করবো, আমি নবীকে অনুসরণ করলে আমার সে স্বাধীনতা থাকবে না। সুতরাং আমি নবীকে অনুসরণ করবো না।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নবীকে অনুসরণ না করার ওপরে উল্লেখিত কারণগুলো যদি কোন ব্যক্তি বা জাতির ভেতরে বিদ্যমান থাকে, তাহলে সেই জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে কোন ক্রমেই সহজ সরল পথে চলা সম্ভব হবে না। ধর্মের নামে সে ব্যক্তি যতই পীরের পা ধরে পড়ে থাক না কেন, মাজারে মাথা ঠুকতে ঠুকতে সে ব্যক্তি যদি নিজেকে রক্তাক্তও করে ফেলে, তবুও তার পক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা সম্ভব হবে না। নবীর প্রদর্শিত পথ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে সত্য লাভ করা সম্ভব নয়।

মনে রাখতে হবে, নবুয়্যাত বা রিসালাত দাবী করে বা চেষ্টা সাধনা করে লাভ করার কোন জিনিষ নয়। এ সম্পর্কে আমরা এই গ্রন্থের প্রথম দিকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং যিনি নবী প্রেরণ করেছেন, তিনিই আদেশ দান করেছেন নবীর আনুগত্য করার জন্য, নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের জন্য। নবীর প্রতি যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে না, নবীর আনুগত্য যে ব্যক্তি করে না, সে ব্যক্তি যে আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

সাধারণ মানুষ যে দেশের নাগরিক এবং যে সরকারের প্রজা, সেই সরকারে নিযুক্ত প্রশাসকের আনুগত্য করতে হবে, এটা করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেউ সরকারকে মানবে আর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসককে মানবে না, ব্যাপারটা পরস্পর বিরোধী। মহান আল্লাহ হলেন সমস্ত সৃষ্টির বাদশাহ। তার সৃষ্টি মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্য তিনি যাকে খুশী নিযুক্ত করতে পারেন। তিনি যাকেই নিযুক্ত করেছিলেন, যার আনুগত্য করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দান করেছেন। তার আনুগত্য করা সমস্ত মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

নিজেকে সবার আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র নবীর আনুগত্য করা প্রতিটি মানুষের জন্য বাধ্যতামূলক। মানুষ যদি তা না করে তাহলে সে নিজেকে কিছুতেই আল্লাহর গোলাম হিসেবে পরিচয় দান করতে পারে না। একজন মানুষ স্রষ্টা আল্লাহকে স্বীকার করবে অথচ তাঁর প্রেরিত নবী রাসুলকে স্বীকার করবে না, এমন হতে পারে না। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ার ভেতরে কোন পার্থক্য নেই।

নবী ও রাসুলদের প্রধান দায়িত্ব

এই পৃথিবীতে নবী ও রাসুলদেরকে প্রেরণ করা হয় পথভ্রষ্ট মানুষকে সত্য ও সহজ সরল পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে। তাদের প্রধান দায়িত্বই হচ্ছে, পৃথিবীর মানুষকে সমস্ত দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে তাঁরই গোলামীর দিকে আহ্বান করা। একমাত্র আল্লাহকেই সমস্ত শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করা, তাঁকেই প্রতিপালক হিসেবে মান্য করা, একমাত্র আল্লাহকেই নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়াই হলো মানুষের কর্তব্য, এই কর্তব্য পালনের দিকেই মানুষকে আহ্বান করাই হলো পৃথিবীতে নবী রাসুলদের প্রধান দায়িত্ব। এই দায়িত্বই সমস্ত নবী ও রাসুল পালন করেছেন।

প্রতিটি নবীই তাঁর নিজের জাতিকে ভুলে যাওয়া পাঠ স্বরণ করিয়ে দেন। তাদেরকে তাঁরা শিক্ষা দান করেন, দাসত্ব করতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর। নবী ও রাসুলগণ তাঁর অনুসারীকে মূর্তি পূজা এবং শিরক থেকে হেফাজত করেন। সমাজে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

প্রচলিত মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় প্রথা থেকে তাদেরকে বিরত রাখেন। আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় জীবন যাপন করার পদ্ধতি শিক্ষা দান করেন এবং আল্লাহর আইন প্রচলিত করে তা মেনে চলার জন্য পরামর্শ দান করেন।

পৃথিবীর এমন কোন জনপদ বা নগরী নেই, যেখানে মহান আল্লাহ নবী প্রেরণ করেননি। প্রতিটি নবীর প্রচারিত আদর্শ ছিল ইসলাম। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রতিটি নবীর শিক্ষা পদ্ধতি এবং আইন কানুনে সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নবীগণ তাদের জাতির ভেতরে যেসব মূর্খতা অজ্ঞানতা কুসংস্কার এবং অনাচার প্রচলিত হয়ে পড়েছিল, সেগুলোর মূল উৎপাটনের ব্যাপারে অবিরাম সংগ্রাম করেছেন। যে সব ভ্রান্ত চিন্তা চেতনা জাতিকে গ্রাস করেছিল, এসব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তাঁরা সংগ্রাম করেছেন।

জ্ঞান বিজ্ঞান, সভ্যতা সংস্কৃতির দিক দিয়ে জাতি যখন প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন নবীগণ তাদেরকে আইন কানুন দান করেছিলেন। তারপর ক্রমশঃ জাতি উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে, সেই সাথে তাঁরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষা ও আইন কানুনও ব্যাপকভাবে দান করেছেন। মোট কথা নবী ও রাসুলগণ মানুষকে আল্লাহর গোলামে পরিণত করার জন্য ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মিনিট পূর্বেও মানুষকে নামাজের কথা স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্বনবীর এই কাজ কোন নতুন কাজ নয়। এ কথা তাঁকে স্বরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ বললেনঃ-

وما ارسلنا من قبك من رسول الا نوحى اليه انه لااله الا انا فاعبدون (الانبياء)

'তোমার পূর্বে আমি যে রাসুল প্রেরণ করেছি, তাঁকে আমি ওহীর দ্বারা অবগত করিয়েছি যে, আমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই দাসত্ব করবে।' (সূরায়ে আম্বিয়া,আয়াত নং-২৫)

পৃথিবীতে যারা মনিব সেজে বসে আছে, যারা দাসত্ব গ্রহণ করছে, মানুষকে যারা নিজেদের তৈরী আদর্শ, মতবাদ, আইন-কানুনের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছে, তাদেরকে যেন সাধারণ মানুষ অস্বীকার করে, এই অনুপ্রেরণা মানুষের ভেতরে জাগ্রত করা এবং তাদেরকে সংগ্রাম মুখর করে গড়ে তোলাও নবীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তাঁর রাসুলের কাছে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেনঃ-

ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبو االطاغوت (النحل)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

'প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভেতরেই আমি রাসুল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশসহ যে, তোমরা সবাই এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধা দেয় বা নিজেদের দাস বানিয়ে রাখে এমন সব শক্তিকে অস্বীকার করো।' (সূরায়ে আন্ নাহল, আয়াত নং-৩৬)

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে জীবন বিধান রচনা করেছেন নবী এবং রাসুলগণ তা মানুষের কাছে পৌছে দেবেন। এ দায়িত্ব পালন করেন নবীগণ। আল্লাহ তাঁর আইন-কানুন নিজে এসে কোন মানুষের কাছে দিয়ে যান না। তাঁর নিয়মের অধিনেই তাঁর আইন-কানুন মানুষের কাছে আসে। আল্লাহর নিয়ম হলো তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকেই একজনকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেন এবং তাঁর কাছে ফেরেশতার মাধ্যমে জীবন বিধান প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসুল এসেছেন তাঁরা তাদের গোটা জীবন ব্যাপী এই কঠিন দায়িত্ব পালন করে যান। এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা সামান্যতম কোন অবহেলা প্রদর্শন করেন না। মুহূর্তের জন্য তাঁরা ভুলে যাননা, কোন দায়িত্বসহ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আহ্বান করে বলেছেনঃ-

*يايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك-وان لم تفعل فما بلغت رسلته (الماعدة)

'হে রাসুল! তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ করা তা তুমি সঠিকভাবে পৌছে দাও। যদি তুমি না পৌছাও তাহলে তুমি তোমার রেসালাতকে পৌছালে না। (সূরায়ে আল মায়েদাহ, আয়াত নং-৬৭)

নবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো তাঁরা সাধারণ মানুষকে ঐ পথের দিকেই আহ্বান জানাবেন, যে পথকে আল্লাহ্ সিরাতুল মুস্তাকিম নামে অবিহিত করেছেন। এই পথের পরিচয় নবীগণ মানুষকে জানাবেন, এ পথে চলতে সাহায্য করবেন, মানুষ যেন এ পথে অগ্রসর হয়ে গন্তব্য স্থলে পৌছতে পারে সেভাবে তিনি সহযোগীতা করবেন। সাধারণ মানুষ আল্লাহর পরিচয় জানে না। সত্য মিথ্যার পার্থক্য তাঁরা বোঝে না। কোনটা কল্যাণের পথ আর কোনটা অকল্যাণের পথ তা মানুষ জানেনা। মানুষকে এসব ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দান করবেন নবীগণ। মানুষ যেন নির্ভুলভাবে সহজ সরল পথে চলতে পারে এ কারণেই মহান নবীদের কাছে ওহী অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ ওহী প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেনঃ-

الر قف كتب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمت الى النور ٧ باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد (ابراهيم)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

'এই গ্রন্থ আমি তোমার প্রতি এ কারণেই অবতীর্ণ করেছি, যেন তুমি মানুষকে ঘন অন্ধকারের ভেতর থেকে বের করে আলোর পথে নিয়ে আসতে পারো। তাদের প্রতিপালকের আদেশ ক্রমে স্বতঃপ্রশংসিত মহাপরাক্রমশালী সর্বজয়ী আল্লাহর পথে।'(সূরায়ে ইবরাহীম আয়াত নং-১)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ নবী ও ওহী প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বনবীকে প্রেরণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ-

يايهاالنبي انا ارسلك شاهداو مبشراو نذير-و داعيالى الله باذنه وسرا جامنيرا (الاحزاب)

'হে নবী! আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ প্রেরণকারী, ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জল আলোদানকারী প্রদীপ রূপে।' (সূরায়ে আল আহযাব, আয়াত নং-৪৬)

নবী পৃথিবীতে এসে মানুষকে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দিবেন। যারা নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামী দলে শামিল হয়েছে, তাদেরকে তিনি পরকালে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করবেন এবং যারা ইসলামের বিরোধীতা করেছে, ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদেরকে তিনি পরকালে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করবেন। তিনি আল্লাহর আদেশেই মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানাবেন। তিনি নবুওয়তের আলো দিয়ে সমস্ত অন্ধকার দূরিভুত করবেন। মূর্খতার অন্ধকার বিদায় করে তাওহীদের জ্ঞানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করবেন। তাঁরাই হবেন একমাত্র অনুসরণ যোগ্য নেতা। মহান আল্লাহ তাদেরকে যেমন উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন তেমনিভাবে তাঁর হলেন পবিত্র। সুতরাং তাঁরাই হলেন মানবজাতির পথ প্রদর্শক এবং একমাত্র আদর্শ নেতা। প্রশ্নাতীতভাবে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে অনুসরণ করতে হবে। এই নেতৃত্ব মানুষকে পরকাল সম্পর্কে অবহিত করবেন। পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে-এ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করার দায়িত্ব হলো নবী রাসুলদের।

এই দায়িত্ব তাঁরা যথাযথভাবে পালন করেন। আদালতে আখেরাতে বিচারের পরে যে সমস্ত মানুষকে জাহান্নামের দিকে নেয়া হবে তখন জাহান্নামের দ্বাররক্ষী প্রশ্ন করবেঃ-

الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايت ربكم وينذرو نكم لقاء يومكم هذا ط (زمر)

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোন নবী রাসুল আসেনি, যারা এই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে অবগত করেনি তোমাদেরকে ?' (সূরায়ে জুমার, আয়াত নং-৭১)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

মানুষের সমস্ত কাজের হিসাব মহান আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে, এ কথা মানুষকে জানানোর দায়িত্ব হলো নবী রাসুলের। কারণ আদালতে আখেরাতে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে প্রশ্ন করবেনঃ-

الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم ايات وينذرونكم لقاء يومكم هذا (الانعام)

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রাসুল আগমন করেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত পড়ে শোনাবে এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করে দেবে ? (সূরায়ে আনয়াম, আয়াত নং-১৩১)

নবীগণ মানুষকে তাঁর আসল গন্তব্যের দিকে অগ্রসর করাবেন। মানুষকে জানাবেন, এই পৃথিবী তোমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়, পরকালের জীবনই হলো প্রকৃত জীবন এবং সে জীবন হলো অনন্তকালের। সুতরাং ঐ অনন্তকালে যেন তোমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারো, সে পাথেয় এই পৃথিবী থেকেই তোমাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ নবী রাসুলগণ মানুষকে জড়বাদ আর নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদ থেকে সরিয়ে নৈতিকতাবাদীতে পরিণত করবেন। উল্লেখিত কাজ এবং দায়িত্বই হলো রাসুল ও নবীদের প্রধান কাজ।

প্রথম মানব হযরত আদম

আলায়হিস্ সালাম

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনা বর্ণনার পূর্বে কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানা একান্ত প্রয়োজনীয়। এগুলো জানা থাকলে পুরো ঘটনা বুঝা অত্যন্ত সহজ হবে। প্রথম প্রশ্ন হলো, হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে কখন সৃষ্টি করা হয়েছিল ? পৃথিবী সৃষ্টির সাথে সাথেই নাকি এর পরে ? বাইবেল বিশেষজ্ঞগণ এবং কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলে থাকেন, মহান আল্লাহ সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ছয় দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। সেই ছয় দিনের মধ্যে কোন এক শুক্রবারে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাঁরা পবিত্র কোরআন থেকে সূরা আরাফের একটি আয়াত পেশ করেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ-

ان ربكم الذى خلق السموت والارض فى ستة ايام ثم استوي على العرش ق (الاعراف)

সন্দেহাতীতভাবে তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আসমান সমূহ এবং পৃথিবীকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশের ওপর বিরাজমান হলেন। (সূরায়ে আরাফ, আয়াত নং-৫৪)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এই আয়াতের ভেতরে 'ছয়দিন' এবং 'আরশের ওপর বিরাজিত হলেন' কথাগুলোর মূল রহস্য মহান আল্লাহ ব্যতীত আমাদের পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা এখানে উল্লেখ নেই যে, হযরত আদম আলায়হিস সালাম-কে শুক্রবারে সৃষ্টি করা হয়েছে। বাইবেল এ ধরণের অনেক কথাই বলে, যার কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু কতক ইসলামী চিন্তাবিদ কোন সূত্রে শুক্রবারের উল্লেখ করেছেন, তা বোধগম্য নয়।

মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টি শুক্রবারে সংঘটিত হয়েছে।' (মুসলিম)

কিন্তু এখানে এ কথা উল্লেখ নেই যে, ঐ ছয়দিনের মধ্যে যে শুক্রবার ছিল সেই শুক্রবারেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বহু স্থানে এই পৃথিবীই শুধু নয়, সমস্ত সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই সাথে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টির কথা বলা হয়নি। এখানে যে আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতে আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টির কথা ইশারা ইঙ্গিতেও বলা হয়নি। কোরআনে যেখানেই হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে কোথাও তাঁর সৃষ্টির দিন সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয়নি।

এ কারণে কোরআন ও হাদিসে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে, এর ওপর গবেষণা করে ইসলামী চিন্তাবিদগণ মতামত পেশ করেছেন যে, আকাশ এবং পৃথিবী কোন সময়ে এবং কত দিনে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা তিনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন। এই সব সৃষ্টির পরে কত দিন অতিবাহিত হয়েছিল তা আমাদের পক্ষে জানার কোন উপায় নেই। সমস্ত কিছু সৃষ্টি করার পরে মহান আল্লাহ কত দিন এই পৃথিবীকে এভাবে সৃষ্টির পরের অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন তা জানার কোন মাধ্যম নেই।

ভূ-তত্ত্ববিদ এবং বিজ্ঞানীগণ বর্তমানে এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেননি। অর্থাৎ এসব বিষয়গুলো গবেষণার পর্যায়ে রয়ে গেছে। তবে পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে বর্তমান অবস্থায় যে ছিল না, এ কথার প্রমাণ কোরআন হাদিসেও উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং কবে কোনদিন কখন যে এই পৃথিবী মানুষ বাসের উপযোগী হয়েছিল, তা পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে অনুমান করা যায় মাত্র। নিশ্চিত করে কোন কিছু বলা যায় না। ইসলামী গবেষকগণ বলেন, কোন এক শুক্রবারে হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কারণ শুক্রবার দিনটি ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ দিন। গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনাবলী এই দিনেই সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণেই ঐ দিনটি ছুটির দিন হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। শুক্রবার তথা জুমু'আর দিন ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। এই দিনের মর্যাদাও অসীম।

আরেকটি প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে তাহলো, আদম এবং হাওয়া নাম দুটো কোথেকে এলো? এই শব্দ দুটো আরবী না অন্য কোন ভাষার ? কি কারণে এই নামকরণ করা হলো ?

ahlussunnah-bd.blogspot.com

শব্দ দুটো সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনে হাজার রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এই নাম দুটো আরবি ভাষার নয়, এই শব্দ দুটো সুরইয়ানী ভাষার।

অপরদিকে বাইবেল আদম শব্দটি ভিন্ন বানানে এবং উচ্চারণে পরিবেশন করেছে। বাইবেল যে বানান এবং উচ্চারণে পরিবেশন করেছে, এ সম্পর্কে আল্লামা জাওহারী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লামা জাওয়ালিকী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, শব্দ দুটো আরবী ভাষার।

তাদের ভেতরে এই মত পার্থক্যের কারণ হলো, শব্দের বানান এবং উচ্চারণের পার্থক্যের কারণে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিজ ইবনে হাজার রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি যে উচ্চারণ এবং বানান সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, তাঁর মন্তব্যও ঠিক। আবার আল্লামা জাওহারী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লামা জাওয়ালিকী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি যে মন্তব্য করেছেন, তাদের কথাও ঠিক।

আল্লামা সালাবী রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, মাটিকে হিব্রু ভাষায় আদাম বলা হয়। হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে মাটি হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কারণে মাটির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তাঁর নাম আদাম রাখা হয়েছে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, আদাম শব্দটি আরবী উদমাতুন শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। উদমাতুন বা আদীমুল আরদ্ শব্দের অর্থ হলো, পৃথিবীর ওপরি ভাগের মাটি। এই মাটি হতেই তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই তাঁর নাম আদম রাখা হয়েছে।

কোন কোন গবেষক বলেছেন, আদাম শব্দটি আদামাত শব্দ অর্থাৎ খালাত্বাত বা মিশ্রিত হওয়া শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর দেহ মাটি এবং পানির মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়েছিল, এ কারণে তাঁকে আদাম বলা হয়। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতীর মতে আদাম শব্দটি উদমাতুন শব্দ হতে নির্গত। উদমাতুন শব্দের অর্থ বাদামী রং সম্পন্ন। কেউ বলেছেন, গমের মত রং অর্থাৎ সোনলীও নয় আবার বাদামীও নয়, এর মাঝামাঝি উজ্জ্বল বর্ণ। আবার কারো মতে আদীমুন শব্দের অর্থ পৃথিবীর পৃষ্ঠ দেশ অর্থাৎ ওপরের মাটি।

হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-এর নামকরণ হাওয়া কেন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও মতবিরোধ বিদ্যমান। কেউ বলেছেন, আরবী হাওয়া শব্দের অর্থ হলো, জীবন্ত মানুষের মাতা। এ কারণে তাঁকে হাওয়া বলা হয়। কোন কোন গবেষক এই বিতর্কের ইতি এভাবে টেনেছেন যে, নাম এবং অর্থের ভেতরে সামঞ্জস্য থাকার বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ্ম বিষয়। সুতরাং এ দুটো শব্দ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন জন প্রদান করেছেন, তা সবই সত্য হতে পারে, অথবা এর ভেতরে যে কোন একটি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। কারণ এ দুটো বিষয় অত্যন্ত বিস্তীর্ণ।

আল্লাহর সামনে ইবলিসের যুক্তি

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সামনে ইবলিস যে নত হবে না, এ কথা কি মহান আল্লাহ অবগত ছিলেন না ? নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন। তাঁর কাছে অতীত

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। সময় নামক জিনিষ তাঁরই সৃষ্টি। সুতরাং কোন সময়ে কখন কি ঘটবে এ বিষয় তিনি অবগত। ইবলিস যে এমন বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, আল্লাহর সাথে বিতর্ক করার সাহস দেখাবে, অহংকার প্রদর্শন করবে মহান আল্লাহ জানতেন।

কিন্তু এই সময় যদি তাকে বিতাড়িত করা হত, তখন সে প্রশ্ন করতো, কেন আমাকে বিতাড়িত করা হলো ? আমার অপরাধ কি তা আমি জানতে পারলাম না। আল্লাহ যদি তাকে ভবিষ্যতের কথা বলতেন যে, আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করবো এবং সে মানুষের সামনে তোমাকেসহ ফেরেশতাদেরকে অবনত হবার নির্দেশ দান করা হবে। তখন সমস্ত ফেরেশতা আমার আদেশ পালন করতো কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে।

আল্লাহর এই কথার উত্তরে ইবলিস স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারতো, তোমার কথা ঠিক তা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি তো আমাকে পরীক্ষা করতে পারতে আমি তোমার আদেশ পালন করি কিনা ? ইবলিস যেন এই অজুহাত প্রদর্শন করতে না পারে, এ কারণেই মহান আল্লাহ তার পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

পবিত্র কোরআনের সূরা আরাফে এই কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ–

قال مامنعك الا تسجد اذامرتك ط (الاعراف)

আমি তোমাকে স্বয়ং আদেশ দান করলাম, কোন বিষয় তোমাকে আমার আদেশ পালনে বিরত রাখলো ? (সূরা আরাফ, আয়াত নং-১২)

আল্লাহর এই প্রশ্নের উত্তরে ইবলিস যুক্তি দিয়েছিলঃ–

قال اناخيرمنه–خلقتنى من ناروخلقته من طين

(الاعراف)

বিষয়টি এই যে, আমি আদমের থেকেও উত্তম সৃষ্টি। কেননা, আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন। আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন পচা মাটি থেকে। (সূরা আরাফ, আয়াত নং-১২)

ইবলিসের যুক্তি ছিল বড় অদ্ভুত। সে বলেছিল, আমার সম্মান ও মর্যাদা আদমের তুলনায় অনেক বেশী। কারণ আমি হলাম আগুন হতে সৃষ্টি। আর আদম হলো মাটির তৈরী। মাটির সাথে আগুনের কোন তুলনা হতে পারে না। আপনি আমাকে আদেশ করলেন, মাটির আদমের সামনে নত হবার জন্য। আপনার আদেশ কি ইনছাফ ভিত্তিক ? আমি সবদিক দিয়ে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সে আমার সামনে নত হোক। আমি কেন তার সামনে নিজেকে নত করতে যাবো ?

ইবলিস এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, তাকেও যে সৃষ্টি করেছে আদমকেও ঐ একই আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আদেশ এসেছে ঐ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর আদেশের মুকাবিলায় নিজেকে সোপর্দ করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সে তা না

ahlussunnah-bd.blogspot.com

করে অহংকার প্রদর্শন করেছিল। নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষনা প্রদান করেছিল। নিজের ভুল হয়েছে, এ কথা স্বীকার না করে সে তার ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলো। ভুলের কারণে অনুতপ্ত না হয়ে সে আল্লাহর সামনে যুক্তি প্রদর্শন করছিল।

মহান আল্লাহও তখন তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তুই যখন অহংকারে অন্ধ হয়ে আমার সামনে যুক্তি প্রদর্শন করছিস, তাহলে আজ থেকে তুই আমার দরবার থেকে বিতাড়িত। আমার দরবার আনুগত্যের স্থান। এখানে বিদ্রোহীদের কোন স্থান নেই। এখান থেকে তুই চলে যা। তোর এই অবাধ্য আচরণ তোকে ধ্বংসের শেষ স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। তুই অভিশপ্ত। তোর স্থান এবং একমাত্র নিবাস হলো জাহান্নাম। আর এটাই হলো তোর নিকৃষ্ট কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল।

আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আদম

আলায়হিস্ সালাম

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-কে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করবেন, এই ইচ্ছা আল্লাহ যখন তাঁর ফেরেশতাদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। এ কাহিনী পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, আমি আমার পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে ইচ্ছুক। আমার সে প্রতিনিধি হবে স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকারী। তাদের সত্ত্বা হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁরা তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে পারবে। আমার সেই প্রতিনিধি আমার দেয়া আইন কানুনের বিকাশ ঘটাবে।

আল্লাহর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে ফেরেশতাগণ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁরা মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, 'এই প্রতিনিধি সৃষ্টির উদ্দেশ্য আপনার এটাই হয় যে, তাঁরা দিন রাত আপনার প্রশংসা কীর্তন করবে, আপনার নামের জিকর করবে, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করবে, আপনার মহত্ত্ব বর্ণনা করবে তাহলো তো এ কাজের জন্য আমারই যথেষ্ট। আমরা প্রতি মুহূর্তে আপনার প্রশংসা কীর্তন করছি। আপনার পবিত্রতা ঘোষনা করছি। আপনার শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করছি। কোন ধরণের প্রশ্ন ব্যতীতই আপনার আনুগত্য করছি। আমরা ধারণা করছি, মাটি হতে সৃষ্ট এই মানুষ পৃথিবীতে রক্তপাত ঘটাবে। নানা ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি করবে। হে আমাদের প্রতিপালক ! আপনার এই ইচ্ছার মূল উদ্দেশ্য আমরা অনুধাবন করতে পারছি না।

মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে শিক্ষাদান করা হলো যে, সৃষ্ট জীবের পক্ষে স্বয়ং স্রষ্টার কাজ সম্পর্কে তড়িঘড়ি কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। এবং আল্লাহ যা সৃষ্টি করবেন, সে সৃষ্টির মূলতথ্য প্রকাশ হবার পূর্বে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ প্রকাশ করা উচিত নয়। তবুও সে সন্দেহটা এমন যে, যার ভেতরে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়। মহান আল্লাহ সেসব রহস্য অবগত আছেন যা তোমরা জানো না। আর তাঁর জ্ঞানের জগতে এমন বিষয় রয়েছে, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন চেতনাই নাই।

এই কাহিনী অর্থাৎ ফেরেশতাদের সাথে মহান আল্লাহর কথোপকথন সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বর্ণনা করছেঃ-

ahlussunnah-bd.blogspot.com

واذ قال ربك للملٰئكة انى جاعل فى الارض خليفة-
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء-
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك-قال انى اعلم مالا
تعلمين-وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على
الملٰئكة-فقال انبٔونى باسماء هٰؤلاء ان كنتم
صدقين-قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ما علمتنا-انك
انت العليم الحكيم-قال يادم انبٔهم وقلنا يادم اسكن
انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث

আর সেই সময়ের কথা স্বরণ করো, যখন তোমাদের রব ফেরেশতাদের বললেন আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা নিযুক্ত করতে যাচ্ছি। তাঁরা বললো, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে নিযুক্ত করছেন যারা নিয়ম শৃংখলা নষ্ট করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে ? আপনার প্রশংসা ও স্তুতি সহকারে তসবীহ পাঠ ও আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ তো আমরাই করছি। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। তারপর আল্লাহ তায়ালা আদমকে সমস্ত জিনিষের নাম শিখালেন এবং তা সবই ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয় (কাউকে খলীফা নিযুক্ত করলে বিপর্যয় দেখা দিবে) তাহলে তোমরা এইসব জিনিষের নাম বলে দাও।

তাঁরা বললো, সব ধরনের দোষ ত্রুটি হতে একমাত্র আপনিই মুক্ত। আমরা তো শুধু ততটুকুই জানি, যতটুকু আপনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই। তারপর আল্লাহ বললেন, হে আদম ! তুমি এই জিনিষগুলোর নাম এদেরকে বলে দাও। আদম তখন তাদেরকে সমস্ত নামগুলো বলে দিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, তোমাদের কি বলিনি যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর সেই সমস্ত নিগুঢ় তত্ত্ব জানি যা তোমরা জানো না। বস্তুত তোমরা যা প্রকাশ করো আমি তাও জানি এবং যা গোপন করো আমি তাও জানি। (সূরায়ে বাকারাহ্, আয়াত নং-৩০-৩৩)

পবিত্র কোরআনের ৭ টি সূরায়ে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনী যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, কিছু কথা বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বর্ণনার ধরণ ভিন্ন। কোন কোন কথা এক সূরায় বলা হয়েছে, তা অন্য সূরায় বলা হয়নি। কোন সূরায় তা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, আবার কোন সূরায় তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে মুল ঘটনা জানা যায় যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টির কথা শুনে ফেরেশতাদের ভেতরে একটু দ্বিধা জেগেছিল।

ফেরেশতাদের ধারণা হয়েছিল, স্বাধীন ক্ষমতা দান করে অর্থাৎ এতবড় ক্ষমতা দান করে যদি কাউকে প্রেরণ করা হয়, তাহলে এই শান্তিময় পৃথিবীতে নানা ধরনের অশান্তি, দাঙ্গা, ফ্যাসাদ রক্তপাত ঘটবে বলে তাদের ধারণা হয়েছিল। বর্তমানে যে শান্তি বিরাজ করছে, এই শান্তি আর থাকবে না। ফেরেশতাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব তো ফেরেশতাগণ যথাযথভাবে পালন করছে, আল্লাহর তাসবীহ তাকদীসে কোন রকম ত্রুটি করছে না বা তাঁরা কোন কমতি করছে বলে তাদের জানা নেই, তাহলে তাদের এই খেদমতে কি আল্লাহ সন্তুষ্ট নন ? তাদের ওপরে অর্পিত দায়িত্ব আরো ভালোভাবে পালন করার জন্যই কি আল্লাহ নতুন আরেকটি সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন ?

আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, তোমাদের ধারণা ঠিক নয়। কেননা, আমি কেন এই নতুন সৃষ্টি করছি তা কেবলমাত্র আমিই জানি। কারণ, এই সৃষ্টি হবে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন। ফেরেশতাদের যাতায়াতের জন্য কোন বাহনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই আদম সন্তানের তা হবে। তাঁরা নিজের হাতে বাহন তৈরী করবে এবং ব্যবহার করবে। ফেরেশতাদের বাড়ি-ঘর প্রয়োজন হয় না। এই আদম সন্তানের তা হবে। তাঁরা নিজের হাতে অপূর্ব সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করে তাতে বসবাস করবে। তাঁরা এমন এমন বস্তু আবিকার করবে এবং ব্যবহার করবে যে, তোমরা তা বুঝতে পারছো না।

তাদের ভেতরে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, কবি হবে, সাহিত্যিক হবে, কারিগর হবে, বৈজ্ঞানিক হবে, তথা নানা ধরনের গুণাবলী তাদের ভেতরে বিকশিত হবে। তাঁরা উড়ন্তযান তৈরী করে তা ব্যবহার করে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে চলে যাবে। তাঁরা পৃথিবীর বস্তুসমূহ ব্যবহার করে এমন সব জিনিষ প্রস্তুত করবে, যে সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা নেই কিন্তু আমি জানি তাঁরা কি করবে। তাঁরা বিয়ে করে সংসার করবে, সন্তান জন্মদান করবে। এত কিছুর ভেতরেও তাঁরা আমার দাসত্ব করবে। আমার তসবীহ করা আর আদেশ পালন করা ব্যতীত তোমাদের আর কোন কাজ নেই। কিন্তু এই আদম সন্তান এত কিছু করবে, তাঁরা এত ব্যস্ত থাকবে তারপরেও আমার আইন পালন করবে, আমার দাসত্ব করবে, আমার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তদান করবে, আন্দোলন করবে, সংগ্রাম করবে। এসব কিছুই আমার জানা আছে তোমাদের জানা নেই।

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-কে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করবেন। কিন্তু এই পৃথিবীতে আদম সন্তানদের জন্য আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, এসব কিছুর ব্যবহার, নাম ও গুণাবলীও তাঁকে শিক্ষাদান করলেন। এটা একটি সাধারণ নিয়ম। কেউ কোন নতুন জিনিষ যদি কাউকে দান করে তাহলে সে জিনিষের গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি জানিয়ে না দিলে সে তা কিভাবে ভোগ করবে ? কারণ তখন পর্যন্ত আদম আলায়হিস্ সালাম পৃথিবীর কোন জিনিষের নাম ও তার ব্যবহার গুণাগুণ সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিলেন না।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ব্যাপারটা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যাক, গ্রামের কোন একজন শহরে চাকরি করতে এসে মোমবাতি দেখে তার ব্যবহার শিখে ধারণা করলো, এই মোমবাতি কিছু যদি তার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া যায়, তাহলে বাড়ির লোকজন তা ব্যবহার করতে পারবে। মোমবাতি সে পাঠালো বটে কিন্তু তার ব্যবহার পদ্ধতি কিছুই লিখে জানলো না। বাড়ির লোকজন তা খাদ্য মনে করে খেয়ে পেট খারাপ করলো। তারপর তার শহরে মোমবাতি প্রেরকের কাছে পত্র লিখলো, লম্বা লম্বা গোল গোল ভেতরে সুতা পরানো মিষ্টি আর পাঠানোর প্রয়োজন নেই, কারণ তা খেয়ে সবার পেট খারাপ করেছে।

মোমবাতির ব্যবহার জানা ছিল না বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কোন জিনিষের ব্যবহার না শিখিয়ে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করলে তিনিও ঐ মোমবাতির মতই অবস্থা ঘটাতেন। এ কারণে প্রয়োজন ছিল, পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বেই তাঁকে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু নিচয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করা। মহান আল্লাহ তাকে তাই দান করেছিলেন। তিনি যেন এই পৃথিবীতে এসে কোন ধরণের সমস্যায় নিপতিত না হন। অনেকে বলে থাকে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পৃথিবীতে আসার পরে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে প্রয়োজন মত শিক্ষা দান করা হয়েছিল।

কিন্তু কোরআনের বর্ণনার মোকাবিলায় তাদের ধারণা টিকে না। কারণ উল্লেখিত আয়াতে প্রমাণ হচ্ছে, পৃথিবীতে প্রেরণের পূর্বেই মহান আল্লাহ তাঁকে যাবতীয় বস্তুর নাম ও ব্যবহার শিক্ষাদান করেছিলেন। সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণ হচ্ছে যে, পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর কিছু কিছু অংশ সেখানে আল্লাহ একত্রিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর ফেরেশেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এবার তোমরা এসব বস্তুর নাম বলো। ফেরেশতাগণ অপারগতা স্বীকার করলে আল্লাহ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-কে জমাকৃত ঐসব বস্তুর নাম বলতে বলেছিলেন। তিনি প্রতিটি বস্তুর নাম ও তার ব্যবহার এবং গুণাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এর অর্থ এটা নয় যে ফেরেশতাগণ পরাজিত হয়েছিলেন, বরং এর অর্থ এই যে, ফেরেশতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্য যে জ্ঞান তাদের প্রয়োজন তাদেরকে সেই জ্ঞানই মহান আল্লাহ শিক্ষাদান করেছিলেন আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন তা তাকে শিক্ষাদান করেছিলেন। কোন বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত আদমকে যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন তাঁর দেহের আকৃতি ছিল ষাট হাত লম্বা। মানুষের সেই আকৃতি হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান আকৃতিতে এসে পৌছেছে। বাইবেলের বর্ণনা মতে তিনি এই পৃথিবীতে ৯৩০ বছর জীবিত ছিলেন। তবে সঠিক কত দিন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন, তা বলা অত্যন্ত কঠিন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত হাওয়াকে দায়ী করা অপরাধ

আলায়হিস্ সালাম

গন্ধম ফল ভক্ষণ করার জন্য হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম দায়ী, এ কথা ইসলামের নয়–এই কথা খৃষ্টানদের মনগড়া ধর্ম গ্রন্থের। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম মানব জাতির আদি পিতা এবং হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম হলেন আদি মাতা। আদম আলায়হিস্ সালাম-কে সৃষ্টি করার পর হতে এই পৃথিবীতে প্রেরণের যে বর্ণনা পবিত্র কোরআনের ৭ টি সূরায় করা হয়েছে, এ বর্ণনার ভেতরে হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম–এর পৃথক কোন ভূমিকা আবিষ্কার করা যায় না। এতটুকুই দেখতে পাওয়া যায়, তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর মতই মহান আল্লাহর একান্ত অনুগত ।

কোরআনের বর্ণনা থেকে আরেকটি বিষয় সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি তাঁর স্বামীর পরম অনুগত ছিলেন। তাঁর স্বামী শয়তানের ধোকায় পড়ে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করতে অগ্রসর হচ্ছেন, তিনি তা দেখছিলেন। তিনি স্বামীকে বাধা দান করেননি। এতে প্রমাণ হয়, তিনি স্বামীর এ সম্পর্কে স্বামীর আনুগত্য করেছেন। কিন্তু কাসাসুল আম্বিয়া বর্ণনা করছে, তিনিই হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-কে নানাভাবে ফুসলিয়ে গন্ধম ফল খাওয়ায়েছিলেন, অর্থাৎ সমস্ত পাপের উৎস হলো হাওয়া আলায়হিস্ সালাম–মানে একজন নারী। এ কারণেই শাস্তি হিসেবে প্রতি মাসে মাসে নারীকে ঋতুস্রাব দিয়ে বিশেষ আযাব দান করা হয়, গর্ভ ধারণ এবং প্রসবের যন্ত্রণা দিয়ে তাকে শাস্তি দান করা হয়।

এই বর্ণনা কোরআন হাদিসের নয়। এই বর্ণনা বাইবেলের। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মমতের আবিষ্কারকগণ এই মত সমর্থন করেন। পবিত্র কোরআন বলছে, ঋতুস্রাব বা গর্ভ ধারণ তাদের শাস্তি নয়। আল্লাহ তাদেরকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। নারীর শারীরিক গঠনই প্রমাণ করে যে, তাকে গর্ভ ধারণ করার উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, ঋতুস্রাব না হলে একজন নারী গর্ভ ধারণে সক্ষম হয় না। তাদের এই কষ্টের জন্য তাদেরকে সীমাহীন পুরস্কারে ভুষিত্ করা হবে। হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বাইবেলের এই বর্ণনা পৃথিবীর নারী জাতির নৈতিক, আইনগত ও সামাজিক মর্যাদাকে নিম্ন পর্যায়ে ও ঘৃণ্য মানে পৌছনোর ব্যাপারে কতটা সাংঘাতিক ভাবে কাজ করেছে, নীচের আলোচনা হতে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পৃথিবীর কোন আদর্শ এবং তথাকথিত ধর্মমত নারীকে মর্যাদা দান করেনি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে এই পৃথিবীতে বন্য একটা পশুর যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল, মনুষ্য সমাজে-মনুষ্য জাতির অর্ধেক নারী জাতির সে সম্মান -মর্যাদা ছিল না। মানুষ হিসেবে নারীকে গন্যই করা হতো না। তদানীন্তন পৃথিবীতে কোন একটি দেশেই নারীকে তাঁর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়নি। তাঁর সাথে সর্বত্র যথেচ্ছা ব্যবহার করা হয়েছে। নারীর সাথে সীমাহীন বাড়াবাড়ি এবং চরম নুন্যতার এক বিস্ময়কর নির্যাতন করা হয়েছে । নারী একদিকে মাতারূপে সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করেছে, পুরুষের অর্ধাংগিনী সেজে তার জীবনের উত্থান-পতনে তাকে সহযোগীতা করেছে, তাকে শারীরিক ও মানসিক শান্তি দান করেছে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আবার এই পুরুষই নারীকে গরু ছাগল ও সেবিকা এবং দাসী হিসেবে ক্রয়-বিক্রয় করেছে। মালিকানা ও উত্তরাধিকার হতে তাকে বঞ্চিত করেছে। নারীকে পাপ পংকিলতার ও লাঞ্ছনার প্রতিমূর্তি করে রাখা হয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন বা তার ক্রমবিকাশের কোন সুযোগই তাকে দেয়া হয়নি। ছিল না তার কোন সামাজিক মর্যাদা। কোন সহায়-সম্পত্তিতে তার কোন ধরণের অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কোন পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে পরিবারের সবার চেহারা লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে যেত।

কোথাও কন্যা সন্তানকে অমর্যাদার প্রতীক ভেবে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। একজন পুরুষ তার ইচ্ছে অনুসারে যতগুলো খুশী বিয়ে করতে পারতো। কিন্তু একটা নারী তার বিয়ে হলে স্বামীর যে কোন ধরণের অত্যাচার মুখ বন্ধ করে তাকে সহ্য করতে হতো। কোথাও তার স্বামী তালাক দিলে বা স্বামী মারা গেলে তার আর দ্বিতীয় বিয়ে করার কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। কোথাও নারীকে তার স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে তাকেও আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হত। কোথাও নারীর যৌবনকে ব্যবসার পুজি বানিয়ে তার যৌবন বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা হত। কোথাও নারীকে উলংগ হতে বাধ্য করা হত এবং ঐ অবস্থায় তাকে দিয়ে শতশত মানুষের কামুক দৃষ্টির সামনে দৌড় প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত করা হত।

হিন্দু ধর্ম নারীর কোন সম্মান ও মর্যাদাই প্রদান করেনি। সতীদাহের মত নির্মম নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথা হিন্দু ধর্মেরই আবিষ্কার । পুরুষ একাধিক বিয়ে বা স্ত্রী বিয়োগের পরে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার লাভ করবে, কিন্তু নারীর সে অধিকার নেই। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে একটা নারীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অমানবিক ব্যবস্থা দান করেছে হিন্দু ধর্ম। কোন নারী যদি সৌভাগ্য ক্রমে স্বামীর জ্বলন্ত চিতা থেকে বেঁচে যেত, তাহলে তাকে পদে পদে এমনভাবে তিরস্কার করা হত যে, সে নারীর পক্ষে বেঁচে থাকার চেয়ে না থাকাই উত্তম বিবেচিত হত।

হিন্দু ধর্মে একটা পুরুষ একই সাথে দশজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারে। রাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের ছিল পাঁচজন, পাঁন্ডুর ছিল দুইজন, অর্জুনের ছিল তিনজন স্ত্রী। এদের মধ্যে তালাক প্রথা নেই। ফলে যথেচ্ছা অত্যাচার করলেও মুক্তির কোন বিধান নেই। স্বামী হলো নারীর দেবতা। অতএব দেবতা কোন পাপ করতে পারেনা।

দিনরাতের এমন কোন মূহুর্ত নেই যে মূহুর্তে নারী স্বাধীন থাকতে পারে। সমস্ত ক্ষমতা স্বামীর অধিকারে থাকবে। নারী স্বাধীন হবার যোগ্য নয়। নারী তার জীবনে তার ইচ্ছে মত কাজ করতে পারবে না। পিতা তার কন্যাকে যার সাথে বিয়ে দেবেন, সে যেমনই হোক না কেন–তার সাথেই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পরে তাকে আজীবন নিষ্ঠুর বৈধব্য ব্রত পালন করতে হবে। নারীর সখ আহ্লাদ বলে কোন কিছু থাকতে পারে না।

শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, ব্যভিচারের ইচ্ছা, আত্মগর্ব, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মিথ্যা বলা এবং যে কোন পুরুষ দেখলেই তার সাথে দেহ মিলনের ইচ্ছা নারীর স্বভাবের অন্তরগত। কোন ধরণের পরামর্শ নারীর সাথে করা যাবেনা,

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পরামর্শের সময়ে নারীকে কাছেও রাখা যাবেনা। এই পৃথিবীতে পুরুষ পাপ করলে পরজন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

নারী জাতি হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। নারী দাস সম্প্রদায়ভুক্ত। কোন মানুষকে যদি এক হাজারটা মুখ দিয়ে হাজার বছর জীবিত রাখা হয় আর সে যদি তার এক হাজারটা মুখ দিয়ে প্রতিটি মূহুর্ত নারীর দোষ বর্ণনা করে, তবুও নারীর দোষ বলে শেষ করতে পারবে না। ধন-সম্পদে নারীর কোন অধিকার নেই। ঋণে ডুবে থাকা ব্যক্তি পর জন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা গ্রহণের কোন অধিকার নারীর নেই।

উল্লেখিত সমস্ত কথাগুলো হিন্দু ধর্মের। নারীর সম্মান ও মর্যাদা তারা কেমন করে কিভাবে দিয়েছে ঐ কথাগুলো পড়লেই উপলব্ধি করা যায়।

অহিংসা পরম ধর্ম–এটা হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। যে কোন প্রাণী হত্যা করা বৌদ্ধ ধর্মে নিষিদ্ধ। সেই ধর্ম নারী সম্পর্কে বলছে–নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। নারীর সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা তাদের প্রতি কোন অনুরাগ রেখোনা। তাদের সাথে কোন ধরণের কোন কথা বলবে না। পুরুষদের জন্য নারী ভয়ংকর বিপদ স্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গীদ্বারা পুরুষের বিশ্বাস নামক সম্পদ লুটে নেয়। নারী একটা ছলনা বৈ কিছুই নয়। নারী থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। নারীর সাথে একত্রে থাকা অপেক্ষা বাঘের মুখে তার খাদ্য হিসেবে যাওয়া বা ঘাতকের তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেওয়া অতি উত্তম।

বৌদ্ধ ধর্মের উপখ্যানে এ ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, উরুবিল্ব গোত্রপতির মেয়ে মারা গেলে একদিন স্বয়ং বুদ্ধ তার কবর খুলে মেয়েটার কাফনের কাপড় নিয়ে গেলেন এবং তা দিয়ে জামা বানিয়ে ব্যবহার করলেন। (সেন্ট হিলার-বুদ্ধ এন্ড হিজ রিলিজিয়ান–পৃঃ-৫০)

মহান মায়ের জাতি নারী সম্পর্কে উল্লেখিত কথাগুলো বৌদ্ধ ধর্মের। এ কথাগুলো পাঠ করলে অনুধাবন করতে কষ্ট হয়না, এই ধর্ম নারী জাতিকে কি ধরণের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ইহুদী ধর্মেও নারীর কোন মর্যাদা নেই। নারী সম্পর্কে এই ধর্মের বক্তব্য হলো–নারী পাপের প্রসবন। কোন ভালো কাজ করার কোন যোগ্যতা নারীর নেই। এ কারণে সে কোন সম্মান পেতে পারে না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগ করার জন্য। নারী জাতি সৃষ্টির আদি থেকেই পাপের উস্কানি দিয়ে আসছে। নারীকে কোন ধরণের সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা যাবে না। কোন নারীর স্বামীর সাথে যদি অন্য পুরুষের ঝগড়া শুরু হয়, আর নারী যদি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায়, এটা তাঁর ক্ষমাহীন অপরাধ।

এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নারীর উভয় হাত কেটে দিতে হবে। নারীকে যে কোন সময় যে কোন কারণে বা কোন কারণ ব্যতীতই তালাক দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি পুরুষের এই বলে দোয়া করা উচিত যে, হে স্রষ্টা ! তুমি আমাকে যে নারী না করে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছো, এ কারণে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ওপরে উল্লেখিত কথাগুলো পাঠ করার পরে আর ব্যাখ্যার দাবী রাখে না, ইহুদী ধর্ম নারীকে কোন দৃষ্টিতে দেখে। এই ইহুদীদের মধ্যেই শিশু কন্যাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা চালু ছিল।

পারসিক ধর্ম নেতার নাম যরথুষ্ট্র। তার প্রবর্তিত ধর্মেও নারীর কোন মর্যাদা রাখা হয়নি। এমন সব বিধান রাখা হয়েছে নারীর জন্য, যা চরম অমানবিক। যরথুষ্ট্র নারী সম্পর্কে বলেছেন, যে নারীর সন্তান নেই সে নারী পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যেতে পারবে না। সুতরাং নারী যেন অন্য কারো সন্তান গর্ভে ধারণ বা পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে।

নারীর মাসিক হলে এই ধর্মে তাকে চরমভাবে ঘৃণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোন পুষ্পবতী নারী যেন সূর্য না দেখে এবং কোন পুরুষের সাথে কথাও না বলে। আগুনের দিকে সে যেন না তাকায়। পানিতে অবতরণ না করে। অন্য কোন পুষ্পিতা নারীর সাথে একত্রে শয়ন না করে। কোন খাদ্য যেন স্পর্শ না করে। কোন পাত্র ধরতে হলে যেন হাতে কাপড় জড়িয়ে নেয়। কোন ঋতুবতী নারী এই সমস্ত আদেশ অমান্য করলে তার জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যাবে। ঋতুকাল নারীর একটি পাপ কাল। বছরে তার জন্য একটি মাস নির্ধারিত রয়েছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য।

সন্তান প্রসবকারিনী নারীর দুর্ভোগের শেষ ছিল না। সন্তান প্রসবের পরে নারী এমনই অপবিত্রা হয়ে যেত যে, সে নারী ঘরের বাইরে আসতে পারবে না। এমন কি বারান্দায় পর্যন্ত আসা যাবে না। মাটিতে পা রাখলে মাটি পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে যেত, কোন কাঠের পাত্র নারী স্পর্শ করতে পারবে না। এধরণের নানা বন্ধনে নারীকে বেঁধে রেখেছে এই ধর্ম। নারী তার স্বামীর দাস বৈ আর কিছুই নয়। এখানে নারীর জীবন তার কাছে এক ঘৃণ্য বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর আগমনের পঁচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরথুষ্ট্রের যুগ। এই ধর্মে যৌনাচার লাগামহীন। ফলে যারা নিজেদের যৌবনকে কানায় কানায় উপভোগ করতে চাইতো তারা সে যুগে দলে দলে এই ধর্মে প্রবেশ করেছিল। সম্রাট কায়খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এই মতবাদ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সম্রাট পারভেজও এই মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মকে বলা হয় মওজুসিয়াত। যৌনাচারের কোন বাঁধাধরা আইন ছিল না বলে সম্রাট পারভেজ তার ভোগের জন্য বার হাজার নারীকে বিয়ে করেছিলেন। যৌন ক্রিয়া করার ক্ষেত্রে কোন বাছ-বিচার নেই। যে কোন সময় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক বা হত্যা করার অধিকার রাখে এই ধর্মে। নিজের স্ত্রীকে প্রয়োজনে অন্য কারো ভোগের জন্য দেয়া কোন পাপের বিষয় নয়। নারীকে যে কোন সময় বিক্রি করে দেয়া যায়।

সতিন পুত্র সৎ মা'কে ভোগ করতে পারে। এই ধর্মের আরেক ধর্মীয় নেতা ময়ুকের মতানুসারে, ধন-সম্পদ ও নারী হলো সমস্ত পাপের মূল উৎস। নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পদ হতে পারে না। নারী হলো জাতীয় সম্পদ। সুতরাং একা কেউ কোন নারীকে ভোগ করতে পারবে না। উঠিয়ে দেয়া হলো বিয়ে প্রথা।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ধর্মনেতা ময়ুকের এই যৌনাচারের নীতির সাথে ভারতের ভগবান রজনীশের যৌননীতির হুব-হু মিল দেখতে পাওয়া যায়। পারস্য সম্রাট শাহ কাবাদ এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তিনি সাম্রাজ্য ব্যাপী এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলেন। ফলে যে কোন লোক প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজপরিবারের নারীদেরকে ভোগ করতে পারতো। সম্রাট নিজেও যে কোন লোকের স্ত্রীকে ভোগ করতে পারতো।

বর্তমান পৃথিবীতে খৃষ্টানরা নিজেদেরকে সবচেয়ে সভ্য বলে দাবী করে। তারাই না কি নারী জাতির আসল ত্রাণকর্তা। আসলে এই খৃষ্ট ধর্ম নারীকে মানুষ হিসেবেই স্বীকার করে না। এরা নারীকে সমস্ত পাপের প্রতীক হিসেবে বিশ্বাস করে। তাদের মতে মানুষের আদি মাতা হাওয়ার ভূলের কারণে নারীর রক্তে পাপ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুতরাং মানব শরীরে মাতৃরক্তের অংশ থাকে বলে সমস্ত মানব জাতিই পাপী। পাপ নিয়েই তারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। যিশু নিজেকে উৎসর্গ করে মানুষকে এই পাপ থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। স্বয়ং যিশু তার মা নারী বলে তাকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন। ধর্ম যাজক ইউহান্নার মতে, নারী ছলনাময়ী-তার থেকে দূরে অবস্থান করা উচিত।

নারী শয়তানের প্রতিচ্ছায়া-শয়তানের শক্তি। সে বিষধর সাপের ন্যায় রক্ত পিপাসু। নারীর ভেতর সাপের বিষ নিহিত রয়েছে। নারী এমনই এক বিচ্ছু–যা প্রতি মূহুর্তে দংশন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। নারী শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। মানুষের মনে পাপের জগত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নারী শয়তানকে সাহায্য করে। সমস্ত পাপের মূল উৎস হলো নারী।

নারীর যাবতীয় আশা আকাংখা, ইচ্ছা প্রবৃত্তি স্বাধীন নয়–এসবই পুরুষের অধিনে থাকবে। নারীর ওপরে প্রভুত্ব করবে পুরুষ। নারী শয়তানের প্রবেশ দ্বার। যাবতীয় দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী হলো নারী। নারী রূপে জন্মগ্রহণ করা এক লজ্জার ব্যাপার। শয়তানের মারণ যন্ত্র হলো নারী। নারী পৃথিবীবাসীর জন্য অভিশাপ। নারী একটি অনিবার্য পাপ, একটি জন্মগত দুষ্ট প্ররোচনা, একটি আনন্দদায়ক বিপদ, ধ্বংসাত্মক প্রেমদায়িনী।

নারী সম্পর্কে খৃষ্টানদের এই হলো চিন্তাধারা। কেননা, তাদের ধর্মই নারী সম্পর্কে এমন বিরূপ ধারণা তাদেরকে দান করেছে। এ কারণেই বোধহয় গোটা পাশ্চাত্য জগতে নারীর কোন ভোটের অধিকার ছিল না। মাত্র কয়েক বছর পূর্বে নারী তার ভোটের অধিকার লাভ করেছে। খৃষ্টান ধর্মীয় নেতাদের মতে নারীকে স্পর্শ করাও হারাম।

এ কারণে বহু খৃষ্টান ধর্মনেতা তার গর্ভধারিণী মা'কে পর্যন্ত স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতো। তাদের ধারণা হলো, নারীর স্পর্শ ঘটলেই পুরুষের সমস্ত ইবাদাত ধ্বংস হয়ে যায়। কোন ধর্মনেতা যদি তার মা'কে একান্তই স্পর্শ করতে বাধ্য হতেন

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তাহলে তিনি তার সমস্ত শরীরে কাপড় জড়িয়ে নিতেন। কোন কোন ধর্ম নেতা নারীকে দর্শন পর্যন্ত করতো না। তাদের ধারণা ছিল, নারীকে দর্শন করলেই সমস্ত ইবাদাত বরবাদ হয়ে যাবে। এ কারণে তারা লোকালয় ছেড়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করতো।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে গোটা পৃথিবী ব্যাপী এই ছিল মায়ের জাত নারীর অবস্থা। নারীকে মানব সমাজের মধ্যেই গন্য করা হতো না। ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহবর থেকে নারীকে টেনে উঠিয়ে পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশী মর্যাদা দিয়ে সম্মানের আসনে আসীন করে দিয়েছেন নারী মুক্তির অগ্রদূত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছিলেন, এ কারণে পবিত্র কোরআনের কোথাও হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালামকে দায়ী করা হয়নি। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম যখন যা করেছেন, তিনিও অনুগত স্ত্রীর মত তাই করেছেন। স্বামীর সাথে সাথে তিনিও শয়তানের প্রতারণায় পড়েছিলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কোন ক্রমেই তিনি তাঁর স্বামীকে ভুল পথে টেনে নেবার চেষ্টা করেননি। আদর্শ নারীর মতই তিনি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টি তথা নারী জাতির সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন হাদিস হতে যা জানা যায় তাহলো, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে সাথেই হযরত হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীর সৃষ্টি কোন অভিনব সৃষ্টি নয়। পৃথিবীতে মানব বংশ বৃদ্ধির জন্যই পরিকল্পিতভাবে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নারী সম্পর্কে যে অমূলক ধারণা প্রচলিত করা হয়েছে, এর কারণ হলো নারীকে যেন পুরুষের দাস করে রাখা যায়। কোন হাদিসের বর্ণনায় এসেছে, নারী হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর পাঁজড়ের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদিসে কথাটা রূপক অর্থে বলা হয়েছে। নারীর স্বভাবের ভেতরে যা প্রয়োজনীয়, সে স্বভাব আল্লাহ তাকে দান করেই সৃষ্টি করেছেন। তাদের ভেতরে সে স্বভাব এবং গুণ বৈশিষ্ট্য না থাকলে তাদের পক্ষে সংসারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব অর্থাৎ সন্তানকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা, তা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। একটি নারীর ভেতর থেকে আরেকটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ এই পৃথিবীতে আগমন করে। ফলে নারীর দেহে যে শুন্যতা সৃষ্টি হয়, তা এক কথায় অপূরণীয়। এ কারণে তাদের মন-মানসিকতায়, মেজাজে রুক্ষভাব সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

যে স্বভাব পুরুষের কাছে বাঁকা বা জেদী মনে হতে পারে। পাঁজড়ের হাড় যেমন মানব দেহে অপ্রয়োজনীয় নয়, যা না থাকলে মানব দেহ টিকবে না। সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে না। তেমনি নারীর অবস্থা। নারী ব্যতীত এই পৃথিবী অচল। তাদের নানা দুর্বলতার কারণে তাদের সাথে সেভাবেই ব্যবহার করতে হবে। তাদের মন-মানসিকতা ও মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সাথে আচরণ করতে হবে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নারীর দ্বারা পুরুষ যদি কোন কল্যাণ লাভ করতে চায়, তাহলে তাদের প্রকৃতি বুঝে আচরণ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

পবিত্র কোরআনে হযরত আদম সম্পর্কে আলোচনা

আলায়হিস্ সালাম

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পৃথিবীর প্রথম মানুষ, নবী-রাসুল এবং বিজ্ঞানী। তাঁর থেকেই মানব জাতির সূচনা। আর মানব জাতির জন্য সর্ব শেষ হেদায়েত হলো পবিত্র কোরআন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আর কোন নবী আসার কোনই অবকাশ নেই। আল্লাহর বিধানেরও কোন ধরণের পরিবর্তন হবে না। পবিত্র কোরআনের বিধানই মানব জাতিকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণ করে চলতে হবে। কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যত সমস্যার সৃষ্টি হবে, তার সমাধান মহান আল্লাহ এই কোরআনে দান করেছেন।

এ কারণে বিষয়টি প্রণিধান যোগ্য যে, হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এই কোরআন প্রথমেই আলোচনা করেছে। মহান আল্লাহ যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা এই কোরআনে আলোচনা করেছেন, তার ভেতরে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনাই সর্বপ্রথমে আলোচিত হয়েছে। সূরা বাকারাহ, সূরা আরাফ, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহ্ফ ও সূরা ত্ব-হায় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর নাম, গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা হিজর ও সূরা ছোয়াদে শুধুমাত্র তাঁর গুণাবলী এবং সূরা ইমরাণ, সূরা মায়েদাহ, সূরা মারিয়াম ও সূরা ইয়াসিনে আনুসাঙ্গিক রূপে তাঁর নামের উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনা যদিও বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা বর্ণনার উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

ঐতিহাসিক বর্ণনা কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে শুধু ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেই নয়, মানব জাতিকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এসমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনা থেকে মানুষ যেন শিক্ষা গ্রহণ করে। ইবলিস কিভাবে আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো, এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ যেন এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা যাবে না।

যে আল্লাহ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করছেন, সেই আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা মারাত্মক অন্যায়। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত হাওয়া আলায়হিস্ সালাম ভুল বুঝতে পারার সাথে সাথেই যেমন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রর্থনা করেছিলেন, মানুষকে এই ঘটনা শুনিয়ে আল্লাহ এই শিক্ষাই দান করলেন, তোমরা ভুল করার সাথে সাথে ইবলিসের মত সেই ভুলের প্রতি প্রতিষ্ঠিত না থেকে আমার কাছে আদমের মত ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি ক্ষমা করে দেব। ক্ষমার মাধ্যমে হতাশা বাদীদেরকে বুঝানো হয়েছে, পাপ করার দরুণ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হতাশ হয়ে অধিক পাপের জন্ম না দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি ক্ষমা করে দেব।

পবিত্র কোরআনে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর নাম পঁচিশটি আয়াতে পঁচিশ স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বাকারাহ্-এর ২১-২৩-৩৪-৩৫ ও ৩৭ নম্বর আয়াতে। সূরা ইমরাণ-এর ২৩ ও ৫৯ নম্বর আয়াতে। সূরা মায়েদাহ্-এর ২৭ নম্বর আয়াতে। সূরা আরাফ-এর ১১-১৯-২৬-২৭-৩১-৩৫ ও ১৭২ নম্বর আয়াতে। সূরা বনী ইসরাঈল-এর ৬১ ও ৭০ নম্বর আয়াতে। সূরা কাহ্ফ-এর ৫০ নম্বর আয়াতে। সূরা মারিয়াম-এর ৫৮ নম্বর আয়াতে। সূরা ত্ব-হা-এর ১১৫-১১৬-১১৭-১২০ ও ১২১ নম্বর আয়াতে। সূরা ইয়াসিন -এর ৬০ নম্বর আয়াতে।

আল্লাহর নবী হযরত ইদ্রিস

আলায়হিস্ সালাম

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পবিত্র কোরআন এবং কোরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদিসসমূহ যে সমস্ত ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনা করেছে, তা নিছক ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবেই বর্ণনা করেনি। মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যই বর্ণনা করা হয়েছে। অতীত কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের দ্বারা মানব সভ্যতা উন্নয়নের জন্যই এ সব কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ-

واذكر فى الكتب ادريس-انه كان صديقا نبيا-

ورفعنه مكانا عليا (مريم)

আর স্বরণ করুন এই কিতাবে ইদ্রিসের কথা। সে এক সত্যপন্থী মানুষ এবং নবী ছিল। আর তাকে আমি উচ্চতর স্থানে উন্নীত করেছি। (সূরা মারিয়াম, আয়াত নং-৫৬-৫৭)

অর্থাৎ হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম একজন নবী ছিলেন এবং মহান আল্লাহ তাঁকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর মত অনেকেই যারা তাঁর মত ছিল, তাদেরকে মহান আল্লাহ নিজের রহমত দান করেছিলেন, তাদের বৈশিষ্ট্য কি ছিল, তাঁরা কোন ধরনের গুণের অধিকারী ছিলেন, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ-

واسمعيل وادريس وذاالكفل-كل من الصبرين-

وادخلنهم فى رحمتنا-انهم من الصلحين (الانبياء)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আর এই নিয়ামত ইসমাঈল, ইদ্রিস ও যুলকিফলকে দিয়েছি। এরা ধৈর্যশীল লোকছিল। আর তাদেরকে আমি নিজের রহমতে শামিল করে নিলাম, কেননা, তাঁরা সৎ লোকদের মধ্যে শামিল ছিল। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং-৮৫-৮৬)

আল্লাহর কোরআন হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে উল্লেখিত দুই স্থানে শুধু তাঁর নাম এবং গুণের উল্লেখ করেছে। তাঁর সম্পর্কে আর কোন বর্ণনা কোরআনে নেই। বুখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদিসে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিরাজের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গিয়েছিলেন, তখন ৪র্থ আকাশে হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম-এর কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তখন হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম তাঁকে স্বাগতম জানিয়ে ছিলেন এবং ভাই বলে সম্বোধন করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিচয় সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছিলেন, তিনি আল্লাহর নবী হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম।

পবিত্র কোরআন ও হাদিস তাঁর নবুয়্যাত ও উচ্চ মর্যাদা আর অন্য কোন ব্যাপারে আলোচনা করেনি। হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম আর যেসব বর্ণনা পাওয়া যায় তার অধিকাংশ বর্ণনা বাইবেলের। বাইবেলেও তাঁর সম্পর্কে এক ধরনের বর্ণনা নেই, পরস্পর বিরোধী বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বাইবেলে এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর দাদা ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আখনূখ এবং ইদ্রিস ছিল তাঁর উপাধি। অর্থাৎ আরবী ভাষায় তাঁর নাম ইদ্রিস, হিব্রু ও সুরিয়ানী ভাষায় তাঁর নাম আখনূখ। তাঁর বংশ পরিচয় হলো, ইদ্রিস ইবনে ইয়ারুদ ইবনে মাহ্লাঈল ইবনে ক্বীনান ইবনে আনূশ ইবনে শীষ আলায়হিস্ সালাম ইবনে আদম আলায়হিস্ সালাম।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে ইসহাক রাহ্মাতুল্লাহি আলাইহি উল্লেখিত মতামত সমর্থন করেছেন। তাঁর মত বিখ্যাত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম-এর উল্লেখিত বংশধারা সমর্থন করেছেন, সুতরাং সতর্কতার সাথে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

আরেক দলের বর্ণনা হলো হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম বনী ইসরাঈলদের মধ্যকার নবী ছিলেন। আর ইদ্রিস ও ইলয়াস আলায়হিস্ সালাম একই ব্যক্তির নাম এবং উপাধি। যারা দাবী করেন, হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম বনী ইসরাঈলদের নবী ছিলেন তাদের দাবী সত্য বলে গ্রহণ করলে, এটাই বিশ্বাস করতে হয় যে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এবং ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর ও অনেক পরের নবী ছিলেন হযরত ইদ্রিস আলায়হিস্ সালাম। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে তাদের এই দাবীর পেছনে ঐতিহাসিক সত্যতা বিদ্যমান নেই।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ইমাম বোখারী হাদিসের সমর্থনে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কাহতানিরা হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর। কিন্তু ইতিহাসে এ সম্পর্কে কিছুটা মত পার্থক্য বিদ্যমান। আবার কারো এ সম্পর্কে জোর সমর্থন রয়েছে যে, গোটা আরব জাতিই হলো হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর সুতরাং সেই সূত্রে তারা হযরত ইবরাহিম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর। পবিত্র কোরআনে সূরায়ে হজ্জের শেষ দিকে বলা হয়েছে, ইবরাহিম আলায়হিস্ সালাম মুসলিম জাতির পিতা। তিনিই তোমাদের নাম দিয়েছেন মুসলমান।

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পৌত্র হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর আরেকটি নাম ছিল ইসরাঈল। এ কারণেই তাঁর বংশধরদের বানী ইসরাঈল বলা হয়। ইসরাঈল শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহর বান্দাহ। ব্যাবিলন সম্রাট নমরুদের দরবারের রাজ পুরোহিত ছিল হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতা। এমন এক লোকের সন্তান হয়েও ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম শিরকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এ কারণে তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং মহান আল্লাহর অসীম রহমতে তিনি রক্ষা পান । তারপর তিনি পিতৃভূমি ইরাক ত্যাগ করে আরবের ভিন্ন এলাকায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর এক সন্তানের নাম হযরত ইসাহাক আলায়হিস্ সালাম। হযরত ইসাহাক আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান হলেন হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম। তাঁরই আরেক নাম ইসরাঈল।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর এই বনী ইসরাঈলগণ মহান আল্লাহর অনুগ্রহভাজন হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। বনী ইসরাঈলদের একটি শাখা পরবর্তীকালে নিজেদেরকে ইহুদী হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। হযরত ইয়াকুবের এক সন্তানের নামও ছিল ইয়াহুদা। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সন্তান হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম মিশরে চলে যান। তাঁর সন্তান হযরত ইউছুফ আলায়হিস্ সালাম-কে মহান আল্লাহ মিশরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন। এভাবে বনী ইসরাঈলগণ মিশরে বসবাস করতে করতে ক্রমশঃ তারা গোটা মিশরে প্রসার লাভ করে।

প্রায় চারশত বছর ধরে তারা দাপটের সাথে গোটা মিশর শাসন করে। কিন্তু নিজেদের সীমাহীন জুলুমের কারণে শাসন যন্ত্র তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। ফেরআউন নামক উপাধিধারী এক জালিম শাসক গোষ্ঠীর হাতে এই বনী ইসরাঈলগণ বা ইহুদীরা পরাজিত হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়। শাসক গোষ্ঠী তাদের ওপরে লোমহর্ষক নির্যাতন চালাতে থাকে।

অদূর ভবিষ্যতে ইহুদী জাতির মধ্যে যেন শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার মত কোন শক্তি দানা বাঁধতে না পারে, এ কারণে ফেরআউন শাসকবৃন্দ বনী ইসরাঈলদের বা ইহুদী জাতির সমস্ত পুত্র সন্তানকে নির্বিচারে হত্যা করে ফেলে। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর অসীম রহমতে হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম রক্ষা পান এবং ফেরআউনের বাড়িতেই প্রতিপালিত হন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম নবুওয়াত লাভ করার পরে তিনি বনী ইসরাঈলীদেরকে সুসংগঠিত করতে থাকেন ফেরআউনকে উৎখাত করার লক্ষ্যে। আন্দোলনের ধারা পরিক্রমায় তিনি তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে একদিন রাতে মিশর থেকে বের হয়ে পড়েন। তাঁরা সাগর পাড়ে জমায়েত হলে ফেরআউনও সৈন্য বাহিনীসহ তাদেরকে ধাওয়া করে।

মহান আল্লাহর নির্দেশে সাগরের পানি দু'ভাগ হয়ে বনী ইসরাঈলদের আত্মরক্ষার পথ করে দেয়। ঐ একই পথে ফেরআউন তার বাহিনীসহ এগিয়ে গেলে আল্লাহর আদেশে সাগরের বিভক্ত পানি পুনরায় এক হয়ে যায় এবং ফেরআউনের সদল বলে সলিল সমাধি ঘটে।

সাগর পাড়ি দিয়ে তারা সিনাই এলাকায় তীহ্ মরুভূমি অতিক্রম করে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে পানির তৃষ্ণায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাঁরা অস্থির হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাদের মাথার ওপরে মেঘমালা সৃষ্টি করে ছায়ার ব্যবস্থা করে দেন। শিলাখন্ড বিদীর্ণ করে তাদের জন্য পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করেন। সরাসরি আকাশ থেকে মান্ ও সালওয়া নামক বিশেষ খাদ্য প্রেরণ করেন। তাদের কোন পরিশ্রম করতে হয়নি কোন কিছুর জন্য। সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা আল্লাহ সরাসরি করে দেন। এর পরেও তারা আল্লাহ ও তাঁর নবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম ওহী লাভের জন্য মহান আল্লাহর আদেশে তুর পাহাড়ে গমন করেন। এই সুযোগে বনী ইসরাঈলগণ গরুর বাছুরের মূর্তি বানিয়ে তার পূজা আরম্ভ করে দেয়। হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম ফিরে আসার পরে তারা আবার তওবাহ করে, আল্লাহ তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দিলে মুসা আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। সেই হতভাগারা জবাব দেয় ঃ 'হে মুসা ! তুমি আর তোমার আল্লাহই গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা বসে বিশ্রাম গ্রহণ করবো।'

এই অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহ তাদের ওপরে গযব নাজিল করেন। তারা যাযাবরের মত দীর্ঘ চল্লিশ বছর পথে প্রান্তরে ঘুরতে থাকে। নিজের দেশ নেই,অপরের আশ্রয়ে থাকতে হয়–এভাবে অপমানজনক জীবন-যাপন করতে তারা বাধ্য হয়। এর মধ্যে তাদের সমস্ত বয়স্ক লোকগুলো ইন্তেকাল করে। হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম-ও ইতিমধ্যে মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন। এর দীর্ঘ দিন পরে তারা পুনরায় ফিলিস্তিনে বানী ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠির করে। রাষ্ট্র শক্তি হাতে পেয়ে এই অবাধ্য জাতি পুনরায় আল্লাহর দেয়া বিধানের সাথে বিদ্রোহ করে। এর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ জালুত নামক এক জালিম শাসককে তাদের ওপরে চাপিয়ে দেন।

জালুতের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তালুত নামক এক মহান নেতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তালুতের নেতৃত্বে তারা যুদ্ধ করে জালুত নামক জালিমের অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করে। তালুতের পরে হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম ও হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর নেতৃত্ব তারা লাভ করে। সে সময়ে তারা উন্নতির স্বর্ণ শিখরে গিয়ে পৌছে। কারণ, এ সময়ে আল্লাহর আইনের কঠোর প্রয়োগের কারণে তারা সৎ ভাবে জীবন পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত সোলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর অবর্তমানে অঢেল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে তারা পুনরায় অহংকারে ফেটে পড়ে। জুলুম অত্যাচারের সয়লাব বইয়ে দেয় তারা। চারিত্রিক অধঃপতনের শেষ স্তর অতিক্রম করে এই জাতি। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ প্রকাশ্যে আল্লাহর আইনের বিরোধীতা করতে থাকে। আলেম সমাজ ধনীক ও শাসক শ্রেণীর হাতের পুতুল বনে যায়। আল্লাহর বিধান শাসক ও সমাজের ধনীক শ্রেণীর স্বার্থে তারা পরিবর্তন করে দেয়। ক্ষমতাসীনদের মর্জি মাফিক আল্লাহর কালামের অপব্যাখ্যা করে শাসকদের সমস্ত কুকর্মের সমর্থন যোগাতে থাকে আলেম সমাজ।

বাইরে ইসলামের খোলসটা শুধু বজায় রেখে ভেতরে তার পরিপন্থী কার্যকলাপে তারা অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। জিনা ব্যভিচার মদ পানসহ যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সূদ ব্যবস্থা চালু করে নির্মম শোষন আরম্ভ হয়। মহান আল্লাহ তাদেরকে সংশোধন করার লক্ষ্যে একের পর আরেক নবী তাদের ভেতর প্রেরণ করতে থাকেন। ধ্বংসে অতল তলে নিমজ্জিত ইহুদী জাতিকে তারা উদ্ধারের যাবতীয় প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাহিনী। ইহুদী জাতি নবীদের ওপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে দেয়। বহু নবীকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে।

ইতিহাস বলে এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে ইসলামের আহ্বান আল্লাহর পথহারা বান্দাদের কানে যেন পৌছে যায়, এ চেষ্টা করতে করতেই মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম বয়েসের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলেন। তবুও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু পবিত্র কোরআন বলে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যে সময়ে তাঁর নিজের জন্মভূমি থেকে হিযরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন , সে সময়েই তিনি মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন, 'হে রাব্বুল আলামীন ! তুমি আমাকে সৎ সন্তান দান করো।'

এ সম্পর্কে কোরআনের সূরা সাফ্ফাতের ১০০ শত আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সে দোয়া কবুল করেছিলেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে নেক সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল।

বয়সের কোন প্রান্তে পৌছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তান লাভ করেছিলেন এ সম্পর্কে ইতিহাসে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। তাওরাতের সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখা যায়, তিনি ৮৬ বছর বয়েসে প্রথম সন্তান হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-কে লাভ করেন এবং ১০০ বছর বয়সে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-কে লাভ করেন। এই ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর থেকে যে বংশধারা সৃষ্টি হয়েছিল তারাই বনী ইসরাঈল নামে ইতিহাসে পরিচিত।

বনী ইসরাঈলীদের অসংখ্য অপরাধের মধ্যে এটাও আরেকটা মারাত্মক অপরাধ ছিল যে, তারা ইতিহাস বিকৃতিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। ভিন্ন জাতির শৌর্য, বীর্য, সম্মান-সম্ভ্রম, মর্যাদা, অবদান, কৃতিত্ব নিজেদের নামে ইতিহাসে স্থান দিয়েছে। অন্য

ahlussunnah-bd.blogspot.com

জাতির ভেতর যে উত্তম গুণাবলী ছিল তা নিজেদের নামে প্রতিষ্ঠিত করার হীনচেষ্টা করেছে।

আর নিজেদের অপরাধ, কুকীর্তি, নিন্দনীয় গুণাবলী, পাশবিকতা অন্য জাতির ঘাড়ে অবলীলায় চাপিয়ে দিয়েছে। ইতিহাসে নানা সময়ে যে সমস্ত দল গোষ্ঠী ও জাতির সাথে তাদের ঝগড়া ফ্যাসাদ ঘটেছে, রেষারেষি হয়েছে তাদেরকে এরা বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এদের লেখা ইতিহাস এমনকি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেও উল্লেখিত কথার সত্যতা পাওয়া যাবে। আল্লাহর বিভিন্ন নবীর নামে এরা মিথ্যা কাহিনী রচনা করেছে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর নামে, দাউদ (আ)-এর নামে, লূত আলায়হিস্ সালাম-এর নামে, হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর নামে, ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর নামে, ইদ্রীস আলায়হিস্ সালাম-এর নামে ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী রচনা করেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুআবী ও আম্মুনী সম্প্রদায়ের সাথে ইসরাঈলীদের বিরোধ ছিল। সে কারণে তারা তাদেরকে জারজ জাতি বানিয়ে ছেড়েছে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম মোটেও আল্লাহর নবী ছিলেন না। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাকে আন্দোলনের কাজে সাদূম ভূখন্ডে প্রেরণ করেননি। এমনকি তাদেরকে উভয়ের ভেতর সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটে। তখন ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলেন। এরপর লূত জাতির উপরে যখন আল্লাহর গযব নেমে এসেছিল সে সময়ে তিনি তাঁর দুই মেয়েকে সাথে করে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তাঁর দুই মেয়ে তাকে মদ পান করিয়ে তাঁর সাথে যৌনক্রিয়া করে। ফলে তাঁর দুই মেয়েই গর্ভবতী হয়। পরবর্তীতে এক মেয়েরে গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করে মুআব নামক সন্তান এবং আরেক মেয়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল বিন্আম্মী নামক সন্তান। এদের দুই জনের মাধ্যমে দুটো জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

ইসরাঈলীগণ এভাবেই তাদের আক্রোশ মিটিয়েছে ইতিহাস বিকৃত করে এবং অন্যদের ওপর কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়ে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কেও নানা ভিত্তিহীন কাহিনী তারা রচনা করে তা তাদের ধর্ম গ্রন্থে স্থান দিয়েছে। হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্মের খুটিনাটি বিষয় আমাদের জানার একান্ত প্রয়োজন হলে মহান আল্লাহ এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানিয়েই দিতেন। যেটুকু জানানো প্রয়োজন তা কোরআন ও হাদিসে জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে বাইবেলের ওপর নির্ভর করার কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাইবেল কিভাবে তাদের মনগড়া কাহিনী প্রচার করেছে তা জানা প্রয়োজন এ কারণে যে, এক শ্রেণীর লেখক বা আলেম নামধারী ব্যক্তি বাইবেলের কাহিনীই সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে তা লিখছেন এবং তাদের বক্তৃতায় বর্ণনা করছেন।

যে বংশে অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বংশে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, সেই বংশের ওপরেও ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মবেত্তাগণ কলঙ্ক

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আরোপ করেছেন। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর গর্ভধারিণী হযরত হাজেরা-হযরত সারা আলায়হিস্ সালাম-এর দাসী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। একারণে তিনি একদিন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-কে বললেন ঃ আপনি আমার দাসীর সাথে যৌন মিলন করুন। যেন আমার বংশ রক্ষা হয়।

তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি হযরত হাজেরার সাথে মিলিত হলেন ফলে ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্ম হয়। একথা তাওরাতে বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ তাওরাতেই আবার বলা হয়েছে, মিশর সম্রাট হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-কে প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন । সে উপহারের ভেতর হযরত হাজেরাও ছিলেন।

এ বর্ণনা যদি যথাযথ হয়ে থাকে তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে যে, দাসীর সাথে মিলিত হবার জন্য সে সময়ে কারো অনুমতির প্রয়োজন হত না। আল্লাহর একজন নবী তাঁর স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করবেন আল্লাহর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে–বাইবেলের এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। আবার বাইবেল সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায় বর্ণনা করছে, আল্লাহর কাছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারপর তিনি হাজেরার সাথে মিলিত হলেন, হাজেরা গর্ভবতী হলো। এ সংবাদ হযরত সারা আলায়হিস্ সালাম অবগত হয়ে তিনি নানা প্রকারে হাজেরাকে উত্যক্ত করতে লাগলেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হাজেরা অন্যত্র চলে গেলেন। এরপর আল্লাহর ফেরেশতা তাকে পানির এক ঝর্ণার কাছে আবিস্কার করলেন। এটা ছিল সেই ঝর্ণা যা 'ছুরের' কাছে অবস্থিত।

হযরত হাজেরাকে ফেরেশতা বললোঃ হে সারার দাসী ! তুমি এখানে এলে কি করে এবং কোথায় যাচ্ছ ?

হাজেরা বললেন ঃ আমি সারার কাছে থেকে পালিয়ে এসেছি।

ফেরেশতা তাকে আদেশ দিয়ে বললেন ঃ তুমি সারার কাছেই ফিরে যাও এবং অনুগত থেকে তাঁর দাসী হয়ে থেকো। আমি তোমার বংশধারা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে দেব। এমনকি তাদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। এখন তোমার গর্ভে সন্তান। তুমি একটা পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম রাখবে ইসমাঈল। আল্লাহ তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেছেন। তোমার সন্তান হবে যাযাবর। তাঁর হাত সবার বিরোধী সবার হাত তাঁর বিরোধী হবে। সে তাঁর সমস্ত ভাইদের সামনেই বসবাস করবে।

হযরত হাজেরার সাথে ফেরেশতা যেখানে কথা বলেছিলেন সেখানে একটা কূয়া ছিল। হযরত হাজেরা স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ সেই কূয়ার নাম দিলেন 'জীবিত দৃষ্ট ব্যক্তির কূপ'। তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরে তিনি একটা পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন এবং ফেরেশতার আদেশ মত সন্তানের নাম রাখলেন ইসমাঈল। সে সময়ে ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর।

বাইবেলের উল্লেখিত বর্ণনার সাথে আরেকটি বর্ণনার কোন সাদৃশ্য তো নেই-ই এমনকি এই বর্ণনায় দেখা যায় সে সন্তান হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম ছিলেন না। সে সন্তান ছিল ইসহাক আলায়হিস্ সালাম। তাওরাত বলে ঃ ফিলিস্তিনেই হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁর পিতা ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ছিলেন। যখন তাঁর চৌদ্দ বছর বয়স তখন ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর আরেক সন্তান ইসহাক আলায়হিস সালাম হযরত সারার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর সে সন্তানকে দুধ ছাড়ানো হয়।

যেদিন ইসহাককে বুকের দুধ ছাড়ানো হয় সেদিন পিতা ইবরাহীম আলায়হিস সালাম আপ্যায়নের এক বিশাল আয়োজন করেন। তারপর সারা যখন দেখলেন তাঁর স্বামীর যে সন্তান হাজেরার গর্ভে জন্মেছে, সে সন্তান খুব আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে, তখন সারা ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-কে আদেশ করলেন ,আপনি এই দাসী এবং তাঁর সন্তানকে বের করে দিন। নতুবা সে আমার সন্তানের অংশে ভাগ বসাবে। এ কথা শুনে ইবরাহীমের মন খুব খারাপ হলো।

খোদা তাকে ডেকে বললো ঃ তুমি তোমার সন্তান ও দাসীর ব্যাপারে মন খারাপ করো না। সারা যা আদেশ করেছে তাই পালন করো।

এরপর দিন সকালে ইবরাহীম (আ) ঘুম থেকে উঠে রুটি ও পানির পাত্র হাজেরার কাঁধে উঠিয়ে দিয়ে সন্তানসহ তাকে বিদায় করে দিলেন। সে চলে গেল এবং 'সাবা' কূপের কাছে জনমানবহীন প্রান্তরে একাকী ঘুরতে লাগলো। পান করার পানি যখন শেষ হয়ে গেল তখন সে তাঁর সন্তানকে একটা ঝোপের নিচে ফেলে দিল। সন্তানের মৃত্যু সে নিজের চোখে দেখতে পারবে না বলে হাজেরা কিছুটা দূরে গিয়ে বসে বললো ঃ আমি এ সন্তানের মৃত্যু দেখতে পারবো না। সে তার সামনে বসে চিৎকার করে আর্তনাদ করতে লাগলো।

খোদা সে সন্তানের কান্না শুনলেন এবং ফেরেশতারা আকাশ থেকে হাজেরাকে বললেন ঃ হাজেরা! কোন ভয় নেই। খোদা তোমার সন্তানের কান্না শুনেছেন। তুমি উঠে তোমার সন্তানকে উঠিয়ে নাও। ঐ সন্তানকে একটা বিশাল জাতিতে পরিণত করা হবে।

তারপর খোদা তাকে একটা কূপের সন্ধান দিলেন। কূপের কাছে হাজেরা গেলেন। নিজে পানি পান করলেন এবং সন্তানকেও পানি পান করালেন। পানির পাত্রও পরিপূর্ণ করলেন। জনমানবহীন প্রান্তরে সে সন্তান বড় হতে থাকলো এবং খোদা সে সন্তানের সাথে ছিল। এরপর তাঁর মা মিশর থেকে একটা মেয়ে এনে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন এবং তারা ফারাম প্রান্তরে বসবাস করতে ছিল।

(তাওরাত, সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায় ১৩-আয়াত নং ৫-১৩। অধ্যায় ১৯, আয়াত নং ৩০-৩৮। অধ্যায় ১৬, আয়াত নং ১-৪,১৫-১৬। অধ্যায় ১৮, আয়াত নং ২৪-২৬। অধ্যায় ২১, আয়াত নং ১-৫, ৮-২১)

কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বাইবেলের বর্ণনা অবলম্বনে মত প্রকাশ করেছেন, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর দাদার নাম আখনূখ এবং ইদ্রিস ছিল তার উপাধি। আর বনী ইসরাঈলদের নবীর নাম ইদ্রিস এবং তাঁর উপাধি ছিল ইলয়াস। কিন্তু তাদের এই অভিমতের পক্ষে তাঁরা কোরআন এবং হাদিসের কোন প্রমাণ তো পেশ করতে পারেনই না, বরং পবিত্র কোরআন তাদের অভিমতের বিপরীত বর্ণনা পেশ করেছে। পবিত্র কোরআন বলে হযরত ইদ্রিস আলায়হিস সালাম ও হযরত ইলয়াস আলায়হিস্ সালাম পৃথক নবী ছিলেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আল্লাহর রাসুল হযরত নূহ

আলায়হিস সালাম

প্রাচীন আরবে মানুষ কবিতাকারে তাদের ইতিহাস রক্ষা করতো। তারা নিজের বংশের লোকজনের নামসমূহ মুখস্থ রাখতো। কোন কোন ব্যক্তি এই বিদ্যায় অতান্ত পারদর্শী ছিল। আরবের ইতিহাসে বংশবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মত অনুসারে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এভাবে বলা হয় যে, নূহ ইবনে লামাক ইবনে মুতাওশালেহ ইবনে আখনূখ ইবনে ইয়ারুদ ইবনে মাহ্লাঈল ইবনে ক্বীনান ইবনে আনুশ ইবনে শীষ ইবনে আদম আলায়হিস্ সালাম। কিন্তু গবেষকগণ বলেন, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর সম্পর্কে এই বংশনামা ঠিক নয়। কেননা, এই বংশনামায় হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সময় থেকে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর যতটা ব্যবধান দেখানো হয়েছে, প্রকৃত ব্যবধান এর তুলনায় অনেক বেশী।

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে তাওরাতও বংশনামা পেশ করেছে। কিন্তু সমস্যা হলো, তাওরাত বিভিন্ন ভাষায় যখন রচিত হয়েছে, তখন একটির সাথে আরেকটির কোন সাদৃশ্য রাখা হয়নি। ইবরানী ভাষায় যে তাওরাত রচিত হলো, সেখানে এক ধরনের বর্ণনা করা হয়েছে। সামী ভাষায় যে তাওরাত রচিত হলো, সেখানে আরেক ধরনের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় এবং ইউনানী ভাষায় যে তাওরাত রচিত হয়েছিল, সে বর্ণনার সাথে আরেক তাওরাতের কোনই মিল নেই।

সুতরাং তাওরাতের ওপরে নির্ভর করে কোন সত্যে উপনিত হওয়া সম্ভব নয়। তাওরাতের বর্ণনা পাঠ করলে এটা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ সমস্ত বর্ণনার ভেতরে মন গড়া বর্ণনা পরিপূর্ণ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনি ব্যতীত অন্য কোন নবীর জীবনি এতটা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করা হয়নি। সর্বাপেক্ষা সতর্কতা ও যত্নের সাথে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনি সংরক্ষণ করা হয়েছে, তবুও সামান্য দু'চার স্থানে একজনের সাথে আরেকজনের বর্ণনায় পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

আর যে সময় বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর জীবনি সংরক্ষণ করার কাজ শুরু হয়েছিল, তখন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম বা অন্যান্য নবীদের যুগের তুলনায় পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। এরপরও কতক স্থানে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তাহলে যাদের সময় কোন ইতিহাস বা কারো জীবনি সংরক্ষণ করার মত কোন প্রচেষ্টাই ছিল না, তাদের সময়ে কারো পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত সঠিকভাবে সংরক্ষিত হবে, এ কথা তো ভাবাই যায় না।

সুতরাং অন্যান্য নবী এবং রাসুলদের জীবন সম্পর্কে এবং তাদের পবিত্র জীবন ধারার যতটুকু বর্ণনা কোরআন এবং হাদিস আমাদের কাছে পরিবেশন করছে, ততটুকুই আমাদের প্রয়োজন এই তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এর অধিক যদি প্রয়োজন হত, তাহলে মহান আল্লাহ আমাদেরকে সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে অবহিত করতেন। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে মুসলিম শরীফের একটি হাদিস হতে জানা যায় যে, তিনিই ছিলেন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর পরে পৃথিবীতে প্রথম নবী, যাকে রাসুলের পদও দান করা হয়েছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বহুস্থানে মহান আল্লাহ আলোচনা করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত করেন, সে সময়ে তিনি এমন কতকগুলো প্রশ্নের সম্মুখিন হতেন, যে প্রশ্নের সম্মুখিন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম হয়েছিলেন। তিনি যে সমাজে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং সমাজের যে শ্রেণীর লোক প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সেই লোকগুলো সম্পর্কে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যে মন্তব্য করতো, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়েও সমাজের যে শ্রেণীর মানুষ প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সম্পর্কে সমাজের ধনিক শ্রেণী সেই একই মন্তব্য করতো।

এ নানা কারণে মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনী শুনিয়ে ছিলেন এবং মানুষকে সতর্ক করেছেন, সত্যের সাথে বিরোধীতা করে নূহের জাতি এই পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তোমরাও যদি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের সাথে ঐ একই ধরনের আচরণ করো,তাহলে তোমাদের ওপরেও অবধারিতভাবে আল্লাহর আযাব নেমে আসবে।

হযরত নূহের দীর্ঘ জীবন

আলায়হিস্ সালাম

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম পৃথিবীতে কত বছর জীবিত ছিলেন এবং কতদিন ধরে মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, তা এক মহাবিস্ময়। কেননা পবিত্র কোরআন বলছেঃ–

ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما–فاخذ هم الطوفان وهم ظلمون (العنكبت)

আমি নূহকে তাঁর জাতির লোকদের প্রতি প্রেরণ করেছি এবং সে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর কাল তাদের ভেতরে অবস্থান করেছে। শেষ পর্যন্ত তুফান তাদেরকে ঘিরে ধরলো এমন অবস্থায় যে, তারা ছিল জালিম। (সূরায়ে আনকাবুত, আয়াত নং-১৪)

কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সাড়ে নয় শতাব্দী যাবৎ এই পৃথিবীতে অবস্থান করেছেন। একজন মানুষ সাড়ে নয়শত বছর জীবিত ছিল, বিষয়টি বড়ই আশ্চর্যের। অনেকে ধারণা করেন, এত বছর একজন মানুষের জীবিত থাকা এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্তমান গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের গড়আয়ু এক ধরনের নয়। কোন দেশের মানুষ বেশী দিন জীবিত থাকে আবার কোন দেশের মানুষ অল্পদিন জীবিত থাকে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এ ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করেছেন। সৃষ্টি জগতের দিকে তাকালে সৃষ্টির ভারসাম্য কিভাবে রক্ষা করা হচ্ছে তা লক্ষ্য করা যায়। এই পৃথিবীতে যে প্রাণী বা বৃক্ষ তরু-লতার প্রয়োজন যত কম, মহান আল্লাহ তা কম সৃষ্টি করেছেন বা তার বংশ বৃদ্ধি একটা ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ রেখেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে বংশ বৃদ্ধি ঘটতে দিয়েও তা বিলুপ্তির ব্যবস্থা করেছেন। প্রাণী জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, পৃথিবীতে যেসব দেশ বন্য প্রাণীর জন্য বিখ্যাত, সেসব দেশের প্রাণীসমূহের অবস্থা হলো, হরিণের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। অনেকটা গরুর মত দেখতে যাকে বলা হয় (Wild beast) ওয়াল্ড বিষ্ট। এই প্রাণীগুলো যে প্রান্তরে বিচরণ করে, সেই প্রান্তরের দিকে তাকালে মনে হয় যেন এদের সংখ্যা শতকোটি পার হয়ে যাবে। একই স্থানে বাঘ, সিংহ, হায়েনা, হিংস্র শিয়াল, সাপ আরো কত প্রাণী রয়েছে। এই Wild beast-কে এবং হরিণকে বাঘ ধরে খাচ্ছে, সিংহ ধরে খাচ্ছে, হায়েনা ধরে খাচ্ছে, শিয়াল ধরে খাচ্ছে, বন্য কুকুর ধরে খাচ্ছে। পানি পান করতে গেলে কুমির ধরে খাচ্ছে। সামান্য দুর্বল বা অসুস্থ হয়ে শুয়ে থাকলে শকুনের বিশাল দল এসে খেয়ে ফেলছে। নদী অতিক্রম করতে গিয়ে এসব প্রাণী যে ভঙ্গিতে লাফিয়ে নদীতে পড়ে, তাতে নদীর তলদেশের পাথরে আঘাত লেগে এদের বহু সংখ্যক মারাত্মক আহত হয়ে মারা পড়ে। প্রবল স্রোতের টানে মারা পড়ে।

অথচ এই Wild beast-এর এবং হরিণের সংখ্যা কমছে না। এ প্রাণী দুটো মানুষের জন্যও মহান আল্লাহ হালাল করেছেন। এই প্রাণী দুটোর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি লাভ করে, অথচ এই প্রাণী দুটোকে যেসব প্রাণী ধরে খায়, তাদের সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি লাভ করে না। মহান আল্লাহ এভাবেই তাঁর সৃষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করেন। বৃক্ষ, তরু-লতার অবস্থা দেখুন, পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ মৌসুমে নানা ধরনের ফল, ফুলের গাছ সৃষ্টি হয়, দুর্বা ঘাস বিশেষ সময়ে মাটিকে ঢেকে ফেলে। মাস কয়েক পরেই তা আবার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পানির জগতের অবস্থাও এমন। মাছ শতকোটি ডিম ছাড়ে। সমস্ত ডিমের বাচ্চা ফোটেনা। যেগুলো ফোটে সবগুলো বড় হবার সুযোগ পায় না। এই মাছগুলোকে খাবার জন্য মানুষসহ নানা প্রাণী প্রস্তুত হয়ে আছে। অর্থাৎ কোন কিছুকেই মহান আল্লাহ মাত্রার অধিক বৃদ্ধি লাভ করতে দিচ্ছেন না। এর কারণ হলো, কোন প্রাণী বা বৃক্ষ, তরু-লতা সীমার অতিরিক্ত যদি বৃদ্ধি লাভ করে, তাহলে তার আধিক্যে অন্যান্য সৃষ্টি নানা অসুবিধায় পতিত হবে। মানুষের অবস্থা দেখুন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে দাঙ্গায় শেষ হচ্ছে। দুর্ঘটনায় শেষ হচ্ছে। স্বাভাবিক মৃত্যুতো আছেই।

অর্থাৎ সমস্ত কিছুই মহান আল্লাহ তাঁর বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা অনুযায়ীই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এই পৃথিবীতে যে সময়ে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর আগমন করেছিলেন, সে সময়ে এই পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কত ছিল তা বর্তমানে জানার

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কোন মাধ্যম আমাদের কাছে নেই। অনুমানে যদি ধরে নেয়া যায় যে, পাঁচ লক্ষ বা দশ লক্ষ অথবা তারও অনেক কম। তাহলে বোধ হয় ভুল হবে না। আমাদের এই অনুমান পবিত্র কোরআনের আলোকেই আমরা করতে পারি।

আল্লাহর নবী হযরত হুদ

আলায়হিস্ সালাম

হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে জাতি গঠন করে এই পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, কাল ক্রমে সেই জাতি আল্লাহর বিধান হতে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। নিজেদের স্বার্থের কারণে তাঁরা আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করেছিল। এক আল্লাহর দাসত্ব তারা ত্যাগ করে নিজেদের মনের দাসত্ব, সমাজের নেতাদের দাসত্ব, দেশের প্রচলিত আইনের দাসত্বসহ প্রকৃতির দাসত্ব করা শুরু করেছিল। যে জাতির কাছে মহান হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম-কে প্রেরণ করেছিলেন, তৎকালে সে জাতি ছিল দৈহিক দিক দিয়ে চরম শক্তিশালী।

তাদের দেহের আকৃতি ছিল বিশাল এবং তারা পাহাড় খোদাই করে এমন ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেছিল, যা বর্তমানে আবিষ্কার হচ্ছে। অর্থাৎ স্থাপত্য শিল্পে তারা এতটা উন্নতি করেছিল যে, তাদের মনে অহংকার সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের তুলনায় এই পৃথিবীতে আর শক্তিশালী কেউ নেই। তারা প্রকাশ্যেই ঘোষনা দান করতো, মান্ আশাদ্দা মিন্না কুওয়াহ্ অর্থাৎ আমাদের তুলনায় শক্তিশালী আর কে আছে? এই শক্তির কারণে তারা অহংকারে মদমত্ত হয়ে জুলুম অত্যাচারের সয়লাব বইয়ে দিয়েছিল।

তাদেরকে এক আল্লাহর গোলামী প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য মহান আল্লাহ তাদের ভেতর থেকেই হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামকে নবী হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে আহ্বান জানালেন, তোমরা সমস্ত দাসত্ব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করো। সমস্ত ইলাহ্কে অস্বীকার করো। সমস্ত রবকে অস্বীকার করো। শুধুমাত্র এক আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে নাও। এক আল্লাহর আইন অনুসরণ করো। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান অনুসরণ করো। আল্লাহর আইন অনুসরণ করো তাহলো এই পৃথিবী এবং আখেরাতে শান্তি লাভ করতে পারবে।

অহংকারে মদমত্ত হয়ে তারা আল্লাহর নবীর আহ্বান অস্বীকার করেছিল। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। অশান্তি সৃষ্টি করা হতে যদি তোমরা বিরত না হও, তাহলে তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। বারবার সতর্ক করার ফলেও তারা যখন অন্যায় অত্যাচার করা হতে বিরত হয়নি, তখন তাদের ওপরে সিদ্ধান্তকারী আযাব নেমে এসেছিল। হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম আ'দ জাতির সবচেয়ে সম্মানিত শাখা খুলুদ-নামক গোত্রের একজন ছিলেন। তাঁর পবিত্র দাড়ি ছিল অত্যন্ত সুবিন্যস্ত এবং দীর্ঘ। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তাঁর দেহের রং ছিল লাল সাদায় মিশ্রিত। তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল এবং গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তিনি পৃথিবীতে কত বছর জীবিত ছিলেন এবং কত বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছিলেন, এ সম্পর্কে সঠিক বর্ণনা পাওয়া মুসকিল। কোথায় তাকে কবর দেয়া হয়েছিল, এ সম্পর্কেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে আরবের অধিবাসীগণ তাঁর কবর সম্পর্কে নানা দাবী করে থাকে। হাযরামাউতের অধিবাসীরা দাবী করে যে, মহান আল্লাহর আযাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে আ'দ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবার পরে হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম হাযরামাউত এলাকার দিকে চলে আসেন। পরবর্তীতে সেখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ওয়াদিয়ে বারহুতের কাছে হাযরামাউতের পূর্বদিকে তারীম শহর থেকে বেশ দূরে তাকে দাফন করা হয়।

কাসাসুল কোরআন প্রণেতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে তিনি বলেছেন, হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম-এর কবর হাযরামাউতের কাসীরে আহ্মার অর্থাৎ একটি লাল চূড়ায় অবস্থিত এবং তাঁর কবরের মাথার দিকে একটা ঝাউ গাছ রয়েছে। আবার ফিলিস্তানের অধিবাসীগণ দাবী করে থাকেন যে, তিনি ফিলিস্তিনেই বসবাস করতেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তকাল করেন। সেখানে তাঁর বাঁধানো কবর রয়েছে এবং সে কবরে বাৎসরিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, পরিবেশ পরিস্থিতি হাযরামাউতের অধিবাসীদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা, হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম যে জাতির কাছে আগমন করেছিলেন, সে জাতির অবস্থান ছিল হাযরামাউতের আশে পাশেই। মহান আল্লাহর নিয়ম হলো, যে জাতিকে তিনি শায়েস্তা করতে চান, তার পূর্বে তিনি সে জাতির নবীকে সতর্ক করে দেন যে, তিনি যেন ঐ এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। সুতরাং আ'দ জাতিকে শায়েস্তা করার পূর্বে তিনি হযরত হুদ আলায়হিস্ সালামকে উক্ত ঐলাকা ত্যাগ করতে আদেশ দান করেছিলেন এবং তিনি সে এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। নিজের এলাকা ত্যাগ করে তিনি নিশ্চয়ই অনেক দূরের পথ ফিলিস্তিনে গমন করেননি।

আল্লাহর নবী হযরত ছালেহ

আলায়হিস্ সালাম

হযরত ছালেহ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর এই নবীর কাহিনী এবং তাঁর অবাধ্য জাতির কাহিনী পঠিত হতে থাকবে এবং শিক্ষা গ্রহণকারীগণ শিক্ষা গ্রহণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করবে। আল কোরআনে আট জায়গায় আল্লাহ হযরত ছালেহ আলায়হিস্ সালাম-এর নাম উল্লেখ করেছেন। সূরায়ে আ'রাফের ৭৩-৭৫ ও ৭৭ নম্বর আয়াতে। সূরায়ে হুদের ৬১-৬২-৬৬ ও ৮৯ নম্বর আয়াতে এবং সূরায়ে শুআ'রার ১৪২ নম্বর আয়াতে। অতীত জাতির ইতিহাস সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের ভেতরে হযরত হুদ আলায়হিস্ সালাম-এর বংশ সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান।

তাফসিরে ইবনে কাসীরে বিখ্যাত হাফেজে হাদিস হযরত ইমাম বাগভী (রাহঃ)-এর বর্ণনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ছালেহ আলায়হিস্

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সালাম-এর পিতার নাম ওবাইদ। তাঁর পিতার নাম আসেক, তাঁর পিতার নাম মাশেহ, তাঁর পিতার নাম উবাইদ, তাঁর পিতার নাম হাদের এবং তাঁর পিতার নাম সামূদ। অপরদিকে সাহাবাদেরকে যিনি দেখেছেন তিনি হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রাহঃ)। তাওরাত সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল সর্বজন বিদিত। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ছালেহ আলায়হিস্ সালাম-এর পিতার নাম ছিল উবাইদ এবং তাঁর পিতার নাম ছিল জাবের এবং তাঁর পিতার নাম ছিল সামূদ।

বিখ্যাত হাফেজে হাদিস হযরত ইমাম বাগভী (রাহঃ)-এর বর্ণনার ওপরে ইসলামী চিন্তবিদ ও গেবেষকগণ অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, হযরত ছালেহ আলায়হিস্ সালামকে যে জাতির ভেতরে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে জাতির আদি পুরুষের নাম ছিল সামূদ। এ কারণে এই জাতি ইতিহাসে সামূদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পবিত্র কোরআনেও এই জাতিকে সামূদ জাতি হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ কোরআনে এই জাতি সম্পর্কে ৯ টি সূরায় উল্লেখ করেছেন। সূরায়ে আ'রাফ, সূরায়ে হুদ, সূরায়ে হিজর, সূরায়ে নামল, সূরায়ে ফুছ্ছিলাত, সূরায়ে নাজম, সূরায়ে ক্বামার, সূরায়ে হাক্কাহ, ও সূরায়ে শামস।

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম

আলায়হিস্ সালাম

পবিত্র কোরআনে সূরা হজ্জের শেষের দিকে মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে বলেছেন, তিনিই তোমাদের জাতির পিতা এবং তিনিই তোমাদের নামকরণ মুসলমান। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম বিশ্বনবীর পূর্ব পর্যন্ত অন্য নবীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবী ছিলেন। পবিত্র কোরআনে তাঁর নামের সাথে খলীল উপাধি যুক্ত করা হয়েছে। আর বিশ্বনবীকে কত যে প্রিয় নাম মহান আল্লাহ দিয়েছেন তার শেষ নেই। বিশ্বনবীর নামের ভেতরে একটা নাম রয়েছে হাবিব। খলীল ও হাবিব– এই দুটো শব্দের অর্থই হলো বন্ধু। অর্থাৎ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম দু'জনকেই আল্লাহ তাঁর নিজের বন্ধু বলেছেন। পক্ষান্তরে এই দুই বন্ধুর মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় মহান আল্লাহ তাঁর কোন প্রেরিত পুরুষকে যখন কোন ওহী দান করেছেন, তখন তাকে বিশেষ স্থানে ডেকে নিয়ে তারপর ওহী দান করেছেন। হযরত মুছা আলায়হিস্ সালামকে তূর পাহাড়ে ডেকে নিয়ে ওহী দান করা হয়েছিল।

এ ছাড়া মহান আল্লাহ তাঁর সমস্ত নবী-রাসুলদেরকে তাদের নাম ধরে ডেকেছেন। আল্লাহর এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাকে আল্লাহ যখন ওহী দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেছেন সে সময়ে তাকে বিশেষ কোন স্থানে ডেকে নেয়া হয়নি। তিনি যেখানে যে অবস্থায় থেকেছেন সেখানেই আল্লাহ তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ কখনো তাকে নাম ধরে সম্বোধন করেননি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এই নাম ধরে তাকে ডাকেননি। সম্বোধন করার প্রয়োজন হলে তাকে বিভিন্ন প্রিয় নামে আল্লাহ সম্বোধন

ahlussunnah-bd.blogspot.com

করেছেন। কারণ, আল্লাহর কাছে তাঁর যে কত বিশাল মর্যাদা তা কল্পনাও করা যায় না। পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে নিয়ম প্রয়োগ করেছেন, সে নিয়মের অনেক কিছুই বিশ্বনবীর ক্ষেত্রে আল্লাহ পরিবর্তন করেছেন। এ কারণেই বিশ্বনবীকে হাবিব বলা হয়েছে। তিনি আল্লাহর এমন এক বন্ধু–যে বন্ধুর সম্মানে মহান আল্লাহ তাঁর নিয়মের পরিবর্তন করেছেন।

আর ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর এমন এক বন্ধু যিনি তাঁর সমস্ত নিয়মের পরিবর্তন করেছেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। নিজের পিতা-মাতাকে ও জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন। নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান ও স্ত্রীকে জনমানবহীন প্রান্তরে নির্বাসন দিয়েছেন। আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকেও কোরবানী করার লক্ষ্যে তাঁর গলায় ছুরি চালিয়েছেন। এ কারণেই তাকে খলীল বলা হয়েছে। তাঁর জীবনে আপন সন্তানকে কোরবানী দেয়ার পরীক্ষাই ছিল বোধহয় সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

হযরত ইবরাহীমের বংশ পরিচিতি

আলায়হিস্ সালাম

পবিত্র কোরআন বা কোন সহীহ হাদিসে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশ বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়নি। তবে তাঁর জন্মদাতা পিতার নাম পবিত্র কোরআনে সূরায়ে আনয়ামের ৭৪ নম্বর আয়াতে 'আযার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাস এবং তাওরাতের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতার নাম ছিল 'তারেখ'। তাওরাতে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশ পরিচিতি এভাবে দেয়া হয়েছে, ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ইবনে তারেখ ইবনে না-হুর ইবনে সারুজ ইবনে রাও ইবনে ফালেহ ইবেন আ'বের ইবনে ছালেহ ইবনে আরফাকসাজ ইবনে সাম ইবনে হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম।

নামের এই পার্থক্য সম্পর্কে চিন্তাবিদ এবং গবেষকগণ দুই ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক দলের অভিমত হলো, ইতিহাস এবং তাওরাতে বর্ণিত তারেখ নাম ও পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আযার নাম কোন দুই ব্যক্তির নাম নয়। এ দুটো নাম একই ব্যক্তির দুইটি নাম। তারেখ নাম হলো ব্যক্তি বাচক নাম আর আযার নাম হলো গুণ বাচক নাম।

কোন কোন গবেষকের মতে 'আযার' কারো নাম নয়, হিব্রু ভাষায় মূর্তির প্রেমিককে আযার বলা হয়। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতা তারেখ ছিল মূর্তি নির্মাতা এবং মূর্তির পূজারী। মূর্তিকে সে ব্যক্তি প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালোবাসতো। এ কারণে পবিত্র কোরআনে তাকে 'আযার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবার কোন চিন্তাবিদ মন্তব্য করেন, 'আযার' শব্দ এসেছে 'আ'ওয়ায' শব্দ হতে। এই আ'ওয়ায শব্দের অর্থ হলো স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, বোকা, আহাম্মক, নির্বোধ, একেবারেই দুর্বল বৃদ্ধ। তারেখের অবস্থা এমনই ছিল বলে তাকে আযার বলা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হয়েছে। এ কারণেই পবিত্র কোরআন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর পিতার এই বিখ্যাত গুণ বাচক নাম উল্লেখ করেছে। ইমাম সুহাইলী (রাহঃ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ রাওযুল আনফ-এ উল্লেখিত মতামতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

আরেক দল গবেষক বলেন, প্রকৃত পক্ষে আযার ছিল তৎকালে একটি বিখ্যাত মূর্তির নাম। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম পিতা ছিলেন সেই মূর্তির ভক্ত এবং পূজাড়ী। আবার কোন কোন দুর্বল বণনায় দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতার নাম ছিল তারেখ এবং তাঁর চাচার নাম ছিল আযার। তিনি চাচার স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছিলেন। তাঁর চাচা আযার তাঁকে আপন সন্তানের মতই আদোর যত্ন করতেন। এ কারণেই পবিত্র কোরআন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতার নাম আযার হিসেবে বর্ণনা করেছে।

উল্লেখিত মতের যারা সমর্থক তাঁরা এ সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চাচা পিতার মতই।'

সুতরাং ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর চাচা তাঁর পিতার মতই ছিল। এ কারণে কোরআন মজীদ তাঁর পিতার নাম আযার হিসেবে উল্লেখ করেছে। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতার নাম নিয়ে কেন যে এত জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমাদের বুঝে আসে না। সামান্য একটা নামকে কেন্দ্র করে কেন যে এত তত্ব কথার আমদানী করেছেন গবেষকগণ, তা তাঁরাই জানেন। পবিত্র কোরআন যেখানে স্পষ্ট ভাষায় হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতার নাম উল্লেখ করেছে, সেখানে তো এত গবেষণার কোন প্রয়োজনই নেই।

অনুমান ও গবেষণা ভিত্তিক ইতিহাস এবং বিকৃত বাইবেলের সমর্থন আদায় করার জন্য সামান্য একটা নামকে কেন্দ্র করে এত মতামত ব্যক্ত করা হচ্ছে কেন ? এ সম্পর্কে ইসলামী চিন্তাবিদদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো, 'আদার' শব্দ হলো কালদানীয় ভাষার। 'আদার' শব্দের অর্থ হলো 'শ্রেষ্ট পূজাড়ী।' অর্থাৎ কালদানীয় ভষায় বিখ্যাত এবং শ্রেষ্ঠ পূজাড়ীকে তথা রাজ পুরোহিতকে 'আদার' বলা হতো। আরবী ভাষায় এই 'আদার' শব্দ 'আযার'–এ রূপান্তরিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পিতা তারেখ ছিল মূর্তি নির্মাতা এবং রাজ পুরোহিত। এ কারণেই তাকে 'আযার' বা শ্রেষ্ঠ মূর্তি পূজক হিসেবে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আযার তার ব্যক্তি বাচক নাম ছিল না, এটা ছিল তার গুণবাচক নাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানালেনঃ–

واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة–انى ارك وقومك فى ضلل مبين (الانعام)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ করুন। সে যখন আপন পিতা আযরকে বলেছিল, তুমি কি মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো ? আমি তো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। (সূরায়ে আনয়াম, আয়াত নম্বর-৭৪)

এই আয়াতে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে একটি বিশেষ প্রসঙ্গের সমর্থন ও সাক্ষ্য হিসাবে। প্রসঙ্গটি হলো, আল্লাহর দান করা জীবন আদর্শের ভিত্তিতে আজ যেমন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএবং তাঁর অনুসারীগণ অংশীবাদকে অস্বীকার ও অমান্য করছেন, সমস্ত কৃত্রিম ইলাহ ও রবের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর সামনে মাথানত করে দিয়েছেন, ইতিহাসের বিগত অধ্যায়ে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত এই একই কাজ করেছিলেন।

বর্তমানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর অনুসারীদের সাথে তাঁর মূর্খ দেশবাসী এই বিষয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক করছে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথেও তাঁর দেশবাসী ঠিক এই একই আচরণ করেছিল। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর দেশবাসীকে যে জবাব দান করেছিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর অনুসারীদের পক্ষ হতে সমসাময়িক লোকদের প্রতি তাই হচ্ছে একমাত্র এবং চূড়ান্ত জবাব। হযরত নুহ আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর বংশের নবী রাসুলগণ যে পথে চলেছেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঠিক সেই একই পথের পথিক।

এই কথাগুলো এত গুরুত্ব সহকারে এ কারণেই বলা হয়েছে যে, সে সময় আরবের লোকজন নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীমের অনুসারী বলে দাবী করতো অথচ তারা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর আদর্শের বিপরীত পথেই চলতো। এ কারণে তাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা নিজেদেরকে যার অনুসারী দাবী করে মূর্তি পূজায় লিপ্ত রয়েছো, সেই ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম স্বয়ং তাঁর পিতাকে কি বলেছিলেন, তা শুনে নাও। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি কি মূর্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছো ? আমি তো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি।'

আজ তোমরা যেমন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীদের সাথে বিতর্ক করছো, তাঁর প্রতি বিরক্ত হচ্ছো, তাদেরকে হুমকি প্রদর্শন করছো, ইবরাহীমের পিতাও এমন বিরক্তি প্রকাশ করেছিল এবং হুমকি প্রদর্শন করেছিল। শোন তোমোদের বরণ্য নেতা ইবরাহীমের ইতিহাসঃ-

واذكر فى الكتب ابراهيم-انه كان صديقا نبيا-اذ قال لابيه يابت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى

ahlussunnah-bd.blogspot.com

عنك شيا ء-يابت انى قد جا ءنى من العلم مالم ياتك فاتبعنى اهدك صراطا سويا-يابت لا تعبد الشيطن-ان الشيطن كان للرحمن عصيا-يابت انى اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطن وليا-قال اراغب انت عن الهتى يابراهيم-لءن لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا-قال سلم عليك ساستغفرلك ربى-انه كان بى حفيا-واعتزلكم وماتدعون من دون اللّه وادعوا ربى-عسى الا اكون بدعا ء ربى شقيا (مريم)

আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা করো। সে নিঃসন্দেহে একজন সত্যপন্থী মানুষ এবং নবী ছিল। (এই লোকদেরকে কিছুটা সেই সময়ের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিন) যখন সে তাঁর পিতাকে বলেছিল, হে পিতা ! আপনি কেন সেই সব জিনিষের দাসত্ব করেন যা না শুনতে পারে আর না দেখতে পারে, আর না আপনার কোন কাজ সম্পাদন করে দিতে সক্ষম ?

আব্বাজান ! আমার কাছে এমন এক জ্ঞান এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি। আপনি আমাকে অনুসরণ করে চুলন, আমি আপনাকে অভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করবো। আব্বাজান ! আপনি শয়তানের দাসত্ব করবেন না। শয়তান তো রহমানের অবাধ্য। হে আমার পিতা ! আমার শংকা হচ্ছে যে, আপনি রহমানের আযাবে নিমজ্জিত হয়ে না পড়েন, আর শয়তানের সাথী হয়ে না বসেন।

পিতা বললো, ইবরাহীম ! তুই কি আমার ইলাহদের থেকে বিমুখ হয়ে গেছিস ? তুই যদি বিরত না হস, তাহলে আমি তোকে পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। তুই চিরদিনের জন্য আমার কাছে থেকে দূরে সরে যা। ইবরাহীম বললো, আপনার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার রবের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনাকে ক্ষমা করে দেন। আমার রব্ব আমার ওপরে অত্যন্ত মেহেরবান।

আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি, আর সেই সব সত্ত্বাকেও যাদেরকে আপনারা আল্লাহকে ত্যাগ করে ডেকে থাকেন। আমি তো আমার রব্বকেই ডাকবো। আমি আশা করি আমার রব্বকে ডেকে আমি ব্যর্থ হবো না। (সূরায়ে মরিয়ম, আয়াত নম্বর-৪১-৪৮)

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম যে তাঁর পিতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন তা কোরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। পিতা যখন তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল, তখনও তিনি পিতার ওপর শান্তি কামনা করেছেন, পিতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

করবেন বলে বলেছেন। সুতরাং তিনি 'আমার' শব্দ দ্বারা সেই পিতাকে নির্বোধ বা আহাম্মক ঠাওরাবেন, এমন কথা ভাবা যায় না।

হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রার্থনা

আবূ নয়ীম হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএরশাদ করেছেন-হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি তওরাত নাযিল হবার পরে তিনি তাতে উম্মতে মোহাম্মদীর উল্লেখ দেখে বললেন, পরওয়ারদেগার! আমি তওরাতে এক উম্মতের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি, যারা সকলের শেষে আগমন করবে এবং প্রতিযোগিতায় সকলের অগ্রে চলে যাবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ বললেন, এরা আহমদের উম্মত। মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, পরওয়ারদেগার, তওরাতে এমন লোকদের কথা আছে, যাদের 'ইঞ্জীল' তাদের বক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। তারা সেটি মুখে মুখে তেলাওয়াত করবে। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, এরা তো আহমদের উম্মত। মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, প্রভু, তওরাতে এমন লোকদের উল্লেখ আছে, যাদের জন্য গণীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, এরা আহমদের উম্মত। মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, হে রব! তওরাতে এমন উম্মতের কথা আছে, যারা নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজনকে খয়রাত দিবে এবং এ জন্য তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ পাক বললেন, এরা তো আহমদের উম্মত। মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, পরওয়ারদেগার! তওরাতে তাদের উল্লেখ আছে, যারা সৎকাজ করার ইচ্ছা করলে এবং আনজাম না দিলেও তাদেরকে এক পুণ্যের সওয়াব দেয়া হবে, আর আনজাম দিলে দশ পুণ্যের সওয়াব দান করা হবে। তাদেরকেই আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ তায়ালা বললেন, এরাও আহমদের উম্মত। মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, প্রভু হে! তওরাতে এমন লোকদের কথা আছে, যারা কেবল পাপ কাজের ইচ্ছা করে তা আনজাম না দিলে তাদের কোন পাপ লেখা হবে না। আর যদি আনজামও দেয়, তবে কেবল একটি পাপই লেখা হবে। পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ বললেন, এরাও আহমদের উম্মত। মূসা আলায়হিস্ সালাম বললেন, হে রব! তওরাতে এমন লোকদের উল্লেখ আছে, যাদেরকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হবে এবং যারা পথভ্রষ্টতা মিটিয়ে দিবে ও মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবে। পরওয়ারদেগার, তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ বললেন, এরাও আহমদের উম্মত হবে। অতঃপর মূসা আলায়হিস সালাম বললেন, পরওয়ারদেগার! তাহলে আমাকেও আহমদের উম্মতের একজন করে দিন। এতে আল্লাহ তায়ালা মূসা আলায়হিস সালামকেও দু'টি স্বাতন্ত্র্য দান করে বললেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার পয়গাম (রেসালত) ও কালামের জন্য বেছে নিয়েছি। অতএব, আমি যা দিচ্ছি, তা নাও এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এ কথা শুনার পর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আরজ করলেন, পরওয়ারদেগার! আমি রাযী।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত ইবরাহীমের আগমন কাল

আলায়হিস সালাম

আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম-এর জন্ম শহরই শুধু আবিষ্কার হয়নি, যে সময়ে তিনি এসেছিলেন, সে সময়ে সে সমাজের অবস্থা কেমন ছিল এবং তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি কেমন ছিল ইত্যাদী সম্পর্কেও নানা তথ্য আবিষ্কার হয়েছে। 1935 সনে London হতে প্রকাশিত Sir Leonard Woolles কর্তৃক লিখিত Abraham নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা হতে জানা যায় যে, ২১০০ খৃষ্টপূর্বের কাছাকাছি সময়ে হযরত ইবরাহীম এই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক এবং গবেষকগণ একমত হয়েছেন।

তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্ম ইরাকের 'আউর' নামক স্থানে। এই আউর বা উর ছিল ইরাকের রাজধানী এবং নমরুদ পরিবারের আবাসস্থল। গবেষকদের ধারণা অনুসারে খৃষ্টপূর্ব ২১০০ সালের শুরুর দিকে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়ে 'আউর' ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতির লীলাভূমি। ক্রয়-বিক্রয় তথা ব্যবসা-বানিজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কিন্তু ইতিহাস বলে, যাবতীয় অনাচার, পাপ পংকিলতায় নিমজ্জিত ছিল ইরাকের রাজধানী 'আউর'। ইসলামের ইতিহাসে আউরকে শিরক্ ও কুফুরীর দুর্গ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ফান্দান গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর জাতি ছিল মূর্তি পুজক। আর ইঞ্জিল বরনাবাতে বলা হচ্ছে, তাঁর পিতা ছুতারের কাজ করতেন। বিভিন্ন ধরণের কাঠের মূর্তি তৈরী করে নিজের জাতির মধ্যে তা বিক্রি করতেন।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা প্রথম হতেই তাকে সত্যের উপলব্ধি এবং সত্যে পথের সন্ধান ও হেদায়েত দান করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মূর্তিগুলো শুনতেও পায়না, দেখতেও পায়না এবং কারো ডাকে সাড়া দিতেও পারে না। কারো কোন ক্ষতি বা উপকার করতেও পারে না। তিনি প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিজের চোখে দেখতেন যে, এ সমস্ত নিষ্প্রাণ মূর্তিগুলোকে আমার পিতা নিজের হাতে তৈরী করেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের দেহের আকৃতিদান করেন ও চোখ, কান, মুখ নির্মাণ করেন। তারপর তা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন। অতএব এসব মূর্তি কিছুতেই খোদা হতে পারে না এবং খোদার সমকক্ষও হতে পারে না। (তাওরাত ও ইঞ্জিল–বরনাবাত)

অধিক অর্থ উপার্জন এবং জীবনকে ভোগ করার জন্য আরাম আয়েশের যাবতীয় বস্তু সংগ্রহ করাই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুদ প্রথা তাদের গোটা জীবনেক পরিবেষ্টিত করেছিল। তারা ভয়ানকভাবে অর্থের পূজাড়ী ছিল। এই অর্থের কারণেই তারা একে অপরকে চরম সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো। তাদের পরস্পরের ভেতরে কোন বিশ্বাস ছিল না।

অর্থ লিপ্সু হবার কারণে তাদের সমাজে পরস্পরের ভেতরে কোন সম্প্রীতি ছিল না। দাঙ্গা ফাসাদ ছিল তাদের নিত্য দিনের কর্ম। তারা যেসব শক্তিকে উপাস্য হিসেবে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

মানা করতো, তাদের কাছে তারা প্রার্থনা করতো, তারা যেন ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে পারে এবং অধিক মাত্রায় ভোগ বিলাসিতা করতে পারে। গোটা জীবনটাই ছিল তাদের ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত।

সে সমাজে মানুষকে তিনভাগে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর ছিল ঐ সমস্ত ব্যক্তি, যারা ছিল শাসক গোষ্ঠী। এদেরকে আমেলা বলা হত। পূজাড়ী ব্রাহ্মণ, সরকারী পদাধিকারী ও সামরিক অফিসাররা ছিল এই আমেলা সম্প্রদায় ভুক্ত। দ্বিতীয় যে সম্প্রদায় ছিল, যাদেরকে বলা হত মিশকীনো। এরা ছিল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি, কৃষিজীবি সম্প্রদায়। তৃতীয় যে সম্প্রদায় ছিল, এরা ছিল অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর। এরা ছিল দাস শ্রেণীর। এদেরকে বলা হত আরদো।

আমীলো শ্রেণীই ছিল সর্বোচ্চে। সমাজে এরা ছিল এক প্রকার খোদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এদের কোন অপরাধ-অপরাধ বলে গণ্য হত না। গোটা দেশের ভেতরে এরা যা খুশী তাই করতে পারতো। অন্যদের তুলনায় এদের প্রাণ, সম্পদ ও সম্মানের মূল্য ছিল সর্বাধিক। এই ধরনের এক পরিবেশে আল্লাহর নবী মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম পৃথিবীর আলো-বাতাসে আগমন করেছিলেন। তাঁর এবং তাঁর বংশের যে বিবরণ তালমুদ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, তিনি সমাজের সর্বোচ্চ শ্রেণী সেই আমীলো সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর পিতা ছিলেন সরকারের রাজ পুরোহিত। শুধু তাই নয়, হযরত ইবরাহীমের পিতা ছিলেন, তদানীন্তন সরকারের অর্থাৎ নমরুদের দরবারের Chief officer of the state সর্বাপেক্ষা বড় রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক মূর্তি ধ্বংস

সে জাতি প্রতি বছরে একটা বিশাল মেলায় যোগ দিত। সবাই সে মেলায় যোগ দিতে গেল। তাদের মন্দিরে দেবতাদেরকে প্রহরা দেবার জন্য কেউ থাকলো না। থাকার প্রয়োজনও তারা কোন অনুভব করেনি। কারণ তাদের ধারণা হলো, দেবতা তাদেরকে রক্ষা করে, এই দেবতা মহাশক্তিশালী। সুতরাং দেবতার কোন ক্ষতি করতে পারে, এ কথা তারা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। এ কারণেই তারা মন্দির অরক্ষিত রেখে মেলায় গিয়েছিল।

তারা মেলায় যাবার সময় হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে ও তাদের সাথে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ জানালো। তিনি প্রথমে যেতে অস্বীকার করলেন। তারপর যখন তারা সবই মিলে অনুরোধ করতে থাকলো, তখন তিনি আকাশের নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি পাত করে বললেন, আমি পীড়িত বোধ করছি। পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছেঃ-

فنظر نظرة فى المنجوم-فقال انى سقيم-فتولوا عنه

مدبرين (الصفت)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তারপর তিনি ওপরের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে নক্ষত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি করলেন এবং বললেন, আমি পীড়িত। তারপর তারা তাকে ছেড়ে চলে গেল। (সূরায়ে সাফফাত, আয়াত নম্বর ৮৮-৯০)

লোকজন এ কথা শুনে ধারণা করেছিল যে, এই লোকটি সব সময় তাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, সুতরাং আজ কোন দেবতার অভিশাপ তাঁর ওপরে প্রভাব বিস্তার করেছে, এ কারণে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ কথা ধারণা করে তারা মনে মনে খুশী হয়েই মেলায় চলে গেল। এই মেলায় দেশের সব শ্রেণীর মানুষ যোগদান করতো। দেশের শাসক হতে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত মেলায় গিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে গেল।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এই সুযোগে প্রস্তুতি গ্রহণ করে বের হলেন। তিনি ভাবলেন, এবার তাঁর জাতির কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে, তারা এতকাল যাদের পূজা করে এসেছে, তারা কত দুর্বল। তিনি সে সময়ের সবচেয়ে বড় দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলেন, নানা ধরনের ফল, মিষ্টিসহ অন্যান্য জিনিষ দেবতার সামনে থরে থারে সাজানো রয়েছে। তিনি বিদ্রুপের স্বরে বললেন, এত খাদ্য তোমাদের সামনে তোমরা খাচ্ছো না কেন ? আমি কথা বলছি, তোমরা উত্তর দিচ্ছো না কেন ?

এরপর সমস্ত মূর্তিকে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন। তারপর হাতের অস্ত্রটি সবচেয়ে বড় মূর্তির কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রেখে তিনি মন্দির হতে বের হয়ে গেলেন। এই ঘটনাটি পবিত্র কোরআন এভাবে পেশ করেছেঃ–

فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون-مالكم لا تنطقون-فراغ عليهم ضربا باليمين (الصفت)

তারপর ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে তাদের মূর্তিসমূহের মন্দিরে প্রবেশ করলো এবং তাদের মূর্তিসমূহকে বললো, তোমরা খাচ্ছো না কেন ? তোমাদের কি হলো, কথা বলছো না কেন ? তারপর নিজের ডান হাত দিয়ে সমস্ত মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেললেন। , (সূরায়ে সাফফাত, আয়াত নম্বর ৯১-৯৩)

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সমস্ত মূর্তি ভাঙ্গতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ তাঁর জাতি বিশ্বাস করতো যে, এরা অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন। এ করণে বড় মূর্তিটি তিনি রেখে দিলেন। তাঁর জাতির লোকজন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে তখন তিনি পাল্টা তাদেরকেই বলবেন, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছো, তোমরা এতদিন যাদেরকে মহাশক্তিশালী মনে করে আসছো, তাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো না কেন ? মাটির মূর্তি যে অর্থহীন এ কথা আবারও তাঁর জাতিকে বুঝানোর জন্যই তিনি বড় মূর্তিটিকে রেখে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেঃ–

ahlussunnah-bd.blogspot.com

فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون-

قالوامن فعل هذا بالهتنا (الانبياء)

তারপর তিনি তাদেরকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেললেন। কিন্তু তাদের বড় দেবতাটিকে ত্যাগ করলেন, যেন তাঁর জাতির লোকজন এসে নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী তার দিকেই ঝুঁকে পড়ে। এবং জিজ্ঞাসা করে যে, এ কি হলো ? (সূরায়ে আম্বিয়া, আয়াত নম্বর, ৫৮-৫৯)

লোকজন মেলা হতে ফিরে এসে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে প্রিয় দেবতাদের এই করুণ অবস্থা দেখে প্রথমে তাদের চেতনা শক্তি কিছুক্ষণের জন্য যেন লোপ পেয়েছিল। তারা নির্বাক দৃষ্টিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ভূমিস্মাৎ দেবতাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। চেতনা ফিরে পেতেই তারা আর্তনাদ করে উঠলো, তাদের দেবতাদের এই সর্বনাশ কে করলো ?

কিন্তু এই হতভাগা জাতির মনে এই ধারণা তখন পর্যন্ত এলো না যে, দেবতারা যদি মহাশক্তিশালীই হবে, তাহলে তাদের কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। এখন দেবতারা যখন কারো আঘাতে মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে, তাহলে বুঝা গেল এই দেবতাদের কোন শক্তিই নেই। এতকাল তারা যে পূজা করেছে, তা সবই ব্যর্থ হয়েছে। এই কথা হতভাগা জাতির মনে উদয় হলো না।

এই লোকগুলোর ভেতরে ঐ লোকটিও ছিল, যে লোকটির সামনে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, আর আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

সেই লোকটি চিৎকার করে বলে উঠলো, এই কাজ ইবরাহীমের। সে একদিন বলেছিল, আর আল্লাহর কসম ! আমি তোমাদের অনুপস্থিতির সময়ে অবশ্যই তোমাদের মূর্তিগুলোর প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। সে আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে। এই কাজ ইবরাহীম ব্যতীত আর কেউ করতে পারে না। সেই আমাদের দেবতাদের চরম শত্রু।

পবিত্র কোরআন এই মূর্তি ভাঙ্গার পরের বিষয়টি এভাবে পরিবেশন করেছেঃ-

قالوامن فعل هذا بالهتنا انه لمن الظلمين-قالوا

سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم (الانبياء)

তারা বলতে লাগলো, আমাদের দেবতাদের সাথে এ ধরনের ব্যবহার কে করলো? যে করেছে সে অবশ্যই জালিম। তাদের ভেতরে একজন বললো, আমি একজন

anussunnah-bd.blogspot.com

যুবককে এই মূর্তিদের বিরুদ্ধে নিন্দা করতে শুনেছি। তাকে ইবরাহীম বলা হয়। এই কাজ অবশ্যই তার। (সূরায়ে আম্বিয়া, আয়াত নম্বর ৫৯-৬০)

জাতিয় নেতৃবৃন্দ এবং পূজারীগণ এ কথা শুনে ক্ষোভে দুঃখে এবং রাগে তাদের চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তারা ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে ঘোষনা করলো, সেই ইবরাহীমকে এখানে নিয়ে আসা হোক, জাতি দেখুক এবং চিনে রাখুক যে, প্রকৃত অপরাধী কে ?

বাইবেলের বিকৃতি ও হযরত হাজেরা

আলায়হিস্ সালাম

বনী ইসরাঈলীদের অসংখ্য অপরাধের মধ্যে এটাও আরেকটা মারাত্মক অপরাধ ছিল যে, তারা ইতিহাস বিকৃতিতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। ভিন্ন জাতির শৌর্য, বীর্য, সম্মান-সম্ভ্রম, মর্যাদা, অবদান, কৃতিত্ব নিজেদের নামে ইতিহাসে স্থান দিয়েছে। অন্য জাতির ভেতর যে উত্তম গুণাবলী ছিল তা নিজেদের নামে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আর নিজেদের অপরাধ, কুকীর্তি, নিন্দনীয় গুণাবলী, পাশবিকতা অন্য জাতির ঘাড়ে অবলীলায় চাপিয়ে দিয়েছে। ইতিহাসে নানা সময়ে যে সমস্ত দল গোষ্ঠী ও জাতির সাথে তাদের ঝগড়া ফ্যাসাদ ঘটেছে, রেষারেষি হয়েছে তাদেরকে এরা বিভিন্নভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এদের লেখা ইতিহাস এমনকি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেও উল্লেখিত কথার সত্যতা পাওয়া যাবে। আল্লাহর বিভিন্ন নবীর নামে , দাউদ আলায়হিস্ সালাম-এর নামে, ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর নামে, ইদ্রীস আলায়হিস্ সালাম-এর নামে ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী রচনা করেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুআবী ও আম্মুনী সম্প্রদায়ের সাথে ইসরাঈলীদের বিরোধ ছিল। সে কারণে তারা তাদেরকে জারজ জাতি বানিয়ে ছেড়েছে। বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম মোটেও আল্লাহর নবী ছিলেন না। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাকে আন্দোলনের কাজে সামূদ ভূ-খন্ডে প্রেরণ করেননি। এমনকি তাদের উভয়ের ভেতর সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটেছিল। তখন ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম তাকে অন্য কোথাও চলে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর লূত জাতির ওপরে যখন আল্লাহর গযব এসেছিল সে সময়ে তিনি তাঁর দুই মেয়েকে সাথে করে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তাঁর দুই মেয়ে তাকে মদ পান করিয়ে তাঁর সাথে যৌন ক্রিয়া করেছিল। ফলে তাঁর দুই মেয়েই গর্ভবতী হয়েছিল। পরবর্তীতে এক মেয়ের গর্ভ হতে জন্মগ্রহণ করেছিল বিন্আম্মী নামক সন্তান। এদের দুই জনের মাধ্যমে দুটো জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

ইসরাঈলীগণ এভাবেই তাদের আক্রোশ মিটিয়েছে ইতিহাস বিকৃতি করে এবং অন্যদের ঘাড়ে কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়ে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কেও নানা ধরনের ভিত্তিহীন কাহিনী তারা রচনা করে তা তাদের ধর্ম গ্রন্থে স্থান দিয়েছে। হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্মের খুটিনাটি

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বিষয় আমাদের জানার একান্ত প্রয়োজন হলে মহান আল্লাহ এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানিয়েই দিতেন। যেটুকু জানার প্রয়োজন তা কোরআন হাদিসে জানানো হয়েছে।

এ সম্পর্কে বাইবেলের মনগড়া কাহিনীর ওপর নির্ভর করার কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাইবেল কিভাবে তাদের মনগড়া কাহিনী প্রচার করেছে তা জানা প্রয়োজন এ কারণে যে, এক শ্রেণীর লেখক তা আলেম ধারী ব্যক্তি বাইবেলের কাহিনীই সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে তা লিখছেন এবং তাদের বক্তৃতায় বর্ণনা করছেন।

যে বংশে অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বংশে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, সেই বংশের ওপরেও ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মবেত্তাগণ কলঙ্ক আরোপ করেছেন। বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইসমাঈলের গর্ভধারিণী হযরত হাজেরা-হযরত সারা আলায়হিস্ সালাম-এর দাসী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

এ কারণে তিনি একদিন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে বললেন, আপনি আমার দাসীর সাথে যৌন মিলন করুন। যেন আমার বংশ রক্ষা হয়। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি হযরত হাজেরার সাথে মিলিত হলেন ফলে ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্ম হয়–এ কথা তাওরাতে বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ তাওরাতেই আবার বলা হয়েছে, মিশর সম্রাট হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন। সে উপহারের ভেতর হযরত হাজেরাও ছিলেন।

এ বর্ণনা যদি যথাযথ হয়ে থাকে তাহলে এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, দাসীর সাথে মিলিত হবার জন্য সে সময়ে কারো অনুমতির প্রয়োজন হতো না। আল্লাহর একজন নবী তাঁর স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করবেন আল্লাহর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে–বাইবেলের এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

আবার বাইবেল সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায় বর্ণনা করছে, আল্লাহর কাছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারপর তিনি হাজেরার সাথে মিলিত হলেন, হাজেরা গর্ভবতী হলো।

বাইবেলের বর্ণনা যে কতটা স্ববিরোধী তা বাইবেল পাঠ না করলে বুঝা যাবে না। হযরত হাজেরা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এ ধরণের বিভ্রান্তি তারা কেন ছড়িয়েছে, এর একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। কেননা, বনী ইসরাঈলীগণ তথা ইহুদী ও খৃষ্টানগণ দাবী করে যে, তারা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর স্ত্রী হযরত সারা আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর।

আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ হলো, হযরত সারার দাসী হাজেরার সন্তান ইসমাঈলের বংশধর। সুতরাং মুসলমান ও তাদের নবী হলো গোলাম বাঁদীর জাত গোষ্ঠী। এ কথাটি প্রমাণ করার জন্যই তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃতি করেছে এবং হযরত হাজেরা আলায়হিস্ সালামকে হযরত সারার বাঁদী বানিয়েছে।

অথচ তাদেরই আরেক ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে যে, হযরত হাজেরা আলায়হিস্ সালাম ছিলেন রাজ পরিবারের মেয়ে এবং হযরত ইবরাহীম

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আলায়হিস্ সালাম-এর বিবাহিতা স্ত্রী। সে সময়ে মিশরের ফেরআউনের নাম ছিল বাক্ ইউন। সারার মোজেযা দেখে সে বলেছিল, আমার নিজের মেয়ের জন্য অন্য কারো ঘরের রাণী হবার চেয়ে এই নারীর ঘরের দাসী হয়ে থাকা অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন বিষয়। এই কথাটা বিকৃত করে তারা বলে থাকে যে, মিশরের রাজা হাজেরাকে দাসী হিসেবে ই দান করেছিল।

হাজেরা শব্দটি হলো হিব্রু ভাষার হাগার শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ হলো অপরিচিত বা বেগানা, বিচ্ছিন্ন বা পৃথক। আরবীতে হাজের শব্দের অর্থও তাই। হযরত হাজেরা আলায়হিস্ সালাম ছিলেন মিশরের অধিবাসী। মিশরের পূর্ব এলাকার উম্মুল আরব বা উম্মুল আরিক নামক গ্রামের মেয়ে ছিলেন তিনি। এই গ্রামটা ফারামা বা আত্তিনার কাছে রোম সাগরের পাশেই ছিল। সে সময়ে মিশরের শাসকদের দূর্গ ও রাজ প্রাসাদ ছিল এখানে। বর্তমানে এই স্থান তাল্লুল ফারান নামে পরিচিত।

হযরত হাজেরা আলায়হিস্ সালাম যেহেতু নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে অর্থাৎ হিজরত করে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে চলে এসেছিলেন, এ কারনে তাঁর নামকরণ হয়েছিল হাজেরাহ্। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পবিত্রা নারী। তাঁর সাথে মক্কার প্রান্তরে মহান আল্লাহর ফেরেশতা কথা বলেছেন। মুসলিম জাতির কাছে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা অতি উচ্চে।

ইবরাহীম ও সন্তান ইসমাঈল

আলায়হিস্ সালাম

এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে ইসলামের আহ্বান আল্লাহর পথহারা বান্দাদের কানে যেন পৌছে যায়, এ চেষ্টা করতে করতেই মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম বয়সের শেষ প্রান্তে পৌছে গিয়েছিলেন। তবুও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু পবিত্র কোরআন বলে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যে সময়ে তাঁর নিজের জন্মভূমি থেকে হিযরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে সময়েই তিনি মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন ঃ হে রাব্বুল আলামীন ! তুমি আমাকে সৎ সন্তান দান করো।

এ সম্পর্কে কোরআনের সূরা সাফ্ফাতের ১০০ শত আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর সে দোয়া কবুল করেছিলেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তাকে নেক সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল।

বয়সের কোন প্রান্তে পৌছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তান লাভ করেছিলেন এ সম্পর্কে ইতিহাসে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। তাওরাতের সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায়ে দেখা যায়, তিনি ৮৬ বছর বয়েসে প্রথম সন্তান হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামকে লাভ করেন এবং ১০০ বছর বয়সে হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালামকে লাভ করেন। এই ইসহাক আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সালাম থেকে যে বংশধারা সৃষ্টি হয়েছিল তারাই বনী ইসরাঈল নামে ইতিহাসে পরিচিত। কারণ হযরত ইয়াকুবের আরেক নাম ছিল ইসরাঈল।

ইহুদী ও খৃষ্টানগণ হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্কেও নানা ধরনের ভিত্তিহীন কাহিনী তারা রচনা করে তা তাদের ধর্ম গ্রন্থে স্থান দিয়েছে। হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্মের খুটিনাটি বিষয় আমাদের জানার একান্ত প্রয়োজন হলে মহান আল্লাহ এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা জানিয়েই দিতেন। যেটুকু জানার প্রয়োজন তা কোরআন হাদিসে জানানো হয়েছে।

এ সম্পর্কে বাইবেলের মনগড়া কাহিনীর ওপর নির্ভর করার কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাইবেল কিভাবে তাদের মনগড়া কাহিনী প্রচার করেছে তা জানা প্রয়োজন এ কারণে যে, এক শ্রেণীর লেখক তা আলেম ধারী ব্যক্তি বাইবেলের কাহিনীই সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে তা লিখছেন এবং তাদের বক্তৃতায় বর্ণনা করছেন।

যে বংশে অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বংশে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, সেই বংশের ওপরেও ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মবেত্তাগণ কলঙ্ক আরোপ করেছেন। বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ইসমাঈলের গর্ভধারিণী হযরত হাজেরা-হযরত সারা আলায়হিস্ সালাম-এর দাসী ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

এ কারণে তিনি একদিন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে বললেন, আপনি আমার দাসীর সাথে যৌন মিলন করুন। যেন আমার বংশ রক্ষা হয়। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি হযরত হাজেরার সাথে মিলিত হলেন ফলে ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্ম হয়–এ কথা তাওরাতে বলা হয়েছে। কিন্তু ঐ তাওরাতেই আবার বলা হয়েছে, মিশর সম্রাট হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে প্রচুর উপহার দিয়েছিলেন। সে উপহারের ভেতর হযরত হাজেরাও ছিলেন।

এ বর্ণনা যদি যথাযথ হয়ে থাকে তাহলে এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, দাসীর সাথে মিলিত হবার জন্য সে সময়ে কারো অনুমতির প্রয়োজন হতো না। আল্লাহর একজন নবী তাঁর স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করবেন আল্লাহর নির্দেশের তোয়াক্কা না করে–বাইবেলের এ কথা বিশ্বাস করা যায় না।

আবার বাইবেল সৃষ্টিতত্ত্ব অধ্যায় বর্ণনা করছে, আল্লাহর কাছে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। তারপর তিনি হাজেরার সাথে মিলিত হলেন, হাজেরা গর্ভবতী হলো। এ সংবাদ হযরত সারা আলায়হিস্ সালাম অবগত হয়ে তিনি নানা প্রকারে হাজেরাকে উত্যক্ত করতে লাগলেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হাজেরা অন্যত্র চলে গেলেন। এরপর আল্লাহর ফেরেশতা তাকে পানির এক ঝর্ণার কাছে আবিষ্কার করলেন। এটা ছিল সেই ঝর্ণা যা 'ছুরের' কাছে অবস্থিত।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত হাজেরাকে ফেরেশতা বললোঃ হে সারার দাসী ! তুমি এখানে এলে কি করে এবং কোথায় যাচ্ছ ?

হাজেরা বললেন ঃ আমি সারার কাছে থেকে পালিয়ে এসেছি।

ফেরেশতা তাকে আদেশ দিয়ে বললেন ঃ তুমি সারার কাছেই ফিরে যাও এবং অনুগত থেকে তাঁর দাসী হয়ে থেকো। আমি তোমার বংশধারা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে দেব। এমনকি তাদের সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। এখন তোমার গর্ভে সন্তান। তুমি একটা পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম রাখবে ইসমাঈল। আল্লাহ তোমার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনেছেন। তোমার সন্তান হবে যাযাবর। তাঁর হাত সবার বিরোধী সবার হাত তাঁর বিরোধী হবে। সে তাঁর সমস্ত ভাইদের সামনেই বসবাস করবে।

হযরত হাজেরার সাথে ফেরেশতা যেখানে কথা বলেছিলেন সেখানে একটা কূয়া ছিল। হযরত হাজেরা স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ সেই কূয়ার নাম দিলেন 'জীবিত দৃষ্ট ব্যক্তির কূপ'। তারপর কিছুদিন অতিবাহিত হবার পরে তিনি একটা পুত্র সন্তান জন্ম দিলেন এবং ফেরেশতার আদেশ মত সন্তানের নাম রাখলেন ইসমাঈল। সে সময়ে ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বয়স ছিল ৮৬ বছর।

বাইবেলের উল্লেখিত বর্ণনার সাথে আরেকটি বর্ণনার কোন সাদৃশ্য তো নেই-ই এমনকি এই বর্ণনায় দেখা যায় সে সন্তান হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম ছিলেন না। সে সন্তান ছিল ইসহাক আলায়হিস্ সালাম। তাওরাত বলে ঃ ফিলিস্তিনেই হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁর পিতা ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে ছিলেন। যখন তাঁর চৌদ্দ বছর বয়স তখন ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর আরেক সন্তান ইসহাক আলায়হিস্ সালাম হযরত সারার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর সে সন্তানকে দুধ ছাড়ানো হয়।

পিতা-পুত্রের প্রচেষ্টা-কা'বা নির্মাণ

এই পৃথিবী সৃষ্টির শুভ লগ্নেই মহান আল্লাহ তাঁর ঘর নির্মাণের স্থান নির্বাচন করেছিলেন। মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম এই পৃথিবীতে আগমন করার পরে মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন তাঁর নবী আদমকে সেই স্থান চিনিয়ে দেয়, যেখানে কা'বাঘর নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। আল্লাহর আদেশে ফেরেশতা আদম আলায়হিস্ সালামকে ঐ স্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর পৃথিবীর সর্ব প্রথম নবী ও রাসুল, প্রথম মানব এবং বিজ্ঞানী ছাইয়েদেনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নিজের হাতে কা'বাঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। (হাফেজ ইবনে হাজার আস্কালানী (রাহ), ফাত্হুল বারী, অষ্টম খন্ড-পৃষ্ঠা-১৩৮)

এরপর মানব জাতির উত্থান-পতনে ক্রমশঃ কা'বাঘর পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ হতে এক প্রকার মুছেই গিয়েছিল। যে চিহ্ন ছিল তা কোন মানুষের পক্ষে খুঁজে বের করা অসাধ্য ছিল। যে স্থানে কা'বাঘর ছিল সে স্থান সামান্য একটু উঁচু হয়েছিল বা ছোট একটা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

টিলার মত ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে ঐ স্থান দেখিয়ে দিয়ে আদেশ করেছিলেন কা'বাঘর পুনরায় নির্মাণ করার জন্য ।

মক্কায় কা'বাঘর অবস্থিত। এই মক্কা নগরীর বেশ কয়েকটা নাম দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটা নাম হলো বাক্কা। পবিত্র কোরআনেও এই বাক্কা নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ফরাসী পন্ডিত অধ্যাপক ডেজি বলেন ঃ গ্রীক ভূগোলবিদগণ যেটাকে 'মারকুবা' বলেন সেটাই হলো বাক্কা।' কার্ললাইল এবং সিসেলস উল্লেখ করেছেন এই স্থান হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন উপাসনালয়ের স্থান।

মক্কায় যেহেতু আল্লাহর ঘর রয়েছে, একারণে প্রাচীন কালে কেউ মক্কায় বসতবাড়ি নির্মাণ করতো না। বসতবাড়ি নির্মান করাকে তারা কা'বার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন বলে মনে করতেন। এ কারণে তারা তাঁবু বা শামিয়ানার নিচে বাস করতো এবং মক্কাকে 'তাঁবু শহর' বলা হত। মক্কাতে যে ব্যক্তি বসবাসের লক্ষ্যে সর্ব প্রথম বাড়ি করেন ইতিহাসে তাঁর নাম জানা যায় সাঈদ ইবনে আমর।

যে সময়ে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কা'বাঘর নির্মাণ করেছিলেন সে সময়ে গোটা পৃথিবী ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, পৃথিবীর কোন দেশের অবস্থা কেমন ছিল। কোন জাতির সভ্যতা সংস্কৃতি কোন পর্যায়ে ছিল। মানবতা কিভাবে সর্বত্র আর্তচিৎকার করছিল। এই বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে এমন একটা স্থান ছিল না, যেখানে শিরকের ঘন তমসা বিরাজ করছিল না। একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করার মত কোন পরিবেশ কোথাও ছিল না। সর্বত্রই ছিল মূর্তি আর প্রকৃতি পূজা। মানুষ ছিল গাছ পাথর এবং আরেক মানুষের গোলাম। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যে সময়ে তাওহীদের শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে অগ্রসর হলেন সে সময়ে তাকে নিক্ষেপ করা হলো প্রজ্জ্বলিত অনল কুন্ডে। আল্লাহর কুদরতে সে আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে তিনি মিশরে গেলেন।

মিশরও তাঁকে অনুকূল পরিবেশ দান করলো না। নানা বিপদ তাকে ঘিরে ধরলো। তাওহীদের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করার মহান লক্ষ্যে তিনি চলে এলেন ফিলিস্তিনে। তিনি যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরছেন, সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার মত পরিবেশ ফিলিস্তিনেও পেলেন না। সর্বত্রই বাতিলের ঝড়ের প্রচন্ড তান্ডব। প্রবল ঝাপটায় তাওহীদের প্রদীপ নির্বাপিত করে দিতে চায়। সুতরাং সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নিয়ে তিনি আল্লাহর ইশারায় তাহীদের শিখা প্রজ্জ্বলিত করার জন্য একটা মুক্ত অঙ্গণ বেছে নিলেন। এমন এক জনবসতিহীন মরুপ্রান্তর নির্বাচন করলেন, যেখানে কোন জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না।

নিজের প্রাণপ্রিয় দুগ্ধপোষ্য শিশুকেসহ স্ত্রীকে সেখানে সামান্য এক থলে খেজুর আর এক মশক পানি দিয়ে তাদেরকে ছেড়ে গেলেন। মাথার ওপরে বিশাল বিস্তীর্ণ আকাশ আর পায়ের নিচে মরুপ্রান্তরের উত্তপ্ত বালুকারাশি। কোথাও পানির চিহ্নমাত্র নেই। সামান্য আলোর ইশারা নেই। ঝড় বৃষ্টির ঝাপটা থেকে আত্মরক্ষার কোনই উপায় নেই। পৃথিবীর বুকে তাওহীদের আলো চির অনির্বাণ করার লক্ষ্যে তিনি তাঁর

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে এই প্রান্তরে ছেড়ে গেলেন। লক্ষ্য একটাই, এখানে কাল ক্রমে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটবে। আর সেই সভ্যতা হবে তাওহীদের আলোয় আলোকিত। এমন একটা জনগোষ্ঠী এখানে তৈরী হবে, যারা গোটা পৃথিবীর আনাচে কানাচে তাওহীদের মশাল জ্বালিয়ে দেবে। মানুষের কানে এ কথা পৌছে দেবে–এক আল্লাহ ছাড়া দাসত্ব পাবার যোগ্যতা আর কারো নেই।

যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, সে মূল কাজের দিকে তিনি এবার মনোযোগ দিলেন। তিরিশ বছর পূর্বে তিনি তাঁর অমূল্যনিধি শিশু সন্তানকে স্ত্রীসহ এক নির্জন প্রান্তরে যে উদ্দেশ্যে ছেড়ে গিয়েছিলেন, এবার তিনি এলেন তাঁর মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে। সহীহ বোখারী শরীফে দেখা যায়, একদিন হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম যমযম কূপের কাছে একটা গাছের নিচে বসে তীর বানাচ্ছিলেন। এ সময়ে পিতা ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এলেন। পিতাকে দেখার সাথে সাথে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন। হাদিস শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, পিতা-পুত্র যেভাবে মিলিত হয় তাঁরা সেভাবে মিলিত হয়েছিলেন। পিতাও তাঁর আদোরের সন্তানের প্রতি হৃদয়ের স্নেহ উজাড় করে দিলেন এবং পুত্রও পিতাকে তাঁর হৃদয় থেকে গভীর সম্মান শ্রদ্ধা জানালো।

এবারে পিতা সন্তানের কাছে মনের ইচ্ছে ব্যক্ত করে বললেন, ইসমাঈল ! মহান আল্লাহ আমাকে একটা কাজ করার আদেশ দান করেছেন।

অনুগত সন্তান বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন, আল্লাহ আপনাকে যে কাজ করার আদেশ করেছেন তা অবশ্যই করবেন।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম সন্তানকে বললেন, আমাকে কি তুমি সেই কাজে সাহায্য করবে ?

অনুপম চরিত্রের অধিকারী সন্তান ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম অবনত মস্তকে পিতাকে জানালো, আমি অবশ্যই আপনাকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করবো।

এবার হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম অনতি দূরে এমন এক স্থানের দিকে সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, যে স্থানটি চারদিকের জমিনের চেয়ে কিছুটা উঁচু। জায়গা দেখিয়ে দিয়ে তিনি সন্তানকে বললেন, ঐ স্থানে আল্লাহ আমাকে একটা ঘর বানানোর জন্য আদেশ দিয়েছেন।

আখবারে মক্কায় দেখা যায় ইমাম আযাকী বর্ণনা করেন, কা'বাঘরের যে কাঠামো হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম নির্মাণ করেছিলেন, হযরত শীশ আলায়হিস্ সালাম তা মেরামত করেন বা পুনঃনির্মাণ করেন। কা'বা শরীফের ইতিকথা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, এটাই ছিল কা'বাঘরের সর্বপ্রথম পুনঃনির্মাণ। আরেক ইতিহাসে দেখা যায়, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর যুগে মহাপ্লাবনের পূর্ব পর্যন্ত সে ঘর তেমনি বিদ্যমান ছিল। হযরত মোজাহেদ উল্লেখ করেছেন, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর যুগের সেই সর্বগ্রাসী প্লাবনের সময়ে কা'বাঘরের সমস্ত কিছু লাল রঙের বালুর নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল এবং একটা টিলার আকার ধারণ করেছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এই টিলার পাশেই হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁর নিজের বসবাসের জন্য একটা ছোট ঘর বানিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে জনমানব শূন্য মক্কার ঐ টিলাটি অত্যন্ত বরকতময় এবং রহস্যাবৃত–এই কথাটি বিভিন্ন দেশের মানুষের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে বিপদগ্রস্থ মানুষ বিপদ হতে মুক্তি পাবার আশায় ঐ রহস্যময় টিলার কাছে এসে আল্লাহর কাছে তাদের সমস্যার কথা জানাতো। আল্লাহর আদেশে হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে জানিয়ে দিয়েছিল কা'বাঘরের মূল ভিত্তি কোথায় এবং কিভাবে তা নির্মাণ করতে হবে। এরপর তাঁরা পিতা-পুত্র দু'জনে অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করলেন। টিলার বালু সরিয়ে ফেলতে ফেলতে একসময় কা'বার পূর্ব নির্মাণের ভিত্তিমূল বেরিয়ে এলো। এই ভিত্তির ওপরেই পিতা-পুত্র বাইতুল্লাহ নির্মাণ শুরু করলেন। এটা যে চতুষ্কোণ হবে তা জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম জানিয়ে দিয়েছিলেন। আরবী ভাষায় কোন চতুষ্কোণ বিশিষ্ট গৃহকে 'কা'বাতুন' বলা হয়।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কর্তৃক বাইতুল্লাহ শরীফ নির্মাণের পূর্বে গোটা পৃথিবীর নানা স্থানে প্রকৃতি পূজা, মূর্তিপূজাসহ বিভিন্ন বস্তুকে পূজা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের আকৃতির ঘর বা মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। শুধু মন্দিরই নয় ঐ সমস্ত উপাস্য দেবতাদের নামে বিশাল বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়েছিল। মিশরে এধরণের বহু মন্দিরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। সূর্য দেবতা, ইযদারিস দেবতা, ঈজিয়াস দেবতা, হোরিয়াস দেবতা ও বায়াল দেবতাসহ অনেকগুলো দেবতার মন্দির বিদ্যমান ছিল। আসূরী সম্প্রদায়ের লোকজন বায়াল দেবতার মন্দির নির্মাণ করে তার ভেতরে আবুল হাওলের ধাতু নির্মিত এক বিশাল মূর্তি স্থাপন করেছিল। এই মূর্তিতে তার দৈহিক মহত্বের বিকাশ ঘটানো হয়েছিল। কেন্আনী জনগোষ্ঠী ইতিহাস প্রসিদ্ধ দূর্গ বায়ালা বাক্কের ভেতরে সেই বায়ালের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেছিল, যে মন্দির আজ পর্যন্তও টিকে রয়েছে।

গাররাহ নামক এলাকার জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবতা ছিল মৎস্যদেবী 'দাজুন'। এই দাজুনের আকৃতি তারা বানিয়ে ছিল এক অদ্ভুত আকৃতি দিয়ে। যার মাথা ছিল শুধু মানুষের মত এবং বাকিটুকু ছিল মাছের মত। একটা বিশাল মন্দির বানিয়ে সেখানে তারা এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে মূল্যবান নৈবদ্য দেবতার সামনে পেশ করা হত।

আমুনী সম্প্রদায় এক বিশাল জাঁকজমকপূর্ণ মন্দির নির্মাণ করেছিল। সেখানে তারা সূর্য দেবতার সাথে চন্দ্রকে দেবীর আকৃতি বানিয়ে পূজা করতো। পারস্যের মাওজুসী ধর্মের অনুসারীগণ বিশাল বিশাল অগ্নিকুন্ড নির্মাণ করে তার পূজা করতো। রোমানগণ বড়বড় গির্জা নির্মাণ করে তার ভেতরে যীশুখৃষ্টের এবং তার মায়ের মূর্তি স্থাপন করে পূজা করতো।

মন্দির আর মূর্তির দিক দিয়ে এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ ছিল অগ্রগামী। ৩৩ কোটি দেবতার এই দেশে পথে-ঘাটে, যে কোন প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসা বানিজ্য কেন্দ্রে, বড় কোন বৃক্ষের গোড়ায় এবং ঘরে ঘরে মূর্তি বিদ্যমান ছিল এবং অধিকাংশ স্থানে আজও

ahlussunnah-bd.blogspot.com

রয়েছে। শিব এবং তার স্ত্রী যোনী গর্ভে প্রবিষ্ট উদ্দন্ড বিভৎস লিঙ্গ, বিষ্ণু, কালী, দূর্গা, স্বরস্বতী, লক্ষী, কার্তিক, নারায়ণ, জগন্নাথ, বাসন্তী, শীতলা, হনুমান, গো-বৎস, পার্বতী দেবী, তুলসী দেবী, ব্রক্ষা, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি, ময়ুর, পেঁচা, সীতাদেবী, রামচন্দ্র এবং বুদ্ধদেবকে অবতার বানিয়ে, তাদের পূজা করার জন্য শত সহস্র মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল ভারতবর্ষে এবং বর্তমানেও করা হচ্ছে।

কিন্তু এ সব শিরকের বিপরীতে এক আল্লাহর উপাসনা করার মত কোন ঘরের অস্তিত্ব সে সময়ে পৃথিবীর কোথাও ছিল না। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-ই সে সময়ে সর্বপ্রথম এক আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য ঐ ঘর নির্মাণ করলেন। এবারের এই ঘর নির্মাণের মধ্যে এমন এক বৈশিষ্ট বিদ্যমান ছিল যা আদম (আ)-এর সময়ে ছিল না। কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিশ্বের মুসলিম জাতির পিতা যাকে করা হবে, এমন একজন উচ্চ মর্যাদাবান নবী, আল্লাহর প্রিয় বন্ধু, যে কোন ধরণের কল্পনাতীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মহামানব হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম হলেন রাজমিস্ত্রী। আর তাঁরই সন্তান আল্লাহর আরেকজন নবী, যাকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, আল্লাহর সেই যবীহ্ ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম হলেন জোগালদার। বড় অদ্ভুত ছিল কা'বা নির্মাণের সেই দৃশ্য।

সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত পিতা-পুত্র ব্যয় করতেন কা'বা নির্মাণ কাজে। সন্তান তাঁর পিতাকে পাথর এনে দিতেন আর পিতা একটার ওপরে আরেকটা পাথর গেঁথে যেতেন। দেয়াল এতটা উঁচু হলো যে, পিতার পবিত্র হাত আর উপরে যায় না। দেয়াল গাঁথায় যেন কোন অসুবিধা না হয়, এ কারণে মহান আল্লাহর আদেশে একখন্ড পাথরকে 'ভারা' স্বরূপ করা হলো। সে পাথর আল্লাহর নবী ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম নিজের পবিত্র হাতে ধরে রাখতেন আর আরেকজন মহান নবী সে পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে দেয়াল গাঁথতেন। এই পাথরকেই মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে মাকামে ইবরাহীম নামে অভিহিত করেছেন।

দেয়াল নির্মাণ যখন প্রায় শেষের দিকে তখন সেই হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর প্রতিষ্ঠিত করার সময় এসে গেল। আল্লাহর আদেশে হযরত সাইয়েদেনা জিবরাঈল আলায়হিস্ সালাম এসে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে পথ দেখিয়ে কুবাইস পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা কালো পাথর ছিল। যে পাথর সম্পর্কে বলা হয় তা জান্নাত হতে নিয়ে আসা হয়েছে। সুরক্ষিত অবস্থায় সেই পাথর বের করে এনে তা কা'বাঘরের দেয়ালে যথাস্থানে লাগিয়ে দেয়া হয়। যে স্থানে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ঐ পাথর স্থাপন করেছিলেন, বর্তমানে এবং ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ঐ স্থানেই স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থেকে পিতা-পুত্রের স্মৃতি চির অমলিন রাখবে। এই ঘর যখন নির্মাণ করা হলো, সে সময় তার কোন ছাদ ছিল না। দরোজার কোন চৌকাঠ ছিল না।

তাফসীরে কবীর এবং রুহুল মায়ানীতে বর্ণনা করা হয়েছে, নির্মাণ কাজ শেষে মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে আদেশ দিলেন, 'এবার আযান দাও! অর্থাৎ মানুষকে এই ঘরের দিকে ডাকো হজ্জ আদায় করার উদ্দেশ্যে।'

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আল্লাহর নবী জবাব দিয়েছিলেন, 'রাব্বুল আলামীন ! এখানে কোন জনমানবের তেমন বসতি নেই, আমার আহ্বান কে শুনবে ? আর যারা দূরে অবস্থান করছে, তাদের কানে আমার এই আযান পৌছবে কি করে ?'

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছিলেন, 'তুমি আযান দাও, মানুষের কানে তা পৌছে দেয়া আমার দায়িত্ব।'

আল্লাহর নবী আযান দিয়েছিলেন। সে আযান মানুষের কানে কিভাবে যে মহান আল্লাহ পৌছে দিলেন তার সাক্ষী কা'বা নির্মাণের পরবর্তী ইতিহাস। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ সে আযানে সাড়া দিয়ে ঐ কা'বায় যেতে থাকবে।

ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় যখন কুশাঈ ইবনে কিলাব যে সময়ে কা'বাঘরের মুতাওয়াল্লী নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি পুরোনো দেয়াল ভেঙে নতুন দেয়াল নির্মাণ করেন এবং খেজুর গাছের তক্তা দিয়ে ছাদ নির্মাণ করেন। কা'বাঘরের গিলাফ দেন সর্ব প্রথম ইয়েমেনের হুমাইরী গোত্রের শাসক আছয়াদ তুব্বা। সে সময়ে ইয়েমেনে উন্নতমানের চাদর তৈরী হত। যে চাদরকে বুরদে ইয়েমেনী বলা হত। তুব্বা সেই চাদর দিয়ে প্রথম গিলাফ দেন। কা'বাঘরের গিলাফ কোন ব্যক্তি সে সময়ে এককভাবে দিলে অনেকের মনোকষ্টের কারণ হত, এ কারণে বোধহয় কুশাঈ ইবনে কিলাব সমস্ত গোত্রের কাছে থেকেই চাঁদা তুলেছিলেন।

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইয়েমেনী চাদর দিয়েই কা'বাঘরের গিলাফ দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর শাসনামলে তিনি মিশরে নির্মিত কুবাতি গিলাফ পরিয়েছিলেন। সে সময় থেকে একটা প্রথা চালু হয়ে গেল, প্রতিটি শাসকই নতুন করে গিলাফ পরাতেন। বনু উমাইয়া শাসকগণ রেশমি কাপড়ে গিলাফ পরাতেন। শাসক মামুনুর রশীদ হজ্জের সময়ে লাল রেশমের, রজব মাসে কুবাতি চাদরের ও ঈদুল ফিতরের সময় সাদা রেশমের, এভাবে প্রতি বছরে তিনবার করে গিলাফ পরিয়েছেন।

মিশরের সুলতান সালেহ দুটো গ্রাম ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন কা'বাঘরের গিলাফ নির্মাণের ব্যয়ের জন্য। তুরস্কের সুলতান সুলাইমান এর সাথে আরো একটা গ্রাম দান করেন। যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা হন তখন তিনি কা'বাঘরের স্তম্ভ স্বর্ণ দিয়ে মুড়িয়ে দেন। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান সে সময়ে দিয়েছিলেন ছত্রিশ হাজার আশরাফী এবং আমিনুর রশীদ দিয়েছিলেন আঠার হাজার আশরাফী।

আল্লাহর নবী হযরত ইসহাক

আলায়হিস্ সালাম

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম কত বছর বয়সে হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালামকে সন্তান হিসেবে লাভ করেছিলেন, এ সম্পর্কে বয়সের যে বর্ণনা দান করা হয়েছে, তা বাইবেল হতে গ্রহণ করা হয়েছে। সন্তান দানের সংবাদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করেছেনঃ-

ahlussunnah-bd.blogspot.com

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا-قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ-فَلَمَّا رَا اَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَ هُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِفَةً-قَالُوْا لاَ تَخَفْ اِنَا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ-وَمْرَاَتُه قَاءِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ-وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ-قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا-اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ-اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُه عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ-اِنَّه حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-(هود)

আর শোন ! ইবরাহীমের কাছে আমার ফেরেশতারা সুসংবাদ নিয়ে পৌছেছিল। বলেছিল, তোমার প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। ইবরাহীম জবাবে বলেছিল, তোমাদের প্রতিও সালাম বর্ষিত হোক। এর কিছুক্ষণ পরেই ইবরাহীম একটি ভাজা বাছুর (তাদের মেহমানদারীর জন্য) নিয়ে এলো। কিন্তু যখন দেখলো যে খাবারের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে সন্দিগ্ধ হলো এবং মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলো।

তাঁরা বললো, ভয় পেয়ো না। আমরা লূত জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছি। ইবরাহীমের স্ত্রীও কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে এ কথা শুনে হেসে উঠেছিল। তারপর আমি তাকে ইসহাক ও ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিলাম। সে (ইবরাহীমের স্ত্রী) বললো, কি দুর্ভাগ্য আমার ! এখন কি আর আমার সন্তান হবে, যখন আমি একেবারে বৃদ্ধা হয়ে গেছি আর আমার স্বামীও হয়েছে অতিশয় বৃদ্ধ! এ তো বড় আশ্চর্যের কথা ! ফেরেশতাগণ বলেছিল, আল্লাহর আদেশ শুনে আশ্চর্য হচ্ছো ? ইবরাহীমের গৃহবাসীরা! তোমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত রয়েছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় প্রশংসিত এবং বড়ই মহিমান্বিত। (সূরায়ে হূদ, আয়াত নম্বর ৬৯-৭৩)

উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় যা বলা হয়েছে, আমরা তার সারমর্ম পেশ করছি। এই আয়াত হতে জানা যায় যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীমের বাড়িতে বা যেখানে তিনি পরিবার নিয়ে অবস্থান করতেন, সেখানে মানুষের আকৃতি ধারণ করে এসেছিল। দুটো উদ্দেশ্য সামনে রেখে ফেরেশতাদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর অবাধ্য জাতিকে শাস্তি দান করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে সন্তানের সংবাদ দান করা। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর পরিবারে কোন সদস্য তাদেরকে চিনতে পারেনি। তারা মানুষ না ফেরেশতা এ ধারণা প্রথমে তাদের ছিল না।

পরিচয় না পেয়ে আল্লাহর নবী ধারণা করেছিলেন যে, তাঁরা মানুষ এবং সম্মানিত মেহমান। এ কারণেই তিনি তাদের আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। খাদ্য সামগ্রী তাদের সামনে পরিবেশন করার পরে তাঁরা যখন খাদ্য স্পর্শ করছে না দেখে আল্লাহর নবী আগন্তুকদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হয়েছিলেন। তিনি সন্দেহ করলেন, এরা মানুষ নয়–ফেরেশতা। তিনি জানতেন যে, মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগন কোন শুভ লক্ষণ নয়।

কারণ ফেরেশতারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে সাধারণত আযাব দানের উদ্দেশ্যে এসে থাকে। এ কারণে তিনি শংকিত হয়েছিলেন যে, তাঁর এলাকার লোক, বা তাঁর নিজের পরিবারের লোক অথবা তাঁর নিজের দ্বারা এমন কোন অপরাধ সংঘটিত হয়নি তো, যার কারণে আল্লাহ শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাদের প্রেরণ করেছেন!

তাঁর পরিবারের লোকজনও শংকিত হয়েছিল ফেরেশতাদের আগমন জানতে পেরে। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য ফেরেশতাগণ যখন জানালো কোন ভয় নেই, আমরা লূত জাতিকে শায়েস্তা করার জন্য আগমন করেছি। তখন তাদের সবার ভয় কেটে গেল এ কারণে যে, তাদের কোন অপরাধের কারণে তাদেরকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ফেরেশতা আগমন করেনি।

এরপর ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর প্রথম স্ত্রী হযরত সারাকে জানালেন যে, তোমার গর্ভে সন্তান হবে। তাঁর প্রথম স্ত্রী হযরত হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম ইতিপূর্বেই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত সারা সে সময় পর্যন্ত কোন সন্তান জন্মদান করতে পারেননি। এ কারণে তাঁর মন ছিল বেদনা-ভারাক্রান্ত। তাঁর এই বেদনা দূর করার জন্য ফেরেশতারা তাঁকে তাঁর হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালাম-এর সম্মানিত ও মর্যাদাবান পুত্রের জন্মগ্রহণের সুসংবাদই কেবল শুনাননি, বরং সেই সাথে এই পুত্র সন্তানের পুত্র অর্থাৎ তাদের নাতী হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর মত এক মহাসম্মানিত নবীর জন্মের সংবাদও প্রদান করেন।

এই সংবাদ শুনে হযরত সারা আলায়হিস্ সালাম হেসে উঠেছিলেন। এর কারণ হলো, তিনি এবং তাঁর স্বামী বয়সের এমন এক দ্বার প্রান্তে পৌছেছিলেন যে, সে বয়সে কেউ সন্তান আশা করতে পারে না। কেননা, সন্তান ধারন করতে হলে শারীরিক কিছু লক্ষণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। সে লক্ষণ বোধ হয় তাদের ভেতর হতে বিদায় গ্রহণ করেছিল। এ কারণেই বিয়টি অসম্ভব মনে করে তিনি হেসেছিলেন।

তখন ফেরেশতাগণ তাকে বলেছিল, আল্লাহ আদেশ করেছেন তোমার সন্তান হবে। সুতরাং বয়স এ ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়িত হবার ক্ষেত্রে বয়স কোন বাধা নয়। সুতরাং আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। বিস্ময় প্রকাশের

ahlussunnah-bd.blogspot.com

অবকাশ নেই। এই বয়সে মহান আল্লাহ সন্তান দান করতে পারেন, এ কথা হযরত ইবরাহীম দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।

মহান আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে একজন নবীর পক্ষে যতটুকু অবগত থাকা প্রয়োজন, ততটুকু তাঁর ছিল। এ কারণেই তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর রহমত থেকে যারা নিরাশ হয়, তারা হলো পথ ভ্রষ্ট। এই ঘটনা পবিত্র কোরআনের সূরা হিজ্‌রে এভাবে বলা হয়েছেঃ-

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ-اِذْ دَخَلُوْ عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا-قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ-قَالُوْ لاَ تَوْجَلْ اِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ-قَالَ اَبَشَّرْ تُمُوْنِىْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ-قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ

(الحجر)

আর তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদারীর কাহিনী একটু শুনিয়ে দাও। যখন তাঁরা এলো তাঁর কাছে এবং বললো, সালাম তোমার প্রতি, সে বললো-আমরা তোমাদের দেখে ভয় পাচ্ছি। তাঁরা জবাব দিল, ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাকে এক পরিণত জ্ঞান সম্পন্ন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করছি। ইবরাহীম বললো, তোমরা কি বার্ধক্য অবস্থায় আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দান করছো ? একটু ভেবে দেখো তো, এ কোন ধরনের সুসংবাদ তোমরা আমাকে দান করছো ?

তাঁরা জবাব দিল, আমরা তোমাকে সত্য সুসংবাদ দান করছি, তুমি নিরাশ হয়ো না। ইবরাহীম বললো, পথভ্রষ্ট লোকজনই তো তাদের রব্ব-এর রহমত থেকে নিরাশ হয়। (সূরায়ে হিজ্‌র, আয়াত নম্বর ৫১-৫৫)

আল্লাহর নবী হযরত লূত

আলায়হিস্ সালাম

হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর কথা মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন। তাঁর জাতি সম্পর্কে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে মানুষকে জানানোর ব্যবস্থা করেছেন। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম ছিলেন হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর ভাতিজা। তাঁর পিতার নাম ছিল হারান। তিনি বাল্যকাল হতেই হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তিনি যে আদর্শ প্রচার করতেন তিনি ছিলেন তাঁর সহযোগী।

হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম যখন হিজরত করেছিলেন, তখন তিনিও তাঁর সাথে হিজরত করেছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ইবরাহীম

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আলায়হিস্ সালাম যখন মিশরে গিয়েছিলেন, তখনও তিনি তাঁর সাথে ছিলেন। এ সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করে এসেছি। তবে এ সম্পর্কে তাওরাতের বর্ণনা হলো, মিশরে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম ছিলেন। উভয়েরই কাছে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র ছিল এবং গৃহপালিত পশুর বিশালাকারের দল ছিল।

তাদের উভয়ের সাথে বেশ কয়েকজন রাখালও ছিল। রাখালগণ তাদের পশুপাল দেখাশোনা করতো। উভয় রাখালদের মধ্যে পশুপাল চরানো নিয়ে একটা হিংসা বিদ্বেষ চলতো। কোন চারণ ভূমিতে পশুর খাবার মত ঘাস পাওয়া গেলে তা কে কার আগে খাওয়াবে তা নিয়ে উভয় রাখালের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগীতা চলতো।

রাখালদের কারণে হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম ও হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর ভেতরে একটা মনমালিন্য সৃষ্টি হতে পারে বিধায় হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ও হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম উভয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আমাদের ভেতরে যদি সুম্পর্ক বজায় রাখতে হয় তাহলে লূত আলায়হিস্ সালামকে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। তাকে চলে যেতে হবে ওর্দুনের পূর্বাঞ্চলে সাদূম ও আমুর এলাকায়। সেখানে অবস্থান করে তাকে ইবরাহীমের ধর্ম প্রচার করতে হবে। আর হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম ফিলিস্তিনে গিয়ে নিজের ধর্ম প্রচার করতে থাকবেন। বাইবেলের কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, উভয় নবীর ভেতরে একটা বড় ধরনের বিবাদ সৃষ্টি হবার কারণে তারা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এসব বর্ণনা কোরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব

আলায়হিস্ সালাম

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম ছিলেন সেই মর্যাদাবান নবী যার পিতা ছিলেন আল্লাহর নবী হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালাম এবং দাদাও ছিলেন আল্লাহর নবী মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবর্রাহীম আলায়হিস্ সালাম। হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম ছিলেন সেই গর্বিত সন্তানের পিতা যার নাম মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম বলে উল্লেখ করেছেন। যে ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম যুবক বয়সে অপূর্ব সুন্দরী নারীদের আহ্বান থেকে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম যখন তাঁর মায়ের আদেশে তাঁর মামার বাড়ি ফাদ্দানে চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করে মামাত বোনদেরকে বিয়ে করেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তাঁর মামার পশুপাল দেখাশোনা করতেন। এতে তাঁর মামা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সাথে পর্যায় ক্রমে নিজের দুই মেয়েকে বিয়ে দেন। সে সময়ের শরিয়াতে দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা বৈধ ছিল। তাঁর মোট স্ত্রী চার জন ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তাওরাতে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর সমস্ত স্ত্রীদের নাম, তাদের জন্মস্থান, সমস্ত সন্তানদের নাম ও তাদের জন্ম স্থান বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁর অন্যান্য সন্তানদের কথা প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু নাম উল্লেখ করা হয়নি।

তাওরাত বর্ণনা করছে তাঁর মোট ১২ জন সন্তান ছিল। তাঁর প্রতিটি স্ত্রীর গর্ভেই সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর সমস্ত সন্তানই ফাদ্দানে জন্ম গ্রহণ করেছিল একমাত্র বিনইয়ামিন ব্যতীত। এই বিনইয়ামিন জন্ম গ্রহণ করেছিল ফিলিস্তিনের কিনআনে। এক সময় হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম মামার বাড়ি ফাদ্দান এলাকা ত্যাগ করে পিতৃভূমি ফিলিস্তিনের কিনআনে এসে বসবাস করতেন।

তিনি যে নবী হবেন এ সংবাদ শুধু তিনি নন, তাঁর পিতা হযরত ইসহাক আলায়হিস্ সালাম-এর জন্মের পূর্বেই মহান আল্লাহ তাঁর দাদা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে দান করেছিলেন। এ ঘটনা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ যে ফেরেশতা সাদুম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা প্রথমে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর কাছে এসে সংবাদ দান করেছিলেন যে, আপনার এবং আপনার স্ত্রীর এই বৃদ্ধ বয়সে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার নাম হবে ইসহাক আলায়হিস্ সালাম। এই ইসহাক আলায়হিস্ সালাম-এর এক সন্তানের নাম হবে ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম। অর্থাৎ আপনার সন্তান ও তাঁর সন্তান উভয়েই আল্লাহর নবী হবেন।

তাওরাতে তাঁর সম্পর্কে নানা ধরনের আজগুবি কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ও মর্যাদাবান নবী। তিনি ছিলেন অসীম ধৈর্যের ও দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী এবং হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর পিতা। পবিত্র কোরআনে তাঁর সন্তান হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর নামের সাথে তাঁর নাম কয়েক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা বাক্বারা ৩৭-১৩৩-১৪০ নম্বর আয়াতে। সূরা আন্‌য়াম ৮৫ নম্বর আয়াতে। সূরা মরিয়ম ৬ নম্বর আয়াতে। সূরা আম্বিয়া ৭২ নম্বর আয়াতে। সূরা নেছা ১৬৩ নম্বর আয়াতে। সূরা ইউসুফ ৬ ও ৩৮ নম্বর আয়াতে। সূরা ছোয়াদ ৪৫ নম্বর আয়াতে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তাঁকে এলাকা ভিত্তিক নবী হিসেবে দায়িত্ব দান করেছিলেন। তিনি কেনআনবাসীদেরকে আল্লাহর পথের দিকে আহবান করতেন। ধারণা করা যেতে পারে, দেশবাসীর পক্ষ হতে তিনি তেমন অত্যাচারিত হননি। যদি হতেন তাহলে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে নীরব থাকতো না। আর তেমন অত্যাচারিত না হবারই কথা। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন নবী, দাদা ছিলেন আল্লাহর নবী। এ ছাড়াও তাঁর দাদার ভাতিজা হযরত লুত আলায়হিস্ সালাম ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর চাচা হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম ছিলেন আল্লাহর নবী।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নবীর বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি যে সময় নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাঁর পূর্ব হতেই বেশ কয়েকজন নবীর সাথে সাধারণ মানুষ পরিচিত ছিল। অর্থাৎ তিনি মানুষের কাছে নবী হিসেবে অপরিচিত ছিলেন না বা তাঁর আহ্বান অপরিচিত ছিল না। তাঁর নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালনের জন্য বলতে গেলে ক্ষেত্র প্রায় প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী নবী রাসুলগণ।

সে সময়ে প্রচলিত যে ভাষা ছিল, সে ভাষাকে বলা হত ইবরানী। ইবরানী ভাষায় হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালামকে বলা হত ইসরাঈল। এই ইসরাঈল শব্দ দুটো শব্দের সমন্বয়ে একটা যুক্ত নাম। ইসরা শব্দের অর্থ হলো চাকর বা গোলাম। আর ঈল শব্দের অর্থ হলো স্রষ্টা বা মনিব। এক শব্দে আরবী ভাষায় যাকে বলা যায় আব্দুল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহর গোলাম। সুতরাং ইসরাঈল শব্দের অর্থ হয় আল্লাহর গোলাম। এই ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তানদের থেকে যে বংশধর সৃষ্টি হয়েছিল, তাদেরকেই ইতিহাস বনী ইসরাঈল হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনীর পটভূমি

পবিত্র কোরনের তিনটি সূরায় হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ আলোচনা করেছেন। দুটো সূরায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা ইউসুফে বিস্তারিত কাহিনী আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহর কোরআন হযরত ইউসুছ আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনীকে 'আহ্সানুল কাসাস' অর্থাৎ সর্বোত্তম ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছে। সূরায়ে ইউসুফ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ইতিহাস মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সে সময়ে অবতীর্ণ করেছিলেন, যখন মক্কায় মুসলমানদের ওপরে চলছিল চরম নির্যাতন এবং মক্কী জীবনের প্রায় শেষ অধ্যায়ে।

সে সময়ে মক্কার ইসলামী আন্দোলন বিরোধীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তারা হত্যা করবে, না দেশ হতে বিতাড়িত করবে, না বন্দী করবে। এ সময়ে ইহুদীদের ইঙ্গিতে মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করেছিল, বনী ইসরাঈলীগণ কেন মিশরে গমন করেছিল ?

হাদিস শরীফে বিষয়টি যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার সারমর্ম হলো, মক্কার কুরাঈশ নেতাগণ ইহুদীদের সাথে বৈঠক করে জানিয়েছিল, আমরা তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আর পারছি না, এই লোকটি নবুয়্যাতের দাবী করছে, তাকে মিথ্যুক প্রমাণ করতেও পারছি না, এ ব্যাপারে তোমরা কি আমাদেরকে কোন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারো ?

ইহুদীরা তখন কুরাঈশদেরকে পরামর্শ দান করেছিল যে, তাকে যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রামাণ করতে চাও তাহলে তাকে গিয়ে প্রশ্ন করো যে, হযরত

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ইয়াকুব আলায়হিস সালাম-এর সন্তান শাম হতে মিশরে কেন যেতে বাধ্য হয়েছিল। আর হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সম্পূর্ণ ইতিহাস কি ? এই প্রশ্নগুলো করো। সে যদি সত্যকারে নবীই হয় তাহলে বলতে পারবে আর নবী না হলে বলতে পারবে না।

আরবের সাধারণ লোকজন এই ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানতো না, সে দেশে এই কাহিনীর নাম নিশানা পর্যন্ত ছিল না, এমন কি তাদের ইতিহাস ঐতিহ্যে বা কিংবদন্তিতে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনীর ছিটে ফোটাও ছিল না। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও কোন দিন তাদের সামনে এই কাহিনীর কোন অংশ বর্ণনা করেননি। কারণ স্বয়ং তাঁকেও মহান আল্লাহ ইতিপূর্বে এই ইতিহাস জানানোর প্রয়োজন বোধ করেননি।

কুরাঈশদের ধারণা ছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাহিনী বলতে তো পারবেনই না, তিনি নানা ধরনের অজুহাত পেশ করতে থাকবেন, এবং সুযোগ বুঝে ইহুদীদের কাছ হতে কাহিনী জেনে নিয়ে তাদের কাছে ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনী শোনাবেন। তখনই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধরবে যে, এবার তোমার নবী দাবী করার, তোমার কাছে জিবরাঈল আসার, ওহী নাজিল হবার রহস্য আমরা বুঝতে পেরেছি। আসলে তুমি ইহুদীদের কাছে থেকে সব শুনে আমাদের কাছে পেশ করো। এই হীন উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ইহুদীদের শিখানো প্রশ্ন কুরাঈশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে করেছিল।

কিন্তু কুরাঈশরা আল্লাহর নবীকে পরীক্ষা করতে এসে উল্টো নিজেরাই লজ্জিত হয়েছিল। মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সমস্ত ঘটনা, যাবতীয় ইতিহাস তাঁকে জানিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, এই ঘটনাকে তিনি কুরাঈশদের অবস্থার সাথে মিলিয়ে দিলেন এবং হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইয়েরা তাঁর সাথে যেমন ব্যবহার করেছিল সেই দূর অতীতে, সেই ধরনের ব্যবহারই যে কুরাঈশরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে করছে, তাও আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে লজ্জিত করলেন।

দুটো বিরাট উদ্দেশ্য সামনে রেখে মহান আল্লাহ এই ইতিহাস বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জানিয়েছিলেন। প্রথমত, এই ইতিহাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শোনাতে সক্ষম হলেন–এ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হলো যে, তিনি সত্যই আল্লাহর নবী। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যে দাবী করেছিল, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তাদের দাবী অনুসারে প্রকৃত ঘটনা তাদেরকে বলেছেন। তাদের নিজেদের প্রস্তাবিত পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণ করে দেয়া হলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কারো কাছ হতে কোন কথা বা ঘটনা শুনে এসে তাদের কাছে বলেন না। বরং তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে যে ওহী আসে, তিনি সে ওহীর ভিত্তিতেই কথা বলেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

দ্বিতীয়ত, কুরাঈশ নেতৃবৃন্দ ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যকার সে সময়ের পারস্পরিক ব্যাপারটিকে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর ভাইদের পারস্পরিক ব্যাপার ও ঘটনার সাথে মিলিয়ে কুরাঈশদেরকে বলা হলো যে, আজ তোমরা তোমাদের ভাই এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে যা করছো, তোমরা যার কাহিনী শোনার দাবী করেছিলে, তাঁর ভাইয়েরাও তাঁর সাথে এমনই ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তারা যেভাবে ইউসুফ-এর কাছে আল্লাহর ইচ্ছায় ব্যর্থ হয়েছিল, এই ভাইকে তারা একদিন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কূপে নিক্ষেপ করেছিল এবং এক সময় তারা সেই ভাই ইউসুফ-এর পায়ের নীচে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল।

ঠিক তেমনি আল্লাহর ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে তোমাদের আজকের এই শক্তি সামর্থ একদিন শেষ হয়ে যাবে, তোমাদের এই ভাই মুহাম্মদ আলায়হিস্ সালামকে এই অসহায় অবস্থা থেকে একদিন মহা ক্ষমতাশালী করবেন–যেমন করেছিলেন তোমরা যে ইউসুফের কাহিনী শুনতে চাইছো, সেই ইউসুফকে। তাঁর ভাইয়েরা তাকে হত্যা করার জন্য যেমন দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিল, তোমরাও আজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্মূল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছো।

কিন্তু আল্লাহর রহমতে তোমাদের সমস্ত চক্রান্ত একদিন ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অনুগ্রহ কামনা করবে–যেমন করেছিল ইউসুফ-এর ভাইয়েরা। এ কারণে এই সূরা ইউসুফের ৭ নম্বর আয়াতেই স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ–

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيٰتٌ لِّلسَّاۤئِلِيْنَ (يوسف)

ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনায় এই প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শনাদিও নিহিত রয়েছে। (সূরা ইউসুফ, আয়াত নম্বর ৭)

প্রকৃত পক্ষে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ইতিহাসকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাঈশদের পারস্পরিক ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে দিয়ে পবিত্র কোরআন এক সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তী দশ বছরের নানা ঘটনাবলী অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও সঠিক প্রমাণ করে দিয়েছে। এই ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর কাহিনী অবতীর্ণ হবার মাত্র দেড় বা দুই বছর পরেই কুরাঈশ নেতৃবৃন্দ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পৃথিবী হতে বিদায় করে দেবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করেছিল। ফলে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাধ্য হয়েছিলেন মাতৃভূমি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে।

মদীনায় গিয়ে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন উন্নতি সাধন ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, তা কুরাঈশদের ধারণা ও আশা আকাংখার বিপরীত ছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তারপর ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় মক্কা বিজয়কালে ঠিক সেই ধরনের ঘটনাই সংঘটিত হয়, যা মিশরের রাজধানীতে হযরত ইউসুফের সামনে তাঁর ভাইদের শেষবারের উপস্থিতিকালে সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর ভাইগণ অত্যন্ত বিনয়, নম্রতা ও কাতর অবস্থায় তাঁর সামেন হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমাদের প্রতি দান সদকা করুন, আল্লাহ দান সদকাকারীদের সুফল দান করেন। সে সময় হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এমন ক্ষমতা লাভ করেছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করলেই চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে ক্ষমা করে দিয়ে বলেছিলেন, আজ তোমাদেরকে গ্রেফতার করা হবে না। আল্লাহ যেন তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তিনি তো সব দয়া প্রদর্শনকারীদের অপেক্ষা অনেক বেশী দয়ালু।

ঠিক এই ধরনের ঘটনাই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মক্কার কুরাঈশদের জীবনেও ঘটেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে যখন পরাজিত কুরাঈশরা নবী সম্রাট বিজয়ী সিপাহসালার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে নত মস্তকে দন্ডায়মান ছিল, যখন কুরাঈশদের প্রতিটি জুলুম অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সক্ষম ছিলেন, তখন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাঈশদের দিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রশ্ন করেছিলেন, তোমরা কি মনে করছো; আমি তোমাদের সাথে আজ কেমন ব্যবহার করবো বলে তোমরা আশা পোষণ করো ? জুলুমকারী পরাজিত কুরাঈশরা করুণ কণ্ঠে বলেছিল, আপনি নিজে এক উদার আত্মাসম্পন্ন ভাই এবং এক উদার আত্মাসম্পন্ন ভাইয়ের সন্তান।

ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র–

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নবী হচ্ছেন, এই সংবাদ পেয়ে পিতা হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর খুশী কতদূর যে বৃদ্ধি লাভ করেছিল, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সৎ ভাই ইউসুফের প্রতি পিতার এই দুর্বলতা দেখে তাদের মনের আগুন আরো বেশী করে জ্বলে উঠলো। তারা কিভাবে ষড়যন্ত্র করেছিল, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ শোনাচ্ছেনঃ–

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِه اٰيٰتٌ لِّلسَّاۤئِلِيْنَ–اِذْ قَالُوْا
لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ–اِنَّ
اَبَانَا لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ–اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ
لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِه قَوْمًا صٰلِحِيْنَ–قَالَ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ (يوسف)

সত্য কথা এই যে, ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে এই সব প্রশ্নকারীদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। কাহিনীর সূচনা হয়েছে এইভাবে যে, তাঁর ভাইয়েরা নিজেরা বলাবলি করলো, এই ইউসুফ ও তাঁর ভাই দুইজনই আমাদের পিতার কাছ হতে আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়। অথচ আমরা সম্পূর্ণ একটি দল। প্রকৃত বিষয় হলো আমাদের পিতা একেবারেই দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন।

চলো, ইউসুফকে হত্যা করে ফেলি অথবা তাকে কোথাও নিক্ষেপ করি। যেন তোমাদের পিতার লক্ষ্য কেবল তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়। এই কাজ করার পরে তোমরা সদাচারী হয়ে থাকবে। তখন তাদের একজন বললো, ইউসুফকে হত্যা করো না। কিছু যদি করতেই হয়, তাহলে তাকে কোন অন্ধ কূপে ফেলে দাও। আসা যাওয়ার পথে কোন কাফেলা হয়ত তাকে বের করে নিয়ে যাবে। (সূরায়ে ইউসুফ, আয়াত নম্বর ৭-১০)

এই ইউসুফ ও তাঁর ভাই দুইজনই আমাদের পিতার কাছ হতে আমাদের চেয়ে বেশী প্রিয়–এই কথা দিয়ে বুঝা যায় যে, হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম-এর আরেকজন ভাই ছিল। বাইবেল সে সহোদর ভাই-এর নাম বিন-ইয়ামীন হিসেবে উল্লেখ করেছে। তিনি ইউসূফের চেয়ে কয়েক বৎসরের ছোট ছিলেন। তাঁর জন্মের সময়ই তাঁর জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। এ কারণেই হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম এই মা-হারা দুই ভাইয়ের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখতেন। এটা ছাড়া এই অপত্য স্নেহ লাভের আর একটি কারণ এই ছিল যে, তাঁর সব কয়টি ছেলের মধ্যে হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম ছিলেন এমন, যার মধ্যে তিনি সৌভাগ্য ও সৎপথে চলার উজ্জ্বল ভাবধারা ও প্রবণতা দেখতে পেয়েছিলেন। আর হযরত ইউসুফের স্বপ্নের কথা শুনে তিনি (ইয়াকুব) যে অভিমত ব্যক্ত করেন, তা হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি এই পুত্রটির অস্বাভাবিক ও অসাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। অপর দিকে বাকী দশজন জ্যোষ্ঠ ছেলের চরিত্র যে কি ধরনের ছিল পরবর্তী ঘটনাবলী হতে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তাহলে একজন সৎ মানুষ এহেন সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন কি করে?

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাইবেল-এ ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম–এর ভাইদের হিংসা-বিদ্বেষের এমন একটি কারণ উল্লেখিত হয়েছে যাতে উল্টো হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম-এর উপরই সমস্ত দোষ আরোপিত হয়। তাতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসূফ আলায়হিস্ সালাম ভাইদের বিরুদ্ধে পিতার কাছে নিন্দাবাদ করতেন। এই কারণে ভাইয়েরা তাঁর প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট ছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আমাদের পিতা একেবারেই দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন–এই বাক্যাংশের মূল ভাবধারা বুঝার জন্য মরুচারীদের গোত্রীয় জীবনের অবস্থাকে সম্মুখে রাখা আবশ্যক। যেখানে কোন সুসংগঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা বর্তমান থাকে না এবং স্বাধীন গোত্রসমূহ পরস্পরের পাশাপাশি বসবাস করে, সেখানে এক ব্যক্তির শক্তি নিহিত থাকে তার নিজের পুত্র, পৌত্র, ভাই, ভাইপো ইত্যাদির বিপুলতায়। সময় ও প্রয়োজন দেখা দিলে তার জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য তারাই তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। এ ধরনের অবস্থায় নারী ও শিশু অপেক্ষা যুবক ছেলে-সন্তানই অধিক প্রিয় ও কাম্য হয়ে থাকে। কেননা অন্যান্যের তুলনায় শত্রুর মুকাবিলায় এরাই বেশী কাজে লাগতে পারে। এই কারণেই এই ভাইয়েরা বলেছিল, আমাদের পিতা বৃদ্ধ বয়সে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। আমরা যুবক ছেলেদের একটি জোট অসময়ে কাজে আসতে পারি; কিন্তু তিনি আমাদের বেশী ভালো না বেসে এই সব ছোট ছোট ছেলে-পেলেকে বেশী ভালোবাসেন অথচ বিপদের সময় তারা কোন কাজেই আসে না বরং তাদের রক্ষণাবেক্ষণই হয় বড় কঠিন সমস্যা।

এই কাজ করার পরে তোমরা সদাচারী হয়ে থাকবে–যেসব লোক নিজেদেরকে প্রবৃত্তির তাড়নার হাতে সোপর্দ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঈমান ও নেক আমলের সাথেও কিছুটা সম্পর্ক বজায় রাখে, আলোচ্য বাক্যাংশ তাদের মনস্তত্ত্বকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করছে। এই ধরনের লোকদের নিয়মই এই যে, তাদের প্রবৃত্তি যখনই তাদের কাছে কোন অন্যায় কাজের দাবী জানায়, তখন তারা ঈমানের দাবি ও নির্দেশ উপেক্ষা করে প্রবৃত্তির নির্দেশই প্রথমে পালন করতে লেগে যায়। আর ভিতর হতে বিবেক যখন প্রতিবাদ করে ওঠে, তখন সেটাকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে যে, একটু সবুর কর। এবার এই অপরিহার্য গুনাহটি না করলে আমাদের কাজ-কর্ম অচল হয়ে থাকবে। কাজেই এই কাজটা তো করতে দাও। এর পরই আল্লাহ্ চাইলে তওবা করে নেকলোক হয়ে যাবো-যেমন তুমি দেখতে চাও।

আমিই তোমার হারানো ভাই ইউসুফ

হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম তাঁর প্রিয় সন্তান ইউসুফকে হারিয়ে তাঁর আরেক সন্তান–যে ছিল হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ছোট ভাই, তাঁকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর এই মহান নবীকে পুনরায় এমন এক পরীক্ষায় নিক্ষেপ করলেন যে, এই পরীক্ষার ভেতর দিয়েই তিনি লাভ করলেন তাঁর হারানো সন্তান ইউসুফকে। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ছোট ভাইকে ছেড়ে দেয়া পিতা হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য ছিল আরেকটা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় তিনি এমন ভাবে উত্তীর্ণ হলেন যে, তাঁর সন্তান ইউসুফকে তিনি এমন এক অবস্থায় লাভ করলেন যে, তাঁর সন্তান তখন মিশরের প্রচন্ড ক্ষমতা ধর শাসক। হিসেবে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর অন্যান্য সন্তানদের আবেদনের

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পরিপ্রেক্ষিতে তিনি হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ছোট ভাইকে তাদের সাথে দিতে বাধ্য হলেন। তাদের সাথে ছোট সন্তানকে দেয়ার সময় তিনি তাদেরকে আল্লাহর নামে প্রতীজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। তারা যখন কেনআন থেকে মিশরের দিকে যাত্রা করেছিল, তখন পথিমধ্যে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ছোট ভাই-এর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বৈমাত্রেয় ভাইগণ পুনরায় হিংসায় জ্বলে উঠেছিল।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ছোট ভাইয়ের নাম বাইবেলে বলা হয়েছে বিনইয়ামিন। এই বিনইয়ামিনের প্রতি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের হিংসার কারণ ছিল, পিতা ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম তাকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। একদিকে ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে হারিয়ে তিনি বিনইয়ামিনকে দেখে ইউসুফ হারানোর ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করতেন, অপরদিকে মাতৃহারা এই সন্তানের প্রতি তিনি এমনই স্নেহ প্রবণ ছিলেন যে, তাঁর যে মা নেই, এ কথা তাকে বুঝতে দিতেন না।

তারপর এই বিনইয়ামিনেক মিশরের বাদশাহ ডেকে পাঠিয়েছে, অথচ তারা এগারোজন ভাই রয়েছে, তাদেরকে গুরুত্ব না দিয়ে মিশরের বাদশাহ বিনইয়ামিনকে গুরুত্ব দান করেছে, এটাও ছিল তাদের হিংসার আরেকটি কারণ। তারা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছিল, তাঁর ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধেও তারা হয়ত একই ষড়যন্ত্র করতো। কিন্তু তাদের সামনে মিশরের বাদশাহ ছিল বড় বাধা। কারণ এই বিনইয়ামিনকে নিয়ে না গেলে বাদশাহ একদানা শস্যও দেবে না।

এ কারণে তাকে হত্যা করতে না পেরে পথে তারা বিনইয়ামিনকে নানা ধরনের বাজে কথা বলতে বলতে মিশরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর এই ভাইও ছিলেন প্রচন্ড ধৈর্যশীল। তিনি নীরবে বৈমাত্রেয় ভাইদের গালাগালি সহ্য করছিলেন। পিতা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর সন্তানদেরকে মিশরের রাজনৈতিক কারণে তাদেরকে মিশরের প্রবেশের যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দান করেছিলেন, সে সিদ্ধান্ত অনুসারেই তারা মিশরে প্রবেশ করেছিল।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর দরবারে তারা উপনিত হয়েছিল। দীর্ঘ ব্যবধান আর বিচ্ছেদের পরে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর প্রিয় ছোট ভাইকে ফিরে পেয়েছিলেন। সে সময়ে বোধহয় ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁর অন্তরে যন্ত্রণার প্রচন্ড ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল। পরিবেশ পরিস্থিতি ও পদের কারণে তাঁর পক্ষে মানবিয় আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। সে সময়ে বিদেশ হতে যেসব মেহমান মালামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে মিশরে আগমন করতো, তাদের থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থার উন্নতমানের পরিবেশ সেখানে ছিল বলে অনুমান করা যায়।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর ভাইগণ তাদের ভাই ইউসুফ আলায়হিস সালাম-এর পরিচয় না জানলেও তিনি তো তাদের পরিচয় জানতেন। এ কারণে অনুমান করা যায় যে, তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রাজ মহলেই করা হয়েছিল। এরপরের ঘটনা মহান আল্লাহ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ-

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْ-
اَنَااَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-فَلَمَّا جَهَّزَ هُمْ
بِجَهَازِ هِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ
اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ-قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا
تَفْقِدُوْنَ-قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهٖ حِمْلُ
بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ-قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا
لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ-قَالُوْا فَمَا جَزَاؤُهٗ اِنْ
كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ-قَالُوْا جَزَاؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاؤُ
هٗ-كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ-فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ
اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ-كَذٰلِكَ نَجْزِى
الظّٰلِمِيْنَ-فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ ثُمَّ
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ-كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ-مَا كَانَ
لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ-نَرْفَعُ
دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ-وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ-قَالُوْا اِنْ يَّسْرِقْ
فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

يُبْدِ هَالَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ-
قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا
مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ-قَالَ مَعَاذَاللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ
اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ اِنَّا اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ (يوسف)

এই লোকজন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলে সে তাঁর ভাইকে নিজের কাছে পৃথকভাবে ডেকে নিল এবং তাকে বলে দিল যে, আমি তোমার সেই ভাই, যে ভাই হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তুমি সেইসব বিষয়ে আর চিন্তা করবে না, যা এই লোকেরা আজ পর্যন্ত করে আসছে।

যখন ইউসুফ তাঁর ভাইদের মাল-সামান বোঝাই করছিল, তখন সে তাঁর ভাইয়ের মাল-সামানের মধ্যে নিজের পাত্রটি রেখে দিল। তারপর একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষনা করলো, হে কাফেলার লোকজন ! তোমরা তো চোর।

তারা পেছন দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের কি কোন জিনিষ হারিয়ে গিয়েছে ? সরকারী কর্মচারীটা বললো, আমরা বাদশাহের পান করার পাত্রটি পাচ্ছি না। আর তাদের জমাদ্দার বললো, যে ব্যক্তি সেটা এনে দিতে পারবে, তাকে এক উট বোঝাই মাল পুরুস্কার দেয়া হবে। আমি এর দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

এই ভাইয়েরা বললো, আল্লাহর শপথ! তোমরা খুব ভালো করেই জানো যে, আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই। তারা বললো, আচ্ছা তোমাদের কথা যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে ? তারা বললো, তার শাস্তি ? যার মালের মধ্যে এই জিনিষটা পাওয়া যাবে, তাকেই নিজের শাস্তির দরুণ ধরে রাখা হবে। আমাদের কাছে এই ধরণের জালিমদের শাস্তি দেওয়ার এটাই নিয়ম।

তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের পূর্বে অন্যান্য ভাইদের বস্তাগুলো সন্ধান করতে শুরু করলো। পরে তাঁর ভাইয়ের বস্তা হতে হারানো জিনিষটা বের করে নিল। এইভাবে আমি আমার কর্ম-কৌশলের মাধ্যমে ইউসুফের সহযোগীতা করলাম। বাদশাহের দ্বীনের (মিশরের রাজকীয় আইন) মাধ্যমে নিজের ভাইকে ধরে রাখা তাঁর কাজ ছিল না, অবশ্য যদি আল্লাহ তা চান। আমি যার ইচ্ছা মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেই আর একজন বিচক্ষণ এমন আছে, যে সমস্ত জ্ঞানবানের উর্ধ্বে।

এই ভাইয়েরা বললো, এ লোকটি চুরি করলে তা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। ইতিপূর্বে এর ভাই ইউসুফও চুরি করেছে। ইউসুফ তাদের এই কথা শুনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলো, প্রকৃত ব্যাপার তাদের সামনে প্রকাশ করলো না। শুধু নিঃশব্দে এই কথাটাই বললো, তোমরা তো বড়ই খারাপ লোক, (আমার মুখের ওপরে আমার

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সম্পর্কে) যে অভিযোগ তোমরা করছো, আল্লাহ তার রহস্য অত্যন্ত ভালোভাবেই অবগত আছেন।

তারা বললো, হে ক্ষমতাবান সর্দ্দার ! (আযীয) এর পিতা অত্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তি। এর পরিবর্তে আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অত্যন্ত নির্মল প্রকৃতির লোক দেখছি। ইউসুফ বললো, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, অপর কোন ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে রাখতে পারি ! আমরা যার কাছে হারানো মাল পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য একজনকে ধরে রাখলে তো আমরা জালিম হয়ে পড়বো। (সূরায়ে ইউসুফ, আয়াত নম্বর-৬৯-৭৯)

আমি তোমার সেই ভাই, যে ভাই হারিয়ে গিয়েছিল। এখন তুমি সেইসব বিষয়ে আর চিন্তা করবে না, যা এই লোকেরা আজ পর্যন্ত করে আসছে–প্রায় ২১/২২ বছর পরে আপন দুই ভাইয়ের পুনর্মিলনের সময় যা কিছু ঘটেছিল, তা এই ছোট্ট বাক্যে সন্নিবিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম কোন ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করে এবং পরীক্ষার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনিত হয়েছেন, তা তিনি তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করেছেন।

তাঁর ছোট্ট ভাইও খুব সম্ভব সেই পরিস্থিতির বর্ণনা বড় ভাই ইউসুফকে দান করেছেন যে, তাঁর অবর্তমানে পিতার অবস্থা কেমন হয়েছে, তাঁর সাথে বৈমাত্রেয় ভাইগণ কি ধরনের দুর্ব্যবহার করেছে, তাঁর ব্যাপারে পিতাকে মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। এরপর হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর ভাইকে সান্ত্বনা দান করেছেন, এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে, পিতাকেও আমার কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। আমাদের এই বৈমাত্রেয় হিংসুক ও জালিম ভাইদের সাথে আর তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে না এখন পর্যন্তও আমার পরিচয় আমার ঐ ভাইদেরকে জানানো যাবে না। বোধহয় এই সময় তাঁর ছোট ভাই তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমাকে কিভাবে রাখবেন, ঐ ভাইদেরকে কি বলবেন ?

এই সময় হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর ভাইকে জানিয়ে ছিলেন, কি কৌশলে তিনি তাকে নিজের কাছে রাখবেন। যে কৌশল বর্তমানে গোপন রাখা তিনি একান্ত আবশ্যক মনে করেছিলেন। সুতরাং অনুমান করা ভুল হবে না যে, এ সম্পর্কে তাদের দুই ভাইয়ের ভেতরে কোন পরামর্শ হয়েছিল।

যখন ইউসুফ তাঁর ভাইদের মাল-সামান বোঝাই করছিল, তখন সে তাঁর ভাইয়ের মাল-সামানের মধ্যে নিজের পাত্রটি রেখে দিল–ঘটনা এমন ছিল যে, তাদের মাল-সামান যখন কোন বস্তা জাতিয় জিনিষের ভেতরে রাখা হচ্ছিল, তখন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ছোট ভাইয়ের বস্তার ভেতরে সেই পান পাত্রটা গোপনে রাখা হয়েছিল। পান পাত্রটা বিনইয়ামিনের মাল-সামানের মধ্যে রাখার ব্যাপারে খুব সম্ভব হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর ছোট ভাইয়ের সাথে পরামর্শ করেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ এর পূর্ববর্তী আয়াতে এই ধরনের ইশারা পাওয়া যায়।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কেননা, হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ছোট ভাই আপন বড় ভাইকে ফিরে পেলেন এবং এমন অবস্থায় ফিরে পেলেন যে, ভাই যখন মিশরের শাসক। এ অবস্থায় হয়ত তিনি বড় ভাইকে ছেড়ে ঐ জালিম ভাইদের সাথে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। বড় ভাই ইউসুফের কাছেই অবস্থান করার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন।

এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম কৌশলগত কারণে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতেও পারছিলেন না। আবার পরিচয় প্রকাশ না করেও ভাইকে তাঁর কাছে রাখতে পারছিলেন না। জালিম ভাইদের সাথে তাকে প্রেরণ করতেও তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং এসব দিক সামনে রাখলে এ কথা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, বিনইয়ামিনকে মিশরে রাখার ব্যবস্থা তাঁর সাথে পরামর্শ করেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। যদিও এই ব্যবস্থার ভেতরে কিছুটা লজ্জা ও অপমান জড়িত ছিল।

কেননা, ছোট ভাইয়ের ওপরে চুরির কলঙ্ক আরোপিত হয়েছিল। কিন্তু তারা এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই কলঙ্ক খুব সহজেই দূর করা যাবে। কারণ প্রকৃত বিষয় যখন সবার সামনে প্রকাশ করা হবে, তখন মানুষ জানতে পারবে যে, এই কৌশল কেন অবলম্বন করা হয়েছিল এবং সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেই সাথে আরেকটি বিষয়ের পরীক্ষা হয়ে যাবে যে, বৈমাত্রেয় ভাইদের মন-মানসিকতা সেই আগের মতই হিংসই আছে না কিছুটা মানবতা সেখানে আসন লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

হে কাফেলার লোকজন ! তোমরা তো চোর–রাজ কর্মচারীদের মধ্যে এই কথা কেউ একজন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইদেরকে বলেছিল। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এই গোপন ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদেরকে কাজে লাগিয়েছিলেন এবং তাঁর ভাইদের বাণিজ্য কাফেলার লোকজনের ওপর মিথ্যা অভিযোগ আরোপের কথা তিনি স্বয়ং সেই কর্মচারীদেরকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন, বর্তমান আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াত হতে এ ধরনের কোন ইশারা পাওয়া যায় না।

অত্যন্ত সহজভাবে মূল ঘটনার যে চিত্র ভেসে ওঠে তাহলো, পান পাত্রটা অতি গোপনে খাদ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ বস্তার ভেতরে রেখে দেয়া হয়েছিল। এরপর রাজকর্মচারীরা সেই পান পাত্রটা না পেয়ে ধারণা করেছিল যে, এই পান পাত্র চুরির কাজ এই কাফেলার লোকজনই করেছে। কেননা, তারাই তো এখানে অবস্থান করেছিল। এ কারণেই তারা গোটা কাফেলার লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, তোমরাদেরকে এখানে সম্মান মর্যাদার সাথে স্থান দেয়া হয়েছিল। তোমাদের আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দয়া করে তোমাদের কাছে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করা হয়েছে। এতেও তোমরা সন্তুষ্ট হতে না পেরে চুরি করতে লেগেছো ?

তারা বারবার অস্বীকার করছিল। বলেছিল, আমরা চুরি করিনি। কেননা আমরা চোর নই। রাজকর্মচারীরা Chalenge করে বলেছিল, তবুও আমরা তোমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজ তল্লাশী করে দেখবো। যদি তোমাদের ব্যাগ-ব্যাগেজের ভেতরে পান পাত্রটা পাওয়া যায়, তাহলে তোমরা তো চোর হিসেবে প্রমাণিত হবে। এ অবস্থায় যার ব্যাগে তা পাওয়া যাবে, চোর হিসেবে তাকে কি শাস্তি দান করা হবে ?

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তখন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর বৈমাত্রেয় ভাইগণ বলেছিল, 'যার মালের মধ্যে এই জিনিষটা পাওয়া যাবে, তাকেই নিজের শাস্তির দরুণ ধরে রাখা হবে। আমাদের কাছে এই ধরণের জালিমদের শাস্তি দেওয়ার এটাই নিয়ম।'

এখানে একটা কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, এই লোকগুলো ছিল হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর। তাদের ভেতরে সে সময় পর্যন্ত সেই আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে আইন মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর মাধম্যে তৎকালিন মানুষের জন্য অবতীর্ণ করেছিলেন। সে সময়ে চুরির শাস্তি এটাই ছিল যে, চোর ধরা পড়লে সে যার সম্পদ চুরি করেছে, তার দাস বানিয়ে রাখা হবে। এ কারণেই হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তানগণ বলেছিল, চোর বলে যে প্রমাণিত হবে তাকে সেই শাস্তিই পেতে হবে, সে সম্পদের মালিকের দাস হয়ে থাকবে।

এইভাবে আমি আমার কর্ম-কৌশলের মাধ্যমে ইউসুফের সহযোগীতা করলাম–ঘটনা বর্ণনা পূর্বক মহান আল্লাহ আয়াতের শেষে এই কথাটা বলেছেন। এই ধারাবাহিক ঘটনাবলীর মধ্যে কোন কৌশল বা ব্যবস্থাটা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর মাধম্যে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে করা হয়েছিল, তা প্রনিধানযোগ্য। এ কথা সুস্পষ্ট যে, খাদ্য সামগ্রীর ভেতরে পান পাত্র রাখার কাজটা হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নিজেই করেছিলেন। আর চুরির সন্দেহে কাওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা বা গ্রেফতার করা সরকারী কর্মচারীদের একটা সাধারণ কাজ।

কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার কর্ম কৌশলের মাধম্যে ইউসুফকে সহযোগিতা করলাম। কিন্তু কি ধরণের কৌশল আল্লাহ করেছিলেন ? এ সম্পর্কে কোরআনের আয়াতসমূহে আল্লাহর এই কৌশল জানার জন্য অনুসন্ধান করলে শুধু একটা জিনিষই এর অনুকূলে পাওয়া যায়। আর সে জিনিষটা হলো, সরকারী কর্মচারীগণ স্বয়ং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, চুরির শাস্তি কি হতে পারে ? তারা নিজেরা এ কথা বলেনি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ চোর বলে প্রমাণিত হলে তাকে চুরিকৃত সম্পদের মালিকের কাছে রেখে দেয়া হবে অথবা কারাগারে বন্দী করা হবে।

হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর ভাইয়ের কামনা ছিল, তাঁরা দুই ভাই একত্রে থাকবেন। এখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইগণ যদি বলতেন যে, চুরির শাস্তি হলো কারাগারে বন্দী করা বা বেত্রাঘাত করে ছেড়ে দেয়া, তাহলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর ভাইয়ের কামনা পূরণ হতো না। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর কুদরতী ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে মিশরের রাজকর্মচারীদের মুখ দিয়ে চোরের শাস্তি কি–এ প্রশ্ন করালেন এবং হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইদের মুখ দিয়ে বের করালেন যে, চোরের শাস্তি হলো, দাসত্ব বরণ করা।

মহান আল্লাহ এই কৌশল করে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর ভাইকে একসাথে থাকার সুযোগ করে দিলেন। অপরদিকে আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আলায়হিস্ সালাম-কে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর শরিয়তের শাস্তি বাস্তবায়নের সুযোগ দান করলেন। এটাই ছিল মহান আল্লাহর অপূর্ব কৌশল।

বাদশাহের দ্বীনের (মিশরের রাজকীয় আইন) মাধ্যমে নিজের ভাইকে ধরে রাখা তাঁর কাজ ছিল না–এই কথার মধ্যে দিয়ে মহান আল্লাহ যে কথা বলেছেন তাহলো, হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর নিজের ব্যক্তিগত কাজের বিষয়ে মিশর রাজ্যের আইনের সাহায্য গ্রহণ করবেন, এটা হতে পারে না। কেননা, একজন নবীর পক্ষে মানুষের বানানো আইনের সাহায্য গ্রহণ করা তাঁর নবী হওয়ার মর্যাদার পরিপন্থী ব্যাপার। তিনি তাঁর ভাইকে মিশরের আইন দিয়েই আটক রাখতে তথা নিজের কাছে রাখতে পারতেন। কিন্তু এতে করে মানুষের বানানো আইনের সাহায্য গ্রহণ করা হত।

পক্ষান্তরে যে নবী ইসলাম বিরোধী আইন বিধানের পরিবর্তে ইসলামী আইন কার্যকরী করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি মানুষের বানানো আইনের সাহায্য গ্রহণ করবেন, এটা ছিল তাঁর মর্যাদার বিপরীত। অবশ্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-কে এই ধরনের একটা ভুলের ভেতরে নিমজ্জিত করতে পারতেন। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁর নবীর ব্যক্তিত্বে একটা ভুলের স্পর্শ ঘটুক। এই কারণে তিনি তাঁর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এমন একটা পদ্ধতি দেখালেন যে, যার মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম উপকৃত হলেন।

এ কারণে দেখা যায় যে, রাজকর্মচারীগণ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইদের কাছে চুরির শাস্তির কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং তারা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর শরিয়ত অনুসারে চোরের শাস্তির কথা বলে দিল। এই অবস্থা এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি। এটা ছিল মহান আল্লাহর এক অপূর্ব কৌশল। এই ব্যবস্থা ছিল তখন সময়ের দাবী।

কারণ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইগণ মিশরের নাগরিক ছিল না। তারা একটা স্বাধীন এলাক হতে মিশরে খাদ্য ক্রয় করার জন্য এসেছিল। তারা নিজেরাই তাদের এলাকার চুরি সম্পর্কিত প্রচলিত আইন বলে দিয়েছিল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মিশরের আইনের সাহায্য গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই আর ওঠে না। পরবর্তী দুই আয়াতে মহান আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই জিনিসটাকেই পেশ করেছেন।

সুতরাং কোন বান্দাহ যখন মানবীয় দুর্বলতার কারণে কোন ধরণের ভুলের শিকারে পরিণত হয়, তখন সেই মুহূর্তেই মহান আল্লাহ অদৃশ্য জগৎ হতে নিজেই তাঁর সেই বান্দাহকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন, একজন বান্দার জন্য এর থেকে উচ্চ মর্যাদা আর কি হতে পারে ! এই ধরণের উচ্চ মর্যাদার অধিকারী কেবল তাঁরাই হতে পারে, যারা নিজেদের চেষ্টা সাধান ও কর্মদ্বারা বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে মুমিন-মুত্তাকী ও মুহসিন হিসেবে প্রমাণ করতে পারে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত শুআইব ও তার জাতি

আলায়হিস্ সালাম

কোরআন মজীদের হযরত শুআইব আলায়হিস সালাম ও তাঁর জাতির আলোচনা সূরা আ'রাফ, সূরা হূদ ও সূরা শুআ'রা-এর মধ্যে কিছু কিছু বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। আর সূরা হিজ্‌র ও সূরা আন্‌কাবুতে সংক্ষিপ্তভাবে করা হয়েছে। এই সূরাগুলোর মধ্যে সূরা হিজ্‌র ব্যতীত হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালাম-এর নাম দশ জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আরাফ ৮৫-৮৮-৯০-৯২ নম্বর আয়াতে। সূরা হূদ ৮৪-৮৭-৯০-৯৫ নম্বর আয়াতে। সূরা শুআ'রা ১১৭ নম্বর আয়াতে। সূরা আন্‌কাবুত ৩৬ নম্বর আয়াতে।

হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালাম মাদ্‌ইয়ানে নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। মাদ্‌ইয়ান মূলতঃ কোন স্থানের নাম নয়; বরং একটি গোত্রের নাম। এই গোত্রের নামানুসারেই তাদের বস্তিটির নাম মাদ্‌ইয়ান বলে বিখ্যাত হয়েছিল। এই গোত্রটি হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর পুত্র মাদ্‌ইয়ানের বংশ হতে উদ্ভূত। হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর তৃতীয় স্ত্রী কাতুরার গর্ভে মাদ্‌ইয়ানের জন্ম হয়। ইহাতে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর এই খানদান বনিকাতুরা নামে অভিহিত হয়।

"মাদ্‌ইয়ান তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিজনসহ নিজের বৈমাত্রেয় ভাই হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর পার্শ্বেই হেজাযে বসবাস করতো। এই খানদানই পরবর্তীকালে একটি বিরাট গোত্র বা গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করেছিল। আর শুআইব আলায়হিস্ সালাম-ও যেহেতু এই খানদান এবং এই গোত্র হতেই ছিলেন। সুতরাং তাঁর নবীরূপে প্রেরিত হওয়ার পর হতে এই গোত্রটি "কাওমে শুআইব" নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

এই গোত্রটি কোন্ স্থানে বসবাস করতো? এ সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক বলেন, এরা হেজাযে প্রদেশে শামের সাথে সংমিলিত এমন এক স্থানে বসবাস করতো যার পরিধি আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মরুভূমির পরিধি বরাবর অবস্থিত। আবার কেউ কেউ বলেন, শামের সাথে মিলিত 'মআন' নামক ভূখণ্ডে বসবাস করতো।

কোরআন মজীদ এই গোত্রের বাসভূমি সম্পর্কে দুইটি কথা জানিয়ে দিয়েছে, তারা ইমামে মুবিনের ওপর বসবাস করতো। যেমন কোরআন মজীদে উল্লেখ আছে ওয়া ইন্নাহুমা লাবি ইমামিম মুবিন অর্থাৎ, "লূত আলায়হিস্ সালাম-এর জাতি ও মাদ্‌ইয়ান-এর জাতি এক বিরাট রাজ সড়কের পার্শ্বে বসবাস করতো।"

আরব দেশের ভূগোলে যে রাজপথটি হেজাযের ব্যবসায়ী কফেলাগুলোকে শাম, ফিলিস্তান, ইয়ামান বরং মিশর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং লোহিত সাগরের পূর্ব তীর দিয়ে চলে যেত। কোরআন মজীদ সেই পথটিকেই 'ইমামে মুবীন, অর্থাৎ, মুক্ত ও পরিষ্কার রাজপথ হিসেবে বর্ণনা করেছে। কেননা, গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল উভয় মৌসুমেই কোরঈশ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী কাফেলাগুলোর জন্য এই পথটি বিখ্যাত ও বিরাট

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বাণিজ্য পথ ছিল। যার পরম্পরা স্থলভাগের সীমার সাথে জল ভাগের সীমা রেখাকেও সংযুক্ত করে দেয়। তারা 'আছহাবে আইকাহ্' (ঝোপ ঝাড়ের অধিবাসী) বলেও অভিহিত হতো। আরবী ভাষায় 'আইকাহ্' সবুজ বরণ ঝোপ ঝাড়কে বলা হয় যা সবুজ ও সতেজ বৃক্ষ-লতার প্রাচুর্যের দরুন বন-জঙ্গলে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং ঝোপের আকৃতি ধারণ করে।

এই দুইটি কথা জেনে নেয়ার পর মাদ্ইয়ানের গোত্রের বসতির সন্ধান সহজেই জানা যেতে পারে। তা হলো মাদ্ইয়ানের গোত্রটি লোহিত সাগরের পুর্ব তীরে এবং আরব দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন জায়গায় বসবাস করতো যা শামদেশের সাথে সংযুক্ত হেজাযের শেষাংশ বলা যেতে পারে। আর হেজাযবাসীরা শাম, ফিলিস্তান বরং মিসর পর্যন্ত যাতায়াতকালে 'আছহাবে মাদ্ইয়ানের' বস্তির ধ্বংসাবশেষগুলো পথে পড়তো যা তাবুকের বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল।

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মত পোষণ করেন 'আছহাবে মাদ্ইয়ান' এবং আছহাবে আইকাহ্' একই গোত্রের দুইটি নাম না এরা দুইটি পৃথক পৃথক গোত্র? কারও মতে এরা দুইটি পৃথক পৃথক গোত্র। মাদ্ইয়ান ছিল একটি সভ্য ও শহরী গোত্র। আর আছহাবে আইকাহ্ ছিল গ্রাম এবং যাযাবর গোত্র যারা বনে জঙ্গলে বাস করতো। এই কারণে তাদেরকে 'আছহাবে আইকাহ্' অর্থাৎ বন-জঙ্গলের অধিবাসী বলা হয়েছে। এই মতাবলম্বী তফসীরকারদের মতে 'ইন্নাহুমা লাবি ইমামিম মুবিন' আয়াতে 'হুমা' দ্বিবচনের সর্বনামটির লক্ষ্যস্থলে এই দুইটি গোত্র অর্থাৎ মাদ্য়িয়ান এবং আছহাবে আইকাই উদ্দেশ্য; মাদ্ইয়ান এবং লূত জাতির নয়।

আর অন্যান্য তফসীরকারগণ গোত্র দুইটিকে একই গোত্র সাব্যস্ত করে বলেন যে, জলবায়ুর পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা এবং নদী নালার প্রাচুর্য এই স্থানটিকে এতই সরস ও মনোমুগ্ধকর করে দিয়েছিল এবং এখানে ফল, মেওয়া ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলের মত বাগ-বাগিচা ছিল যে, যদি কেউ বস্তির বাইরে দাঁড়িয়ে এর দৃশ্য অবলোকন করতো, তবে তার বোধ হতো এটা যেন অতি সুন্দর ও সরস ঘন বৃক্ষরাজির একটি ঝোপ, এই কারণেই কোরআন মজীদ এই স্থানকে আইকাহ্ বলে পরিচয় দিয়েছে।

এই তফসীরকারগণের মধ্যে হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর-এর ধারনা এই যে, এই বস্তিতে 'আইকাহ্' নামে একটি বৃক্ষ ছিল। গোত্রের লোকেরা যেহেতু উক্ত বৃক্ষের পূজা করতো; এই সম্পর্কের কারণে মাদ্ইয়ান গোত্রকেই আছহাবে আইকাহ্ বলা হয়েছে। এতদ্ভিন্ন এই সম্বন্ধটি যেহেতু বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না; বরং ধর্ম সংক্রান্ত সম্বন্ধ ছিল সুতরাং যে সমস্ত আয়াতে তাদেরকে এই উপাধির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে সে সমস্ত আয়াতে হযরত শুআইব আলায়হিস্ সালাম-কে আখু হুম অর্থাৎ, তাদের ভাই অথবা এই জাতীয় কোন বংশগত সম্পর্কের সাথে উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য যে সমস্ত আয়াতে শুআইব আলায়হিস্ সালাম-এর জাতিকে 'মাদ্ইয়ান' বলা হয়েছে। তাতে হযরত শুআইবকেও বংশগত সম্পর্কের সাথে আখু হুম অর্থাৎ, তাদের ভাই বলা হয়েছে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পক্ষান্তরে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত এই যে, মাদ্‌ইয়ান এবং আছহাবে আইকাহ্ একই গোত্র। যাদেরকে পৈত্রিক সম্পর্কের কারণে মাদ্‌ইয়ান বলা হয়েছে এবং বসত ভূমির স্বাভাবিক এবং ভৌগোলিক অবস্থান হিসেবে 'আছহাবে আইকাহ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এ সম্পর্কে তাফহিমূল কোরআনের বর্ণনা হলো, আইকাবাসী হযরত শো'আয়েবের আলায়হিস্ সালাম সম্প্রদায়ের লোক। এ সম্প্রদায়টির নাম ছিল বনী মাদ্‌ইয়ান। তাদের এলাকার কেন্দ্রীয় শহরেরও নাম ছিল মাদ্‌ইয়ান এবং সমগ্র এলাকাটিকেও মাদ্‌ইয়ান বলা হতো। আর "আইকা" ছিল তাবুকের প্রাচীন নাম। এ শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঘন জংগল। বর্তমানে একটি পাহাড়ী ঝরণার নাম আইকা। এটি জাবালে নূরে উৎপন্ন হয়ে আফাল উপত্যাকায় এসে পড়েছে।

মাদ্‌য়ান ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা জাতি অথবা একটি জাতির দু'টি পৃথক নাম, এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল মনে করেন, তারা দু'টি পৃথক জাতি। এজন্য তাদের সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, সূরা আ'রাফে হযরত শো'আইবকে মাদ্‌ইয়ানবাসীদের ভাই বলা হয়েছে ওয়া ইলা মাদইয়ানা আখাহুম শুআইবা। আর এখানে আইকাবাসীদের উল্লেখ করতে গিয়ে মুধুমাত্র বলা হয়েছে ইয ক্বালা লাহুম শুআইব (যখন শু'আইব তাদেরকে বললো)। এখানে তাদের ভাই অর্থাৎ আখুহুম শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাস্‌সির উভয়কে একই জাতি গণ্য করেছেন। কারণ সূরা আ'রাফ ও সূরা হূদে মাদ্‌ইয়ানবাসীদের যেসব রোগ ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এখানে আইকাবাসীদের সে একই রোগ ও গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। হযরত শো'আইবের দাওয়াত ও উপদেশও একই এবং শেষে তাদের পরিণতির মধ্যেও কোন ব্যবধান নেই।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, এ দু'টি উক্তি মূলতঃ সঠিক। সন্দেহাতীতভাবে মাদ্‌ইয়ানবাসী ও আইকাবাসীরা দু'টি আলাদা গোত্র। কিন্তু মূলত তারা একই বংশধারার দু'টি পৃথক শাখা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী বা দাসী কাতুরার গর্ভজাত সন্তানরা আরব ও ইসরাঈলী ইতিহাসে বনী কাতুরা নামে পরিচিত। এদের একটি গোত্র সবচেয়ে বেশী খ্যাতি লাভ করে। মাদ্‌ইয়ান ইবনে ইবরাহীমের বংশোদ্ভূত হবার ফলে তাদেরকে মাদইয়ানী বা মাদ্‌ইয়ান বাসী বলা হয়। এদের বসতি উত্তর হেজায থেকে ফিলিস্তীনের দক্ষিন পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সিনাই বদ্বীপের শেষ কিনারা পর্যন্ত লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূল এলাকায় বিস্তৃত হয়। এর কেন্দ্রস্থল ছিল মাদ্‌ইয়ান শহর। আবুল ফিদার মতে এটি আকাবা উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে আইলা (বর্তমান আকাবা) থেকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। বনী কাতুরার অন্যান্য গোত্রের মধ্যে বনী দীদান Dedanties তুলনামূলকভাবে বেশি পরিচিত। উত্তর আরবে তাইমা, তাবুক ও আল'উলার মাঝামাঝি স্থানে তারা বসতি গড়ে। তাদের কেন্দ্রীয় স্থান ছিল তাবুক। প্রাচীনকালে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

একে আইকা বলা হতো। (মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে ইয়াকূত আইকা শব্দের আলোচনায় বলেছেন, এটি তাবুকের পুরাতন নাম এবং তাবুকবাসীদের মধ্যে একথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, এ স্থানটিই এক সময় আইকা নামে পরিচিত ছিল।)

মাদইয়ানবাসী ও আইকাবাসীদের জন্য একজন রসূল পাঠাবার কারণ সম্ভবত এছিল যে, তারা একই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত ছিল, একই ভাষায় কথা বলতো এবং তাদের এলাকাও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ছিল। বরং বিচিত্র নয়, কোন কোন এলাকায় তাদের বসতি একই সংগে গড়ে উঠেছিল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়ে সমাজে তারা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বনী কাতুরার এ দু'শাখার লোকদের পেশাও ছিল ব্যবসা। তাদের মধ্যে একই ধরনের ব্যবসায়িক অসততা এবং ধর্মীয় ও চারিত্রিক দোষ পাওয়া যেতো। বাইবেলের প্রথম দিকের পুস্তকগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় এ আলোচনা পাওয়া যায় যে, এরা বা'লে ফুগূরের পূজা করতো। বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়ে এদের এলাকায় আসে তখন তাদের মধ্যেও এরা শির্ক ও ব্যভিচারের রোগ ছড়িয়ে দেয়। (গণনা পুস্তক ২৫ঃ ১-৫ এবং ৩১ ঃ ১৬-১৭)

তাছাড়া দু'টি বড় বড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথের ওপর এদের বসতি গড়ে উঠেছিল। এ দু'টি পথ ইয়ামন থেকে সিরিয়া এবং পারস্য উপসাগর থেকে মিসরের দিকে চলে গিয়েছিল। এ দু'টি রাজপথের ধারে বসতি হবার কারণে এদের লূটতরাজ ও রাহাজানির কারবার ছিল অত্যন্ত রমরমা। অন্যসব জাতির বাণিজ্য কাফেলাকে বিপুল পরিমাণ কর না দিয়ে তারা এ এলাকা অতিক্রম করতে দিতো না। নিজেরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথ দখল করে রাখার ফলে পথের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে রেখেছিল। কোরআন মজীদে তাদের এ অবস্থানকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইন্নাহুমা লাবি ইমামিম মুবিন অর্থাৎ এ জাতি দু'টি (লূতের জাতি ও আইকাবাসী) প্রকাশ্য রাজপথের ওপর বসবাস করতো।" এদের রাহাজানির কথা সূরা আ'রাফে এভাবে বলা হয়েছে, "আর প্রত্যেক পথের ওপর লোকদেরকে ভয় দেখাবার জন্য বসে যেয়ো না।" এ সমস্ত কারণে আল্লাহ এ উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই নবী পাঠিছিলেন এবং তাদেরকে একই ধরনের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

হযরত মুসার ইতিহাসের পটভূমি
আলায়হিস্ সালাম

পবিত্র কোরআন মজীদ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ইতিহাসে বনিইসরাঈলের আলোচনা শুধু এতটুকু করেছে, হযরত ইয়াকূব আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর পরিবার পরিজন হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে মিলিত হবার জন্য মিশরে এসেছিলেন। কিন্তু এর কয়েক শতাব্দী পরে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনায় পুনরায় একবার কোরআন মজীদ বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছে। এতে করে বুঝা যায় বনী ইসরাঈলীগণ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর যুগে মিশরেই তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। অতীতের এই কয়েক শতাব্দীতে তাদের যাবতীয় ইতিহাস মিশরের সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তাওরাতের বিবরণগুলো এ কথারই পোষকতা করছে। তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে, ফেরআউন ইউসুফ আলায়হিস্ সালামকে বললো, তোমার পিতা ও ভাইয়েরা তোমার কাছে এসেছে। মিশরের ভূমি তোমার সম্মুখে, তোমার পিতা ও ভাইদেরকে এই দেশের কোন একস্থানে, যা সর্বাপেক্ষা উত্তম হয়, বসবাস করতে দাও। আরামদায়ক ভূমিতে তাদেরকে থাকতে দাও। আর যদি তুমি তাদের মধ্য হতে কাকেও চতুর মনে করো, তবে তাকে আমার গবাদি পশুগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করো।

আর ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নিজের পিতা ও ভাইদেরকে মিশরের এক উত্তম ভূখণ্ডে যারা রাআ'মসীস নামে অভিহিত, ফেরাআউনের নির্দেশ অনুযায়ী বসবাস করতে দিলেন এবং তাদেরকে সে এলাকার অধিকারী করে দিলেন আর ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নিজের পিতা ও ভাইদেরকে এবং পিতার গোটা বংশধরদেরকে, তাদের সন্তানদেরকে খাদ্য সরবরাহ পূর্বক প্রতিপালন করেছেন।

আর ইসরাঈল (ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম) মিশর দেশে আরাম দায়ক অঞ্চলে বসবাস করেছেন। সেখানে তিনি প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। কালে তা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তিনি মিশরে সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। অতএব, ইয়াকূব আলায়হিস্ সালাম-এর পূর্ণ বয়স হয়েছিল ১৪৭ বছর।

তাওরাতে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নিজের পিতা ও ভাইদের জন্য 'জাশান' ভূখণ্ডটি চাইলে ফেরআউন সানন্দে সেটা তাকে দান করলেন। মিশরের মানচিত্রে এই স্থানটি বিল্‌বীসের উত্তর দিকে অবস্থিত। এই অঞ্চলের একটি বর্তমানকালীন শহর 'ফাকূসাহ্ বা সেক্‌তুল হান্নাহ্ নামে পরিচিত।

হযরত ইউসুফের ঘটনায় আমরা বলে এসেছি যে, শহরী বসতি হতে দূরে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নিজ বংশের জন্য এই স্থানটি খুব সম্ভব এই উদ্দেশ্যে মনোনীত করেছিলেন যে, এখানে থেকে তাঁর বংশের গ্রামীন জীবন পূর্বের ন্যায়ই বহাল থাকবে। আর এই কারণে মিশরে মর্তিপূজকরা তাদের সংস্রবে যেতে পারবে না এবং তাদের মুশ্‌রেকী রীতিনীতি ও অসৎ স্বভাবসমূহ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। কেননা, মিশরবাসীরা রাখাল, কৃষক এবং গ্রামীন শ্রেণীর লোকদেরকে নীচ ও অচ্ছুত মনে করতো এবং তাদের সাথে মেলামেশা করা দূষণীয় মনে করতো।

তাওরাতে একথাও উল্লেখ আছে, হযরত ইযাকূব আলায়হিস্ সালাম-এর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি হযরত ইউসুফকে ডেকে ওছিয়ত করলেন, আমাকে মিশরের মাটিতে যেন দাফন না করা হয়; বরং পূর্বপুরুষের দেশ ফিলিস্তিনে যেন দাফন করা হয়। হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম পিতাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত করে দিলেন এবং ইন্তেকালের পরে তাঁর পবিত্র দেহ মমি করে সিন্দুকে ভরে রাখলেন এবং পরে ফিলিস্তিনে নিয়ে সমাহিত করলেন।

বাইবেলে হযরত ইয়াকুব আলায়হিস্ সালাম-এর ইন্তেকালের সময়ের অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বটে কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে হযরত ইয়াকুবের গুরুত্ব পূর্ণ উপদেশসমূহ উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু তালমুদে তা এভাবে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইয়াকূব আলায়হিস্ সালাম ইন্তেকালের পূর্বে অধিকাংশ বংশধরকে একত্রিত করলেন এবং ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তান আফ্রাঈম এবং মুন্নাসীকেও ডাকলেন। তারপর প্রথমে সবার জন্য বরকতের দোআ করলেন এবং মহব্বত ও স্নেহের সাথে তাদেরকে পরিতুষ্ট করলেন। তৎপর তাদেরকে উপদেশ দান করলেন যে, "দেখো, আমার পরে নিজেদের ঈমান ও আক্বীদাকে কখনও খারাপ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলার সেই পবিত্র সম্পর্ককে, যা আমি এবং আমার পিতা ও আমার পিতমহ সর্বদা সুদৃঢ় ও মজবুত রেখেছি, মুশ্‌রেকী প্রথা ও রীতিনীতির মিশ্রণে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিও না।"

কোরআন মজীদও ইয়াকূব আলায়হিস্ সালাম-এর এই পবিত্র ও গুরুত্ব পূর্ণ উপদেশসমূহ অলৌকিকভাবে প্রকাশ করেছে। মহান আল্লাহ বিষয়টা এভাবে পেশ করেছেনঃ-

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ-قَالُوْ نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَاۤئِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا-وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (بكرة)

ইয়াকুব যখন এই পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করছিল তখন কি তোমরা সেখানে উপস্থিত ছিলে? ইন্তেকালের সময় সে তাঁর সন্তানদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিল, হে সন্তানগণ! আমার ইন্তেকালের পরে তোমরা কার দাসত্ব করবে? তারা সবাই সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই দাসত্ব করবো, যাকে আপনি ও আপনার পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন এবং আমরা তাঁরই অনুগত (মুসলিম) হয়ে থাকবো। (সূরায়ে বাকারাহ, আয়াত নম্বর ১৩৩)

তালমুদ হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ইন্তেকালের অবস্থাবলীর উপরও আলোকপাত করেছে। তাঁর বয়স এবং তাঁর বংশ সম্পর্কে আলোচনা করেছে। সে আলোচনার কিছু অংশ আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

'আর ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর পিতার গোটা পরিবারের লোকেরা মিশরে বসবাস করেছেন এবং ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ১১০ বছর জীবিত ছিলেন। আর ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম নিজ পুত্র আফ্রাঈমের সন্তানদেরকে দেখেছেন যারা তৃতীয় পুরুষের ছিল। আর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুন্নাসীর পুত্র মাকীরের পুত্রও ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এর কোলে-কাঁধে প্রতিপালিত হয়েছে। অর্থাৎ ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর প্রপৌত্রকেও দেখেছেন। ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম তাঁর ভাইদেরকে বললেন, আমার মৃত্যু সন্নিকটে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তোমাদেরকে স্মরণ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

করবেন এবং তোমাদেরকে এই দেশ হতে বের করে সেই দেশের দিকে নিয়ে যাবেন যার সম্পর্কে তিনি হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব আলায়হিস্ সালামকে সুদৃঢ় ওয়াদা দান করেছেন।' 'আর ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম বনী ইসরাঈলগণ হতে শপথ গ্রহণ করে বললেনঃ আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে স্মরণ করবেন, তোমরা আমার হাড়গুলোকে এখান হতে সাথে করে নিয়ে যাবে। তারপর ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম একশত দশ বৎসরের বৃদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করলেন। বনী ইসরাঈলরা তাঁর মৃত দেহের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য পূর্ণ করে সেটাকে মিশরে একটি সিন্দুকে ভরে রাখলেন আর মূসা আলায়হিস্ সালাম ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম এর হাড়গুলো সঙ্গে নিয়ে মিশর হতে বের হলেন। কেননা, ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম বনী ইসরাঈলকে দৃঢ় শপথ দিয়ে বলেছিলেন যে, নিশ্চয়, আল্লাহ্ তোমাদের সংবাদ গ্রহণ করবেন, তোমরা এখান হতে আমার হাড়গুলো সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'তাঁর উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ওছিয়ত অনুযায়ী তাঁর বংশধররা তাঁর পবিত্র দেহকেও মমি করে সিন্দুকে সংরক্ষিত করে রাখলেন। মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর যমানায় বনী ইসরাঈল মিশর হতে প্রত্যাগমণের সময় ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ওছিয়ত পালন করার জন্য তাঁর দেহ সংরক্ষিত সেই সিন্দুকটিও সঙ্গে নিয়ে গেল এবং নবীদের দেশে নিয়ে দাফন করলো-এই স্থানটি কোথায়? এসম্বন্ধে জাবরূন-বাসীরা বলে, তিনি জাবরূনে সমাহিত রয়েছেন। এবং তারা হরমে খলিলিতে মাক্ফীলার কাছে একটি রক্ষিত সিন্দুক সম্পর্কে এই দাবী করে যে, এটা ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর তাবূত। কিন্তু আবদুল ওয়াহ্হাব মিশরী বলেন, এটা তাদের একটি কল্পনা মাত্র।

তিনি বলেন, ফাযেল মোহাম্মদ 'নমের হাসান নাবলেসী' এবং নাবালেসের বিখ্যাত আলেম হযরত ফাযেল আমীন বেগ আবদুল হাদী আমাকে বলেছেন, হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর কবর মোবারক নাবেলসে রয়েছে এবং এটাই সঠিক। কেননা, তালমুদ বলে, হযরত ইউসুফের তাবূত 'ফারাঈম' নামক স্থানেই সমাহিত হয়েছে। ফারাঈম নামক ভূখণ্ডে নাবেল্স একটি বিখ্যাত শহর। প্রাচীন কালে এই এলাকাকে 'শাকীম' বলা হতো। মোট কথা এ সমস্ত বিবরণ হতে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বনী ইসরাঈল হযরত ইউসুফ আলায়হিস্ সালাম ও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর মধ্যবর্তী কালে মিশরেই বসবাস করতো। আধুনিক গবেষকগণও বনী ইসরাঈলদের ওপরে গবেষণা করে স্থির সিদ্ধান্ত দান করেছেন যে, সুদূর অতীতে বনী ইসরাঈলীগণ মিশরেই বসবাস করতো এবং এক সময় তারা মিশরে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। তারপর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কারণে তাদেরকে মিশর ত্যাগ করতে হয়েছিল।

শিশু মুসার লালন-পালন

আলায়হিস্ সালাম

হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করবেন আর সাথে সাথে তাকে সাগরে ভাসিয়ে দিতে হবে–এই ধরনের কোন চিন্তাধারা হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম-এর

ahlussunnah-bd.blogspot.com

মায়ের মনে আল্লাহ সৃষ্টি করে দেননি। তাঁর মনে এই চিন্তাধারা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত ভয়ের কোন কারণ দেখা না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শিশুকে দুধপান করাতে হবে। তারপর এই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, এ কথা যখন গোপন থাকবে না এবং আশংকা দেখা দেবে যে, শিশুর আওয়াজ শুনে বা অন্য কোনভাবে শত্রুরা তাঁর জন্মের কথা জানতে পারবে অথবা খোদ বনী ইসরাঈলীদের কোন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি গোয়েন্দাগিরী করবে, তখন নির্ভয়ে ও নিশংকচিত্তে একটা বাক্সের ভিতরে রেখে শিশুকে সাগরে ভাসিয়ে দিতে হবে।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম জন্মগ্রহণ করার পরে তিনমাস তাঁর মা বিষয়টা গোপন রেখেছিলেন। তালমুদ বর্ণনা করেছে যে, ফিরআউন সে সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল। তারা ছোট ছোট শিশুকে সাথে করে নিয়ে ইসরাঈলী পরিবারে বেড়াতে গিয়ে নিজেদের শিশুকে যে কোনভাবেই হোক কাঁদাতো। ইসরাঈলীরা যদি কোন শিশুকে লূকিয়ে রাখতো তাহলে সে শিশু এই গোয়েন্দা নারীর শিশুর কাঁন্না শুনে কেঁদে উঠতো।

এই নতুন ধরনের গোয়েন্দাগিরীর ব্যবস্থায় হযরত মুসার মা'কে বিচলিত করেছিল। তিনি নিজের সন্তানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য তার জন্মের তিনমাস পরে সাগরে ভাসিয়ে দেন। এই কাহিনীর সাথে এ পর্যন্ত এসে কোরআনের বর্ণনার সাথে বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা প্রায় মিলে যায়। কোরআনে সূরা ত্বা-হা-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিশুকে একটা সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও।

আর বাইবেল ও তালমুদে বলা হচ্ছে, হযরত মুসার মা নলখগড়ার একটা ঝুড়ি বানিয়ে তার গায়ে তৈলাক্ত মাটি ও আলকাতরা লেপন করে সেটাকে পানি হতে সংরক্ষিত রাখে। তারপর হযরত মুসাকে তার ভেতরে শায়িত করে নীল নদের বুকে ভাসিয়ে দেয়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় যে কথা, তা বাইবেল ও তালমুদে উল্লেখ করা হয়নি। সে কথা হলো, মহান আল্লাহ হযরত মুসার মা'কে ইশারা দান করেছিলেন, তুমি এভাবে কাজ করলে তোমার সন্তানের কোন ভয়ের আশংকা থাকবে না, তাকে পুনরায় তুমি তোমার বুকেই ফিরে পাবে এবং তোমার এই শিশু একদিন নবী রাসুলের মর্যাদা লাভ করবে। এই কথাগুলো বাইবেল বা তালমুদে ইশারা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করা হয়নি।

মহান আল্লাহ বলেন, এই শিশুটিকে তারা তো উঠিয়ে নিল প্রকৃত পক্ষে তারা এই শিশুকে উঠলো না, ফিরআউনের পরিবার ফিরআউনের ধ্বংসের বীজ তখন হতেই বপন করলো। তারা যখন সেই শিশুটিকে সাগর হতে উঠিয়ে নিয়ে রাজ প্রাসাদে নিয়ে গেল এবং ফিরআইনের স্ত্রী সেই শিশু সম্পর্কে যে কথাবার্তা বলেছিল, তা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কথাবর্তা হতে যে চিত্র ভেসে ওঠে তাহলো, ফিরআউনের প্রাসাদ ছিল সাগরের ধারে অথবা সে সময়ে ফিরআউন তার স্ত্রীকে নিয়ে সাগরের ধারে ভ্রমণ করছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সিন্দুক বা ঝুড়ি সাগরে ভাসতে ভাসতে যখন ফিরআউনের প্রাসাদের কাছে চলে আসে তখন তারা তা দেখতে পেয়ে কৌতূহলী হয়ে ওঠে এবং সেটা উঠিয়ে আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। রাজপরিবারের দাস-দাসীরা আদেশ পেয়ে সিন্দুক উঠিয়ে বাদশাহ ও তার বেগমের সামনে প্রদর্শন করে। সিন্দুক বা ঝুড়ির ভেতরে একটা শিশু রাখা আছে দেখতে পেয়ে এ ধারণা করা স্বাভাবিক যে, এই শিশু অবশ্যই কোন ইসরাঈলী সন্তান হবে। কারণ ইসরাঈলী জনবসতীর দিক হতেই সেটা ভেসে আসছিল এবং সে সময়ে ইসরাঈলী পুত্র সন্তানদেরকে হত্যার আদেশ জারী করা হয়েছিল।

সুতরাং ইসরাঈলীদের সম্পর্কেই এই ধারণা করা যেতে পারে যে, এই সন্তান তাদেরই কোন পরিবারের এবং এ সন্তানকে তারা গোপনে কিছুদিন লালন-পালন করেছে, তারপর যখন তারা বুঝেছে যে, শিশুর বিষয়টা আর গোপন রাখা যাবে না, তখন এ আশায় তাকে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কারো চোখ এটা পড়বে এবং তারা এটাকে উঠিয়ে এর ভেতরে শিশু দেখতে পাবে। দয়াবশত কেউ হয়ত এই শিশুকে গ্রহণ করবে এবং শিশু প্রাণে বেঁচে যাবে। এই ধারণা ফিরআউন এবং তার দাস-দাসীরা যে করেনি তা নয়। করেছিল বলেই তারা ফিরআউনকে বলেছিল, এই শিশু ইসরাঈলীদের সন্তান। সুতরাং একে এই মুহূর্তে হত্যা করা উচিত।

কিন্তু ফিরআউনের স্ত্রী ছিল একজন সৎ স্বভাব সম্পন্না নারী। নারী হিসেবে তাঁর ভেতরে মাতৃত্বের ক্ষুধা ছিল প্রবল। যে বয়সে সে নারী তখন পদার্পন করেছিল তবুও সে মাতৃত্ব লাভ করেনি। একটা সন্তানের জন্য তাঁর বুকের ভেতরে ছিল হাহাকার আর শুন্যতা। মা ডাক শোনার জন্য তাঁর হৃদয়-মন ছিল বড় ব্যাকুল। একটা শিশুর কলকাকলীতে তাঁর কোল ভরে উঠবে এটা ছিল তাঁর দিনরাতের স্বপ্ন। এই অবস্থায় একটা চাঁদের মতই ফুটফুটে শিশু দেখে তাঁর ভেতরে মাতৃত্বের ক্ষুধা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

সূরা ত্ব-হা-এ উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামকে বলেছিলেন, আমি আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করে দিয়েছিলাম।

অর্থাৎ তোমাকে এমন প্রিয় দর্শন ও মনোমুগ্ধকর চেহারা দান করেছিলাম যে, দর্শনকারীরা স্বতস্ফূর্তভাবে তোমাকে পরম মমতায় কোলে উঠিয়ে নিত। এ কারণেই ফিরআউনের স্ত্রী বলে ওঠেন যে, এই শিশুকে হত্যা করো না। বরং একে নিয়ে আমরা প্রতিপালন করি। সে যখন আমাদের এখানে প্রতিপালিত হবে এবং আমরা তাকে নিজের পুত্র করে নেবো তখন সে যে ইসরাঈলী এই শিশু বড় হয়ে জানবে কেমন করে ? সে নিজেকে আমাদের ফিরআউনের বংশেরই একজন মনে করবে এবং তাঁর যাবতীয় যোগ্যতা শক্তি সামর্থ আমাদের পক্ষে কাজে লাগাবে।

বাইবেল ও তালমুদের বর্ণনা অনুযায়ী যে ভদ্রমহিলা হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামকে লালন-পালন করা ও সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তিনি ফিরআউনের স্ত্রী নন বরং সে নারী ফিরআউনের কন্যা ছিল। কিন্তু পবিত্র কোরআন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে যে, সেই নারী ছিল ফিরআউনের স্ত্রী। আর এ কথাও অবশ্যই সত্য যে, শত শত বছর পূর্বে মুখে মুখে প্রচারিত হওয়া লোক কাহিনীর তুলনায় প্রত্যক্ষভাবে মহান আল্লাহর বর্ণিত ঘটনাই যে সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। কোরআনে বর্ণিত 'ইমরাআতু ফিরআউনা' শব্দের অর্থ যারা করেন যে, 'ফিরআউন পরিবারের কন্য' তারা অবশ্যই ভুল করেন। বরং এই আয়াতের স্পষ্ট অর্থ হলো ফিরআউনের স্ত্রী।

অনুতাপে নতশীর হযরত মূসা

আলায়হিস্ সালাম

আকস্মিকভাবেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এই পৃথিবীতে সেই ধরনের দুর্ঘটনা সর্ব প্রথম এবং সর্ব শেষ নয়। এই ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটেই চলেছে। মানুষ হাসি-তামাসা করেও অনেককে আঘাত করে। এই আঘাতের পেছনে সত্যিকার অর্থে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে না। কিন্তু সেই আঘাতের সাথে সাথেই অনেকের মৃত্যু হতে দেখা যায়। মাতা-পিতার হাতেও এভাবে অনেক সন্তান মৃত্যু বরণ করে থাকে। কিন্তু মাতা-পিতা তো সন্তানকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আঘাত করেন না। এসব হত্যাকান্ড একান্তভাবেই দুর্ঘটনার ফসল। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর হাতে যখন এমন দুর্ঘটনা ঘটে গেল তখন তিনি মহান আল্লাহ দরবারে কিভাবে নিজেকে পেশ করেছিলেন, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ-

قَالَ رَبِّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرْلِى فَغَفَرَلَه-اِنَّه هُوَا
لْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-قَالَ رَبِّ بِمَا اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ
ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ-فَاَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا خَائِفًا
يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَه بِالْاَمْسِ يَسْتَصْرِخُه-قَالَ لَه
مُوْسٰى اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ-فَلَمَّا اَنْ اَرَادَ اَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ
عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ
نَفْسًا بِالْاَمْسِ-اِنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ
وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ-وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَا

ahlussunnah-bd.blogspot.com

الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ-فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(القصص)

তারপর সে বলতে লাগলো, হে আমার রব্ব! আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেদিলেন তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান। মূসা শপথ করলো, হে আমার রব্ব! তুমি আমার প্রতি এই যে রহমত করেছো, এরপর আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।

দ্বিতীয় দিন অতি প্রত্যুষে সে ভয়ে ভয়ে এবং সর্ব দিক থেকে বিপদের আশংকা করতে করতে শহরের মধ্যে চলছিল। সহসা দেখলো কি, সেই ব্যক্তি যে গতকাল সাহায্যের জন্য তাকে ডেকে ছিল আজ আবার তাকে ডাকছে। মূসা বললো, তুমি তো দেখছি স্পষ্টতই বিভ্রান্ত। তারপর মূসা যখন শত্রু সম্প্রদায়ের লোকটিকে আক্রমন করতে চাইলো তখন সে চিৎকার করে উঠলো, হে মূসা! তুমি কি আজ আমাকে তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে ? তুমি তো দেখছি এদেশে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, সংস্কারক হতে চাও না।

এরপর এক ব্যক্তি নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো এবং বললো, হে মূসা ! নেতাদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার শুভাকাংখী। এ সংবাদ শুনতেই মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং সে দোয়া করলো, হে আমার রব্ব! আমাকে জালেমদের হাত থেকে বাঁচাও। (সূরা আল কাসাস, আয়াত নম্বর ১৬-২১)

আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও–হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর কাছে এই কথা বলেছিলেন। কোরআনে এই আয়াতে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার আরবী মূল শব্দ হচ্ছে "মাগফিরাত" এর অর্থ ক্ষমা করা ও মাফ করে দেয়া হয় আবার গোপনীয়তা রক্ষা করাও হয়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের দোয়ার অর্থ ছিল, আমার এ গোনাহ (যা তুমি জানো, আমি জেনে-বুঝে করিনি) তুমি মাফ করে দাও এবং এর ওপর আবরণ দিয়ে ঢেকে দাও, যাতে শত্রুরা জানতে না পারে।

তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেদিলেন তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান–এই কথারও দুই অর্থ এবং দু'টিই এখানে প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর এ ত্রুটি মাফ করে দেন এবং হযরত মূসার গোপনীয়তাও রক্ষা করেন। অর্থাৎ কিব্‌তী জাতির কোন ব্যক্তি এবং কিব্‌তী সরকারের কোন লোকের সে সময় তাদের আশেপাশে বা ধারে কাছে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

গমনাগমন হয়নি। ফলে তারা কেউ এ হত্যাকাণ্ড দেখেনি। এভাবে হযরত মূসার পক্ষে নির্বিঘ্নে ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ার সুযোগ ঘটে।

তুমি আমার প্রতি এই যে রহমত করেছো– অর্থাৎ আমার কাজটি যে গোপন থাকতে পেরেছে, শত্রু জাতির কোন ব্যক্তি যে আমাকে দেখতে পায়নি এবং আমার সরে যাওয়ার যে সুযোগ ঘটেছে, এই অনুগ্রহ।

এরপর আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না–হযরত মূসার এ অংগীকার অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলীর মাধ্যমে সাধিত হয়েছে। এর অর্থ কেবল এই নয় যে, আমি কোন অপরাধীর সহায়ক হবো না বরং এর অর্থ এটাও হয় যে,আমার সাহায্য-সহায়তা কখনো এমন লোকদের পক্ষে থাকবে না যারা দুনিয়ায় জুলুম ও নিপীড়ন চালায়। ইবনে জারীর এবং অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এভাবে এর একেবারে সঠিক অর্থ নিয়েছেন যে, সেই দিনই হযরত মূসা ফিরআউন ও তার সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অংগীকার করেন। আর ফেরাউনের সরকার ছিল একটি জালেম সরকার এবং সে আল্লাহর সেই যমীনে একটি অপরাধমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিল। তিনি অনুভব করেন, কোন ঈমানদার ব্যক্তি একটি জালেম সরকারের হাতিয়ারে পরিণত হতে এবং তার শক্তি ও পরাক্রম বৃদ্ধির কাজে সহায়তা করতে পারে না।

মুসলিম আলেমগণ সাধারণভাবে হযরত মূসার এ অংগীকার থেকে একথা প্রমাণ করেছেন যে, একজন মু'মিনের কোন জালেমকে সাহায্য করা থেকে পুরোপুরি দূরে থাকা উচিত। সে জালেম কোন ব্যক্তি, দল, সরকার বা রাষ্ট্র যেই হোক না কেন। প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহর কাছে এক ব্যক্তি বলে, আমার ভাই বনী উমাইয়া সরকারের অধীনে কূফার গভর্ণরের কাতিব (সচিব), বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করা তার কাজ নয়, তবে যেসব ফায়সালা করা হয় সেগুলো তার কলমের সাহায্যেই জারী হয়। এ চাকরী না করলে সে ভাতে মারা যাবে। হযরত আতা জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, তোমার ভাইয়ের নিজের কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত, রিযিকদাতা হচ্ছেন আল্লাহ।

আর একজন কাতিব আমের শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আবু আমর! আমি শুধুমাত্র হুকুমনামা লিখে তা জারী করার দায়িত্ব পালন করি মূল ফায়সালা করার দায়িত্ব আমার নয়। এ জীবিকা কি আমার জন্য বৈধ?"

তিনি জবাব দেন, "হতে পারে কোন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার ফায়সালা করা হয়েছে এবং তোমার কলম দিয়ে তা জারী হবে। হতে পারে, কোন সম্পদ অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অথবা কারো গৃহ ধ্বসানোর হুকুম দেয়া হয়েছে এবং তা তোমার কলম দিয়ে জারী হচ্ছে"। তারপর ইমাম এই আয়াতটি পাঠ করেন।

আয়াতটি শুনেই কাতিব বলে ওঠেন, 'আজকের পর থেকে আমার কলম বনী উমাইয়ার হুকুমনামা জারী হবার কাজে ব্যবহৃত হবে না।"

ইমাম বললেন, "তাহলে আল্লাহও তোমাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করবেন না।"

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আবদুর রহমান ইবনে মুসলিম যাহ্হাককে শুধুমাত্র বুখারায় গিয়ে সেখানকার লোকদের বেতন বন্টন করে দেবার কাজে পাঠাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতেও অস্বীকার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, এতে ক্ষতি কি?

তিনি বলেন, আমি জালেমদের কোন কাজেও সাহায্যকারী হতে চাই না। (রুহুল মা'আনী ৩ খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবু হানীফার একটি ঘটনা তাঁর নির্ভরযোগ্য জীবনীকারগণ আল মুওয়াফ্ফাক আল মক্কী, ইবনুল বায্যার আল কাওয়ারী, মুল্লা আলী কারী প্রমুখ সবাই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে, তারই পরামর্শক্রমে বাদশাহ মনসূরের প্রধান সেনাপতি হাসান ইবনে কাহ্তুবাহ একথা বলে নিজের পদ থেকে ইস্তেফা দেন যে, 'আজ পর্যন্ত আমি আপনার রাষ্ট্রের সমর্থনে যা কিছু করেছি এ যদি আল্লাহর পথে হয়ে থাকে তাহলে এতটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু এ যদি জুলুমের পথে হয়ে থাকে তাহলে আমার আমল নামায় আমি আর কোন অপরাধের সংখ্যা বাড়াতে চাই না।'

তুমি তো দেখছি এদেশে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, সংস্কারক হতে চাও না–অর্থাৎ তুমি ঝগড়াটে স্বভাবের বলে মনে হচ্ছে। প্রতিদিন কারো না কারো সাথে তোমার ঝগড়া হতেই থাকে। গতকাল একজনের সাথে ঝগড়া বাধিয়েছিলে, আজ আবার আর একজনের সাথে বাধিয়েছো। আসলে তুমি তো কোন কিছুর ফয়সালা করতে চাও না। এই কথাগুলো বলেছিল ঐ ইসরাঈলী ব্যক্তি, যাকে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সাহায্য করতে গিয়ে দুর্ঘটনা বশত একজন কিবতী মারা গিয়েছিল। বাইবেলের বর্ণনা এখানে কোরআন থেকে আলাদা। বাইবেল বলে, দ্বিতীয় দিনের ঝগড়া ছিল দু'জন ইসরাঈলীদের মধ্যে। কিন্তু কোরআন বলছে, এ ঝগড়াও ইসরাঈলী ও মিশরীয়ের মধ্যে ছিল। এ দ্বিতীয় বর্ণনাটিই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। কারণ প্রথম দিনের হত্যা রহস্য প্রকাশ হবার যে কথা সামনের দিকে আসছে মিশরীয় জাতির একজন লোক সে ঘটনা জানতে পারলেই তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতো। একজন ইসরাঈলী তা জানতে পারলে সে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের জাতির পালক-রাজপুত্রের এত বড় অপরাধের খবর ফিরআউনী সরকারের গোচরীভূত করবে এটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

তুমি কি আজ আমাকে তেমনিভাবে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছো যেভাবে গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে?– যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য হযরত মূসা এগিয়ে গিয়েছিলেন, এ ছিল তারই চিৎকার। তাকে ধমক দেবার পর যখন তিনি মিশরীয়টিকে মারতে উদ্যত হলেন তখন ইসরাঈলীটি মনে করলো হযরত মূসা বুঝি তাকে মারতে আসছেন। তাই সে চিৎকার করতে থাকলো এবং নিজের বোকামির জন্য গতকালের হত্যা রহস্যও প্রকাশ করে দিল।

এভাবে হত্যাকান্ডের কথা উপস্থিত মিশরীয় ব্যক্তির কানে প্রবেশ করলো যে, য হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল মূসা কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকান্ড। তৎক্ষনাত সে রাজদরবারে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে দিয়েছিল। রাজদরবারেই তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, এই হত্যাকান্ডের শাস্তি হত্যাকারীকে অবশ্যই পেতে হবে। সেখানে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর কোন শুভাকাংখী থেকে থাকবেন। তিনি যখন

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নিজের কানে শুনলেন যে, মূসাকে শাস্তি দেয়া হবে, তখন সে ছুটে এসে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে জানিয়ে দিলেন, আপনার বিরুদ্ধে এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সুতরাং আপনি এই এলাকা ত্যাগ করে এমন এলাকায় চলে যান, যেখানে এই এলাকার শাসকের আইন প্রযোজ্য নয়।

পবিত্র কোরনের এই কথাটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'এরপর এক ব্যক্তি নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এলো এবং বললো, হে মূসা! নেতাদের মধ্যে তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ চলছে। এখান থেকে বের হয়ে যাও। আমি তোমার শুভাকাংখী।' যে ব্যক্তি শুভাকাংখী হিসাবে ছুটে এসে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে এই পরার্মশ দান করেছিল, তাঁর কোন পরিচয় কোরআন হাদিস হতে জানা না গেলেও এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, লোকটি ছিল হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি অত্যন্ত বন্ধু ভাবাপন্ন এবং সৎ প্রকৃতির।

যেভাবে অলৌকিক লাঠিটি লাভ করলেন

এভাবেই হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-কে নবী নির্বাচিত করা হলো। ঘটনাটা আকস্মিক হলেও হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সেই আহ্বান শুনে ভয় পাননি, কারণ নবী ও রাসুলগণ তাদের বুদ্ধির বিকাশের পর হতেই পৃথিবীর রব্ব এবং ইলাহ সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনা করতে অভ্যস্থ, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি যে আলো দেখে আগুন মনে করে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তা আগুন ছিল না। সে আলো সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা ছিল মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিচ্ছুরিত অপার্থিব আলো।

তিনি যে আহ্বান শুনলেন, সে আহ্বান আল্লাহর পক্ষ হতে কোন ফেরেশতা করেছিল না স্বয়ং আল্লাহ তাকে আহ্বান করেছিল? কোরআনের ভাষ্য হতে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ স্বয়ং তাঁর কুদরতী ব্যবস্থার মাধ্যমে আহ্বান করেছিলেন। কোরআনের বর্ণনার ভেতেরই এ কথা স্পষ্ট। সুতরাং এ সম্পর্কে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করা ইসলাম প্রেমিকের পরিচয় নয়।

সামন্য কিছুক্ষণ পূর্বেও যিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ এবং পশুর রাখাল, আর এই মুহূর্ত হতে সেই ব্যক্তি হয়ে গেল সে সময়ের সে এলাকার সমস্ত মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং পথ প্রদর্শক। মানুষের ভেতরে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ ব্যক্তি। অসহায় দুঃখী মানুষের একমাত্র মুক্তিদাতা। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মহান আল্লাহর আহ্বান শুনে ভয় না পেয়ে নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করেছিলেন, কেননা এই আল্লাহর সন্ধানেই তিনি এত দিন ছিলেন। তিনি যাকে পেতে চান, সেই প্রেমিক আজ স্বেচ্ছায় তাকে আহ্বান করছেন–এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে ! পবিত্র কোরআনে এর পরের ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ–

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى-قَالَ هِىَ عَصَاىَ-اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا

وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى-قَالَ اَلْقِهَا

ahlussunnah-bd.blogspot.com

يٰمُوْسٰى-فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى-قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ-سَنُعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْاُوْلٰى-وَاضْمُمْ يَدَكَ اِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ اٰيَةً اُخْرٰى-لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرَى-اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى (طٰه)

আর হে মূসা! এ তোমার হাতে এটা কি?

মূসা জবাব দিল, 'এ আমার লাঠি। এর ওপর ভর দিয়ে আমি চলি, নিজের ছাগলগুলোর জন্য এর সাহায্য পাতা পাড়ি এবং এর সাহায্যে আরো অনেক কাজ করি।'

বললেন, 'একে ছুঁড়ে দাও হে মূসা!'

সে ছুঁড়ে দিল এবং অকস্মাত সেটা হয়ে গেলো একটা সাপ, যা দৌড়াচ্ছিল। বললেন, 'ধরে ফেলো ওটা এবং ভয় করো না, আমি ওকে আবার ঠিক তেমনটিই করে দেবো যেমনটি সে আগে ছিল। আর তোমার হাতটি একটু বগলের মধ্যে রাখো, তা কোন প্রকার ক্লেশ ছাড়াই উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন। এ জন্য যে, আমি তোমাকে নিজের বৃহৎ নিদর্শনগুলো দেখাবো। এখন তুমি যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।' (সূরায়ে ত্বা-হা, আয়াত নম্বর ১৭-২৪)

মহান আল্লাহর জ্ঞান লাভ করার বা জানার জন্য এ প্রশ্ন ছিল না। বরং আল্লাহ জানতেন হযরত মূসার হাতে লাঠি আছে। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য এ ছিল যে, তাঁর হাতে যে লাঠি আছে অন্য কিছু নয় এ ব্যাপারে যেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম নিশ্চিত হয়ে যান এবং এরপর দেখেন আল্লাহর কুদরতের খেলা কিভাবে শুরু হয়।

যদিও জবাবে শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, হে আল্লাহ ! এটা একটা লাঠি। কিন্তু হযরত মূসা এ প্রশ্নের যে লম্বা জবাব দিলেন তা তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি তুলে ধরেছে। সাধারণত দেখা যায়, মানুষ যখন কোন বড় ব্যক্তির সাথে বা তাঁর কাংখিত ব্যক্তির সাথে কথা বলার সুযোগ পায় তখন নিজের কথা দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে, যাতে তার সাথে বেশীক্ষণ কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করা যায়।

হাত বগলে রাখতে বললেন এবং জানিয়ে দিলেন সূর্যের আলোর মতো আলো হবে কিন্তু এর ফলে তোমার কোন কষ্ট হবে না।

বাইবেলে সাদা হাতের ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেখান থেকে আমাদের তাফসীরগুলোতেও এর প্রচলন হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা যখন বগলে হাত রেখে বাইরে বের করলেন তখন দেখা গেলো পুরো হাতটাই কুষ্ঠরোগীর হাতের মতো সাদা হয়ে গেছে। তারপর আবার যখন তা বগলে রাখলেন

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তখন আবার আগের মতো হয়ে গেছে। এ বর্ণনা গ্রহণ যোগ্য এ জন্য নয় যে, যুক্তিতে তা টেকে না।

এ মুজিযাটির এ ব্যাখ্যাই তালমুদেও বর্ণিত হয়েছে এবং এর গূঢ় তত্ত্ব বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের কুষ্ঠরোগ ছিল এবং এ রোগ সে লুকিয়ে রেখেছিল। তাই তার সামনে এ মুজিযা পেশ করে তাকে দেখানো হয়েছে যে, দেখো মুহূর্তের মধ্যে কুষ্ঠ রোগ সৃষ্টি করে মুহূর্তের মধ্যেই তা নিরাময় করা যায়। কিন্তু প্রথমত ভারসাম্যপূর্ণ রুচিশীলতা কোন নবীকে কুষ্ঠরোগের মুজিযা দিয়ে একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠিত সরকারের দরবারে পাঠানোর ব্যাপারটিই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। দ্বিতীয়ত ফেরাউনের যদি অপ্রকাশ্য কুষ্টরোগ থেকে থাকে তাহলে কুষ্টরোগীর সাদা হাত শুধুমাত্র তার একার জন্য মুজিযা হতে পারে, তার সভাসদদের ওপর এ মুজিযার কী প্রভাব পড়বে? কাজেই সঠিক কথা এটাই, যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ তাঁর হাত সূর্যালোকের মতো আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠতো এবং চোখ সেদিকে তাকিয়ে থাকতে পারতো না। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরদের অনেকেই এ অর্থ গ্রহণ করেছেন।

দীর্ঘ দিনের পরিচিত লাঠি, যা দিয়ে তিনি নিজের পশুপালকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং বৃক্ষের পাতা পেড়ে আহার করান। এই লাঠি তিনি মাটিতে ফেলে দিলেন আর সাথে সাথে তা একটা বিশাল সাপের আকার ধারণ করে সাপের মতই মোচড় দিতে থাকলো। হযরত মূসা আলায়হিস্‌ সালাম এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। পবিত্র কোরআন বলছে তিনি পেছনের দিকে এমন শক্তিতে দৌড় দিয়েছিলেন যে, পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখার মত তার সাহস ছিল না যে, তাঁর সেই লাঠিটা সাপের মতই আচরণ করছে না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছ। এই মুজিযা প্রদানের ঘটনা মহান আল্লাহ সূরা কাসাসে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ–

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ-فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا
وَّلَمْ يُعَقِّبْ-يٰمُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ-اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ-
اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ-
وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ
اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاۡئِهٖ-اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (القصص)

আর (হুকুম দেয়া হলো) ছুঁড়ে দাও তোমার লাঠিটি। যখনই মূসা দেখলো লাঠিটি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই সে পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং একবার

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ফিরেও তাকালো না। বলা হলো, 'হে মূসা! ফিরে এসো এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। তোমার হাত বগলে রাখো উজ্জল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার কষ্ট ছাড়াই। এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো। এ দু'টি উজ্জল নিদর্শন তোমার রবের পক্ষ থেকে ফিরআউন ও তার সভাসদদের সামনে পেশ করার জন্য, তারা বড়ই নাফরমান।' (সূরায়ে কাসাস, আয়াত নম্বর ৩১-৩২)

এ মু'জিযা দু'টি তখন হযরত মূসাকে দেখানোর কারণ হচ্ছে, প্রথমত যাতে তাঁর মনে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, প্রকৃতপক্ষে যে সত্তা বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থার স্রষ্টা, অধিপতি, শাসক ও পরিচালক তিনিই তাঁর সাথে কথা বলছেন। দ্বিতীয়ত এ মু'জিযাগুলো দেখে তিনি এ মর্মে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন যে, তাঁকে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকার-Established Government ফেরাউনের কাছে যে ভয়াবহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হচ্ছে সেখানে তিনি একেবারে খালি হাতে তার মুখোমুখি হবেন না বরং প্রচন্ড শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে যাবেন। আর সে অস্ত্র কোন মানুষের দান করা বা বানানো নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তির অধিকারী মহান আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা এই অস্ত্র।

এবং ভীতিমুক্ত হবার জন্য নিজের হাত দু'টি চেপে ধরো-অর্থাৎ যে দায়িত্ব তোমাকে প্রদান করা হলো, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যখন কোন ভয়াবহ মুহূর্ত এসে উপস্থিত হবে, যার ফলে তোমার মনে ভীতির সঞ্চার হয় তখন নিজের বাহু চেপে ধরো। এর ফলে তোমার মন শক্তিশালী হবে এবং ভীতি ও আশংকার কোন রেশই তোমার মধ্যে থাকবে না।

বাহু বা হাত বলতে সম্ভবত ডান হাত বুঝানো হয়েছে। কারণ সাধারণভাবে হাত বললে ডান হাতই বুঝানো হয়। চেপে ধরা দু'রকম হতে পারে। এক, হাত পার্শ্বদেশের সাথে লাগিয়ে চাপ দেয়া। দুই, এক হাতকে অন্য হাতের বগলের মধ্যে রেখে চাপ দেয়া। এখানে প্রথম অবস্থাটি প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মনের ভয় দূর করার জন্য কোন বিশেষ কাজ করছে।

হযরত মূসাকে যেহেতু একটি জালেম সরকারের মোকাবিলা করার জন্য কোন সৈন্য সামন্ত ও পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই পাঠানো হচ্ছিলো তাই তাঁকে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়। বারবার এমন ভয়ানক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল যাতে একজন মহান দৃঢ়চেতা নবীও আতংকমুক্ত থাকতে পারতেন না। মহান আল্লাহ বলেন, এ ধরনের কোন অবস্থা দেখা দিলে তুমি স্রেফ এ কাজটি করো, ফিরআউন তার সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করেও তোমার মনের জোর শিথিল করতে পারবে না।

এ নিদর্শনগুলো নিয়ে ফেরাউনের কাছে যাও এবং আল্লাহর রাসূল হিসেবে নিজেকে পেশ করে তাকে ও তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসকবৃন্দকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আনুগত্য ও দাসত্বের দিকে আহবান জানাও। তাই এখানে তাঁর নিযুক্তির বিষয়টি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত বলা হয়নি। তবে কোরআনের অন্যান্য স্থানে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ত্বা-হা ও সূরা নাযি'আতে বলা হয়েছে,

ahlussunnah-bd.blogspot.com

'ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।' সূরা আশ্ শূ'আরায় বলা হয়েছে, 'যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, যাও জালেম জাতির কাছে, ফেরাউনের জাতির কাছে।' মহান আল্লাহ বলেনঃ-

وَاِذْنَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ-قَوْمَ فِرْعَوْنَ-اَلَا يَتَّقُوْنَ (الشعراء)

তাদেরকে সে সময়ের কথা শুনাও যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বলেছিলেন, "জালেম সম্প্রদায়ের কাছে যাও-ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কাছে-তারা কি ভয় করে না? (সূরায়ে আশ্ শুআরা, আয়াত নম্বর ১০-১১)

এ বর্ণনাভংগী ফেরাউনের সম্প্রদায়ের চরম নির্যাতনের কথা প্রকাশ করছে। "জালেম সম্প্রদায়" হিসেবে তাদেরকে পরিচিত করানো হচ্ছে। যেন তাদের আসল নামই হচ্ছে জালেম সম্প্রদায় এবং ফেরাউনের সম্প্রদায় হচ্ছে তার তরজমা ও ব্যাখ্যা।

অর্থাৎ হে মূসা! দেখো কেমন অদ্ভুত ব্যাপার, এরা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করে দুনিয়ায় জুলুম-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং ওপরে আল্লাহ আছেন, তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এ ভয় তাদের নেই। জানা যায় যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে একাকী যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত তাঁর মধ্যে এ অনুভূতি ছিল, তিনি বাকপটু নন এবং অনর্গল ও দ্রুত কথা বলার ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি হযরত হারুনকে সাহায্যকারী হিসেবে নবী বানিয়ে তার সাথে পাঠাবার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন জানান। কারণ হযরত হারুণ অত্যন্ত বাকপটু, প্রয়োজনে তিনি হযরত মূসাকে সমর্থন দেবেন এবং তাঁর বক্তব্যকে সত্য প্রমাণ করে তাঁর হাত শক্তিশালী করবেন।

হতে পারে, প্রথম দিকে হযরত মূসা তাঁর পরিবর্তে হযরত হারুনকে এ দায়িত্বে নিযুক্ত করার আবেদন জানান, কিন্তু পরে যখন তিনি অনুভব করেন আল্লাহ তাঁকেই নিযুক্ত করতে চান তখন আবার তাঁকে নিজের সহায্যকারী করার আবেদন জানান। এ সন্দেহ হবার কারণ হচ্ছে, হযরত মূসা এখানে তাঁকে সাহায্যকারী করার আবেদন জানাচ্ছেন না বরং বলছেন, 'আপনি হারুনের কাছে রিসালাত পাঠান।' আর সূরা ত্বা-হা-এ আবেদন জানান, 'আমার জন্য আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন, আমার ভাই হারুনকে।'

এ ছাড়া সূরা কাসাসে তিনি আবেদন জানান, 'আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, কাজেই আপনি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সত্যতা প্রমাণ করে।'

এ থেকে মনে হয়, সম্ভবত এই পরবর্তী আবেদন দু'টি পরে করা হয়েছিল এবং এ সূরায় হযরত মূসা থেকে যে কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটিই ছিল প্রথম কথা।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বাইবেলের বর্ণনা এ থেকে ভিন্ন। বাইবেল বলছে, ফেরাউনের জাতি তাকে মিথ্যুক বলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ ভয় এবং নিজের কণ্ঠের জড়তার ওজর পেশ করে হযরত মূসা এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পুরোপুরি অস্বীকারই করে দিয়েছিলেন, 'হে প্রভু, বিনয় করি, অন্য যার হাতে পাঠাইতে চাও, এ বার্তা পাঠাও।' তারপর আল্লাহ নিজেই হযরত হারুনকে তাঁর জন্য সাহায্যকারী নিযুক্ত করে তাঁকে এ মর্মে রাজী করান যে, তাঁরা দু'ভাই মিলে ফেরাউনের কাছে যাবেন। (যাত্রা পুস্তক ৩ ঃ ১ - ১৭)

এই আয়াতে শুধু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে ফেরআউনের যাবার আদেশের কথা বলা হয়েছিল, এ কথা শুনানোর উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এই আয়াত অবতীর্ণ করেননি। এই আয়াতের মাধ্যমে সে যুগের ইসলাম বিরোধী এবং বর্তমান যুগ হতে যারা কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের বিরোধিতা করবে সেই ইসলাম বিরোধিদেরকে শিক্ষা দান করাই মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য।

প্রথমত হযরত মূসাকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব অবস্থার মুখোমুখি ছিলেন তার তুলনায় ছিল অনেক বেশী কঠিন। হযরত মূসা ছিলেন একটি দাস জাতির সদস্য। ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় এ জাতিকে মারাত্মকভাবে দাবিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন কুরাইশ সম্প্রদায়ের সদস্য। তাঁর বংশ ও পরিবার কুরাইশদের অন্যান্য বংশ ও পরিবারের সাথে পুরোপুরি সমান মর্যাদায় অবস্থান করছিল। হযরত মূসা নিজেই সেই ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং একটি হত্যা অভিযোগে দশ বছর ফেরাউনের গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং একটা হত্যা অভিযোগে দশ বছর আত্মগোপন করে থাকার পর তাঁকে আবার সেই বাদশাহর দরবারে গিয়ে দাঁড়াবার হুকুম দেয়া হয়েছিল, যার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কোন নাজুক অবস্থার মুখোমুখি হননি। তাছাড়া ফেরাউনের সাম্রাজ্য ছিল সে সময় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সাম্রাজ্য। তার সাথে কুরাইশদের শক্তির কোন তুলনাই ছিল না। এ সত্ত্বেও ফিরআউন হযরত মূসার কোন ক্ষতিই করতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে সংঘর্ষ বাধিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে আল্লাহ কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের এ শিক্ষা দিতে চান যে, আল্লাহ যার পৃষ্ঠপোষক থাকেন তার সাথে মোকাবিলা করে কেউ জিততে পারে না। ফিরআউনই যখন মূসার মোকাবিলায় কিছুই করতে পারেনি তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোকাবিলায় তোমাদের জয় লাভের কথা কল্পনাই করা যায় না।

দ্বিতীয় হযরত মূসার মাধ্যমে ফিরআউনকে যেসব নিদর্শন দেখানো হয়েছে তার চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কী হতে পারে? তারপর হাজার হাজার লোকের সমাবেশে ফেরাউনেরই চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে যাদুকরদের সাথে মোকাবিলা করে একথা প্রমাণও করে দেয়া হয়েছে যে, হযরত মূসা যা কিছু দেখাচ্ছেন তা যাদু নয়। যেসব যাদুশিল্প বিশেষজ্ঞগণ ফেরাউনের নিজের সম্প্রদায়ের

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সাথে সম্পৃক্ত ছিল এবং যাদেরকে ফিরআউন নিজেই ডেকেছিল, তারা নিজেরাই এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছে যে, হযরত মূসার লাঠি যে অজগরে পরিণত হয়েছিল, সে ব্যাপারটি ছিল যথার্থ ও অকৃত্রিম এবং শুধুমাত্র আল্লাহর মু'জিযা, যাদু নয়। কিন্তু এ ব্যাপারেও যারা হঠকারিতায় লিপ্ত ছিল তারা নবীর সত্যতা স্বীকার করেনি। এখন তোমরা কেমন করে এ কথা বলতে পারো যে, তোমাদের ঈমান না আসলে কোন ইন্দ্রিয়ানুভূত মু'জিযা ও বস্তুগত নিদর্শন দেখার ওপর নির্ভরশীল? জাতীয় ও বংশগত স্বার্থ, জাহেলী বিদ্বেষ ও স্বার্থ পূজার উর্ধে উঠে মানুষ খোলা মনে হক ও বাতিলের পার্থক্য অনুধাবন করে অসত্য কথা পরিহার করে সত্য ও সঠিক কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলে এ কিতাবে, এ কিতাব উপস্থাপনকারীর জীবনে এবং আল্লাহর বিশাল বিশ্ব-জগতে প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সর্বক্ষণ যেসব নিদর্শন দেখতে পারে তাই তার জন্য যথেষ্ট হয়। নয়তো এমন একজন হঠকারী ব্যক্তি যে সত্যের সন্ধান করে না এবং প্রবৃত্তির স্বার্থ পূজায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যে তার স্বার্থে আঘাত লাগে এমন কোন সত্য গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, সে যতই নিদর্শন দেখুক না কেন তার সামনে আকাশ ও পৃথিবী উল্টে দিলেও সে ঈমান আনবে না।

তৃতীয়ত এ হঠকারিতার যে পরিণাম ফিরআউন দেখেছে তা এমন কোন পরিণাম নয় যা দেখার জন্য অন্য লোকেরা পাগল হয়ে গেছে। নিজের চোখে আল্লাহর শক্তি মত্তার নিদর্শন দেখে নেবার পর যে তা মানে না সে এমনি ধরনের পরিণতিরই সম্মুখীন হয়। এখন তোমরা কি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পরিবর্তে এর স্বাদ আস্বাদন করা পছন্দ করছো? হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর ঘটনা সূরা নাম্‌ল-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

يٰمُوْسٰى اِنَّهٗ اَنَا الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-وَاَلْقِ عَصَاكَ-فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ-يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ-اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ-اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ-فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ-اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

হে মূসা! এ আর কিছু নয়, স্বয়ং আমি আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও জ্ঞান এবং তুমি তোমার লাঠিটি একটু ছুঁড়ে দাও। যখনই মূসা দেখলো লাঠি সাপের মতো মোচড় খাচ্ছে তখনই পেছন ফিরে ছুটতে লাগলো এবং পেছন দিকে ফিরেও দেখলো না। হে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

মূসা! ভয় পেয়ো না, আমার সামনে রাসূলরা ভয় পায় না। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভুল-ত্রুটি করে বসে। তারপর যদি সে দুষ্কৃতির পরে সুকৃতি দিয়ে (নিজের কাজ) পরিবর্তিত করে নেয় তাহলে আমি ক্ষমাশীল ও করুণাময়। আর তোমার হাতটি একটু তোমার বক্ষস্থলের মধ্যে ঢুকাও তো, তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে কোন প্রকার ক্ষতি ছাড়াই। এ (দু'টি নিদর্শন) ন'টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত ফিরআউন ও তার জাতির কাছে (নিয়ে যাবার জন্য) তারা বড়ই বদকার। (সূরায়ে নাম্‌ল, আয়াত নম্বর ৯-১২)

সূরা আ'রাফ ও সুরা শু'আরাতে আরবী 'ছা'আবান' অর্থাৎ অজগর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একে আরবী 'জান' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। 'জান' শব্দটি বলা হয় ছোট সাপ অর্থে। এখানে 'জান' শব্দ ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, দৈহিক দিক দিয়ে সাপটি ছিল অজগর কিন্তু তার চলার দ্রুততা ছিল ছোট সাপদের মতো। সূরা তা-হা-য় আরবী 'হাইয়াতুন তাছআ' শব্দ অর্থাৎ ছুটন্ত সাপ বর্ণনা করা হয়েছে।

হে মূসা! ভয় পেয়ো না–অর্থাৎ আমার কাছে রাসূলদের ক্ষতি হবার কোন ভয় নেই। রিসালাতের মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য যখন আমি কাউকে নিজের কাছে ডেকে আনি তখন আমি নিজেই তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে থাকি। তাই যে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলেও রাসূলকে নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত থাকা উচিত। আমি তার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিকারক হবো না।

তবে হ্যাঁ, যদি কেউ ভুল-ত্রুটি করে বসে–এ কথাগুলো আরবী ভাষায় বলা হয়েছে। আরবী ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে এ বাক্যাংশের দু'রকম অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ হলো, ভয়ের কোন যুক্তি সংগত কারণ যদি থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, রাসূল কোন ভুল করেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, যতক্ষণ কেউ ভুল না করে ততক্ষণ আমার কাছে তার কোন ভয় নেই।

এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, অপরাধকারীও যদি তাওবা করে নিজের নীতি সংশোধন করে নেয় এবং খারাপ কাজের জায়গায় ভালো কাজ করতে থাকে, তাহলে আমার কাছে তার জন্য উপেক্ষা ও ক্ষমা করার দরজা খোলাই আছে। প্রসংগক্রমে একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে সতর্ক করা এবং অন্যদিকে সুসংবাদ দেয়াও। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অজ্ঞতাবশত একজন কিবতীকে হত্যা করে মিশর থেকে বের হয়েছিলেন। এটি ছিল একটি ত্রুটি। এদিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়। এ ত্রুটিটি যখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তখন তিনি পরক্ষণেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন এই বলে, হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমাকে মাফ করে দাও।

আল্লাহ সংগে সংগেই তাঁকে মাফ করে দিয়েছিলেন। এখানে সেই ক্ষমার সুসংবাদ তাঁকে দেয়া হয়। অর্থাৎ এ ভাষনের মর্ম যেন এই দাড়ালো, হে মূসা! আমার সামনে তোমার ভয় পাওয়ার একটি কারণ তো অবশ্যই ছিল। কারণ তুমি একটি ভুল

ahlussunnah-bd.blogspot.com

করেছিলে। কিন্তু তুমি যখন সেই দুষ্কৃতিকে সুকৃতিতে পরিবর্তিত করেছো। তখন আমার কাছে তোমার জন্য মাগফিরাত ও রহমত ছাড়া আর কিছুই নেই। এখন আমি তোমাকে কোন শাস্তি দেবার জন্য ডেকে পাঠাইনি বরং বড় বড় মু'জিযা সহকারে তোমাকে এখন আমি একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদনে পাঠাবো।

উল্লেখিত আয়াতে ন'টি নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে মূসাকে আমি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় এমন ধরনের নয়টি নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সূরা আ'রাফে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১. লাঠি, যা অজগর হয়ে যেতো
২. হাত, যা বগলে রেখে বের করে আনলে সুর্যের মতো ঝিকমিক করতো।
৩. যাদুকরদের প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরাজিত করা।
৪. হযরত মূসার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া।
৫. বন্যা ও ঝড়।
৬. পংগপাল।
৭. সমস্ত শস্য গুদামে শস্যকীট এবং মানুষ-পশু নির্বেশেষে সবার গায়ে উকুন।
৮. ব্যাংয়ের আধিক্য।
৯. রক্ত।

আমি মুসার প্রভুকে দেখতে চাই

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর মুখে মহান আল্লাহর রবুবিয়াত অর্থাৎ প্রভুত্ব সম্পর্কে শুনে ফেরাউন ধারণা করেছিল, মহান আল্লাহ বোধহয় আকাশের দিকে শুন্যমার্গে কোথাও অবস্থান করেন। সেই প্রাচীন কাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত একশ্রেণীর মূর্খ লোকদের মধ্যে এই অমূলক ধারণা প্রচলিত আছে যে, আল্লাহ বোধহয় আকাশে অবস্থান করেন। সেটাই আল্লাহর বাসস্থান। এই ধরণের মূর্খতা প্রসূত কথা-বার্তা বর্তমানে একশ্রেণীর লোক-যারা নিজেদেরকে শিক্ষিত বলে দাবী করে, তাদের মুখেও শোনা যায়।

এ ধারণা অত্যন্ত মারাত্মক। এ ধরণের ধারণা যারা পোষণ করবে, নিশ্চিতভাবে তারা আল্লাহর দরবারে গ্রেফতার হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর কথা শুনে মহান আল্লাহ সম্পর্কে ফেরাউন কি ধরণের উপহাস মূলক কথা বলেছিল, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন আমাদেরকে জানাচ্ছেঃ-

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَاهٰذَا اِلَّا سِحْرٌ
مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِيْنَ-وَقَالَ مُوْسٰى
رَبِّيْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

عَاقِبَةُ الدَّارِ-اِنَّه لَايُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ-وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰاَيُّهَا الْمَلَا مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ-فَاَوْقِدْ لِىْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّه مِنَ الْكٰذِبِيْنَ-وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُه فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَايُرْجَعُوْنَ-فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَه فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ-فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ-وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ-وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَايُنْصَرُوْنَ-وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِىْ هٰذِه الدُّنْيَا لَعْنَةً-وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ (القصص)

তারপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে পৌছুলো তখন তারা বললো, এসব বানোয়াট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ দাদার কালে কখনো শুনিনি। মূসা জবাব দিল, "আমার রব তার অবস্থা ভালো জানেন, যে তার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং কার শেষ পরিণতি ভালো হবে তাও তিনিই ভালো জানেন, আসলে জালেম কখনো সফলকাম হয় না। আর ফেরাউন বললো, "হে সভাসদবর্গ! তো আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে বলে জানি না। ওহে হামান! আমার জন্য ইট পুড়িয়ে একটি উঁচু প্রাসাদ তৈরি করো, হয়তো তাতে উঠে আমি মূসার প্রভুকে দেখতে পাবো, আমিতো তাকে মিথ্যুক মনে করি।

সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোন সত্য ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং মনে করলো তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না। শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম। এখন এ জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে দেখে নাও। তাদেরকে আমি জাহান্নামের দিকে আহবানকারী নেতা করেছিলাম এবং কিয়ামতের দিন তারা কোথাও থেকে কোন সাহায্য লাভ করতে পারবে না। এ দুনিয়ায় আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন তারা হবে বড়ই ঘৃণার্হ ও ধিকৃত। (সুরায়ে কাসাস, আয়াত নম্বর ৩৬-৪২)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এখানে মূলে বলা হয়েছে "বানোয়াট যাদু।" এ বানোয়াটকে যদি মিথ্যা অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, এ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের উজ্জ্বলা বিকীরণ করা মূল জিনিসের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন নয় বরং এটা হচ্ছে নিছক একটি লোক দেখানো প্রতারণামূলক কৌশল, একে মু'জিযা বলে এ ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিচ্ছে। আর যদি একে বানোয়াট অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, এ ব্যক্তি কোন কৌশল অবলম্বন করে এমন একটি জিনিস তৈরি করে এনেছে, যা দেখতে লাঠির মতো কিন্তু যখন সে সেটাকে ছুঁড়ে দেয় তখন সাপের মতো দেখায়। আর নিজের হাতেও সে এমন কিছু জিনিস মাখিয়ে নিয়েছে যার ফলে তা বগল থেকে বের হবার পর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ কৃত্রিম যাদু সে নিজেই তৈরি করেছে কিন্তু আমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছে এ বলে যে, এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি মু'জিযা।

আর এসব কথা তো আমরা আমাদের বাপ দাদার কালে কখনো শুনিনি–রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হযরত মূসা যেসব কথা বলেছিলেন উক্ত কথা দ্বারা সে দিকে ইংগিত করা হয়েছে। কোরআনের অন্যান্য জায়গায় এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আন-নাযি'আতে বলা হয়েছে, হযরত মূসা তাকে বলেন, 'তুমি কি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নীতি অবলম্বন করতে আগ্রহী? এবং আমি তোমাকে তোমার রবের পথের সন্ধান দিলে কি তুমি ভীত হবে?' (আন-যানি'আত -১৮-১৯)

সূরা ত্বা-হা-এ বলা হয়েছে, 'আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর যে ব্যক্তি সঠিক পথের অনুসারী হয় তার জন্য রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আমাদের প্রতি ওহী নাযির করা হয়েছে, এ মর্মে যে, শাস্তি তার জন্য যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।' আর 'আমরা তোমার রবের পয়গম্বর, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।" এ কথাগুলো সম্পর্কেই ফেরাউন বলে, আমাদের বাপ দাদারাও কখনো একথা শোনেনি যে, মিশরের ফেরাউনের উপরেও কোন কর্তৃত্বশালী সত্তা আছে, যে তাকে হুকুম করার ক্ষমতা রাখে, তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে নির্দেশ দেবার জন্য কোন লোককে তার দরবারে পাঠাতে পারে এবং যাকে ভয় করার জন্য মিশরের বাদশাহকে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। এ সম্পূর্ণ অভিনব কথা আমরা আজ এক ব্যক্তির মুখে শুনছি।

আসলে জালেম কখনো সফলকাম হয় না–অর্থাৎ তুমি আমাকে জাদুকর ও মিথ্যুক গণ্য করছো কিন্তু আমার রব আমার অবস্থা ভালো জানেন। তিনি জানেন তাঁর পক্ষ থেকে যাকে রাসূল নিযুক্ত করা হয়েছে সে কেমন লোক। পরিণামের ফায়সালা তাঁরই হাতে রয়েছে। আমি মিথ্যুক হলে আমার পরিণাম খারাপ হবে এবং তুমি মিথ্যুক হলে ভালোভাবে জেনে রাখো তোমার পরিণাম ভালো হবে না। মোট কথা জালেমের মুক্তি নেই, এ সত্য অপরিবর্তনীয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল নয় এবং মিথ্যা রাসূল সেজে নিজের কোন স্বার্থোদ্ধার করতে চায় সেও জালেম এবং সেও মুক্তি ও সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর যে ব্যক্তি নানা ধরনের মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সত্য রাসূলকে মিথ্যা বলে এবং ধোকাবাজদের সাহায্যে সত্যকে দমন করতে চায় সেও জালেম এবং সেও কখনো মুক্তি ও সাফল্য লাভ করবে না।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হে সভাসদবর্গ! তো আমি নিজেকে ছাড়া তোমাদের আর কোন প্রভু আছে বলে জানি না–এ উক্তির মাধ্যমে ফেরাউন যে বক্তব্য পেশ করেছে তার অর্থ এ ছিল না এবং এ হতেও পারতো না যে, আমিই তোমাদের এবং পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কারণ কেবলমাত্র কোন পাগলের মুখ দিয়েই এমন কথা বের হতে পারতো। অনুরূপভাবে এ অর্থ এও ছিল না এবং হতে পারতো না যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই। কারণ মিশরবাসীরা বহু দেবতার পুজা করতো এবং স্বয়ং ফেরাউনকেই যেভাবে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল তাও শুধুমাত্র এই ছিল যে, তাকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে স্বীকার করা হতো। সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোরআন মজীদ নিজেই। কোরআনে বলা হয়েছে ফেরাউন নিজে বহু দেবতার পুজারী ছিল, 'আর ফেরাউনের জাতির সরদাররা বললো, তুমি কি মূসা ও তার জাতিকে অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে দেবে যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করুক এবং তোমাকে ও তোমার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করুক?" (আল আ'রাফ ঃ ১২৭)

তাই ফেরাউন এখানে অবশ্যই "ইলাহ" শব্দটি নিজের জন্য স্রষ্টা ও উপাস্য অর্থে নয় বরং সার্বভৌম ও স্বয়ং সম্পূর্ণ শাসক এবং তাকে আনুগত্য করতে হবে, এ অর্থে ব্যবহার করেছিল। তার বলার উদ্দেশ্য ছিল, আমিই মিশরের এর যমীনের মালিক। এখানে আমারই হুকুম চলবে। আমারই আইনকে এখানে আইন বলে মেনে নিতে হবে। আমারই সত্তাকে এখানে আদেশ ও নিষেধের উৎস বলে স্বীকার করতে হবে। এখানে অন্য কেউ তার হুকুম চালাবার অধিকার রাখে না। এ মূসা কে? সে রব্বুল আলামীনের প্রতিনিধি সেজে দাঁড়িয়েছে এবং আমাকে এমনভাবে হুকুম শুনাচ্ছে যেন সে আসল শাসনকর্তা এবং আমি তার হুকুমের অধীন?

এ কারণে সে তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল, 'হে আমার জাতি! মিশরের বাদশাহী কি আমারই নয় এবং এ নদীগুলো কি আমার অধীনে প্রবাহিত নয়?' (আয্ যুখ্রুফ ঃ ৫১)

আর এ কারণেই সে বারবার হযরত মূসাকে বলছিল, 'তুমি কি এসেছো আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে যে পদ্ধতি চলে আসছে তা থেকে আমাদের সরিয়ে দিতে এবং যাতে এ দেশে তোমাদের দু'ভাইয়ের আধিপত্য ও কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়?' (ইউনুস ঃ ৭৮)

সূরা ত্বা-হা-এ বলা হয়েছে, 'হে মূসা! তুমি কি নিজের যাদুবলে আমাদের ভূখন্ড থেকে আমাদের উৎখাত করতে এসেছো?' (ত্বা-হা ঃ ৫৭)

সূরায়ে মু'মিনে বলা হয়েছে, 'আমি ভয় করছি এ ব্যক্তি তোমাদের জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তিত করে দেবে অথবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।' (আল মু'মিন ঃ ২৬)

এদিক দিয়ে চিন্তা করলে যেসব রাষ্ট্র আল্লাহর নবী প্রদত্ত শরীয়াতের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তথাকথিত রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের দাবীদার, ফেরাউনের অবস্থা তাদের থেকে ভিন্নতর ছিল না। তারা আইনের উৎস এবং আদেশ নিষেধের কর্তা হিসেবে অন্য কোন বাদশাকে মানুক অথবা জাতির ইচ্ছার আনুগত্য করুক, যতক্ষণ তারা এরূপ নীতি অবলম্বন করে চলবে যে, দেশে আল্লাহ ও

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তার রাসূলের নয় বরং আমাদের হুকুম চলবে, ততক্ষণ তাদের ও ফেরাউনের নীতি ও ভূমিকার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য থাকবে না।

এটা ভিন্ন কথা যে, অবুঝ লোকেরা একদিকে ফেরাউনকে অভিসম্পাত করতে থাকে, অন্যদিকে ফেরাউনী রীতিনীতির অনুসারী এসব শাসককে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, সে শব্দ ও পরিভাষা নয়, অর্থ ও প্রাণশক্তি দেখবে। ফেরাউন নিজের জন্য "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করেছিল এবং এরা সেই একই অর্থে "সার্বভৌমত্বের" পরিভাষা ব্যবহার করছে, এতে এমন কী পার্থক্য সৃষ্টি হয়!

বর্তমান যুগের রুশীয় কম্যুনিষ্টরা একই ধরনের মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। তারা স্পুটনিক ও লুনিকে চড়ে মহাশূন্যে উঠে দুনিয়াবাসীকে খবর দিয়েছিল, আমাদের মহাশূন্য যাত্রীরা উপরে কোথাও আল্লাহর সন্ধান পায়নি। ওদিকে এ নির্বোধটি ফেরাউনও মিনারে উঠে আল্লাহকে দেখতে চাচ্ছিল। এ থেকে জানা যায়, বিভ্রান্ত লোকদের মানসিকতা প্রায় চার হাজার বছর আগে যেমনটি ছিল আজও তেমনটিই আছে। এদিক দিয়ে তারা এক ইঞ্চি পরিমাণও উন্নতি করতে পারেনি। জানিনা কোন্ আহাম্মক তাদেরকে এ খবর দিয়েছিল যে, আল্লাহ বিশ্বাসী লোকেরা যে রব্বুল আলামীনকে মানে তিনি তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী উপরে কোথাও বসে আছেন। আর এ কুলকিনারাহীন মহাবিশ্বে কয়েক হাজার ফুট বা কয়েক লাখ মাইল উপরে উঠে যদি তারা তাঁর সাক্ষাত না পায় তাহলে যেন এ কথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, তিনি কোথাও নেই।

কোরআন এখানে এ কথা বলছে না যে, ফেরাউন সত্যিসত্যিই একটি ইমারত এ উদ্দেশ্যে বানিয়েছিল এবং তাতে উঠে আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেছিল। বরং কোরআন শুধুমাত্র তার এ উক্তি উদ্ধৃত করছে। এ থেকে আপাতত দৃষ্টে মনে হয় সে কার্যত এ বোকামি করেনি। এ কথাগুরলোর মাধ্যমে কেবলমাত্র মানুষকে বোকা বানানোই ছিল তার উদ্দেশ্য।

ফেরাউন সত্যিই বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রভূ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতো, না নিছক জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে নাস্তিক্যবাদী কথা বার্তা বলতো, তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তার উক্তিগুলো থেকে ঠিক একই ধরনের মানসিক অস্থিরতার সন্ধান পাওয়া যায় যেমন রুশ কমুন্যনিষ্টদের কথাবার্তায় পাওয়া যায়। কখনো সে আকাশে উঠে দুনিয়াবাসীকে জানাতে চাইতো, আমি উপরে সব দেখে এসেছি, মূসার আল্লাহ কোথাও নেই। আবার কখনো বলতো, 'যদি সত্যিই মূসা আল্লাহর প্রেরিত হয়ে তাকে, তাহলে কেন তার জন্য সোনার কাঁকন অবতীর্ণ হয়নি অথবা ফেরেশতারা তার আরদালী হয়ে আসেনি কেন?'

ফেরাউনের এই কথাগুলো রাশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের কথা থেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। তিনি কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করতেন আবার কখনো বারবার আল্লাহর নাম নিতেন এবং তাঁর নামে কসম খেতেন। আমাদের অনুমান, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তাঁর খলীফাদের যুগ শেষ হবার পর মিশরে কিব্‌তী জাতীয়তাবাদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বদেশ প্রীতির ভিত্তিতে দেশে রাজনৈতিক

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বিপ্লব সাধিত হয়। এ সময় নতুন নেতৃত্ব জাত্যাভিমানের আবেগে আল্লাহর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর অনুসারী ইসরাঈলী এবং মিশরীয় মুসলমানরা তাদেরকে আল্লাহকে মেনে চলার দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন। তারা মনে করলো, আল্লাহকে মেনে নিয়ে আমরা ইউসুফীয় সংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত হতে পারবো না এবং এ সংস্কৃতি জীবিত থাকলে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাবও শক্তিশালী হতে পারবে না। তারা আল্লাহকে স্বীকৃতি দেবার সাথে মুসলিম কর্তৃত্বকে অংগাংগীভাবে জড়িত মনে করছিল। তাই একটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অন্যটিকে অস্বীকার করা তাদের জন্য জরুরী ছিল, যদিও তার অস্বীকৃতি তাদের অন্তরের ভেতর থেকে বের হয়েও বের হচ্ছিল না।

সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে কোন সত্য ছাড়াই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো–অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীনই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। কিন্তু ফেরাউন এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র অংশে সামান্য একটু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে মনে করে বসলো এখানে একমাত্র তারাই শ্রেষ্ঠ এবং তাদেরই সর্বময় কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিরাজিত।

মনে করলো তাদের কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না–অর্থাৎ তারা নিজেদের ব্যাপারে মনে করলো তাদেরকে কোথাও জিজ্ঞাসিত হতে হবে না। আর তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না মনে করে তারা স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ করতে লাগলো।

শেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সাগরে নিক্ষেপ করলাম–এই কথাগুলোর মাধমে মহান আল্লাহ তাদের মিথ্যা অহমিকার মোকাবিলায় তাদের নিকৃষ্টতা ও হীনতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা নিজেদেরকে অনেক বড় কিছু মনে করে বসেছিল। কিন্তু সঠিক পথে আসার জন্য আল্লাহ তাদেরকে যে অবকাশ দিয়েছিলেন তা যখন খতম হয়ে গেলো তখন তদেরকে এমনভাবে সাগরে নিক্ষেপ করা হলো যেমন খড়কুটা ও ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়।

তাদেরকে আমি জাহান্নামের দিকে আহবানকারী নেতা করেছিলাম–অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তারা একটি দৃষ্টান্ত কায়েম করে গেছে। জুলুম কিভাবে করা হয়, সত্য স্বীকার করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার ওপর কিভাবে অবিচল থাকা যায় এবং সত্যের মোকাবিলায় বাতিলের জন্য লোকেরা কেমন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, এসব তারা করে দেখিয়ে দিয়ে গেছে। দুনিয়াবাসীকে এসব পথ দেখিয়ে দিয়ে তারা জাহান্নামের দিকে এগিয়ে গেছে। এখন তাদের উত্তরসূরীরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে সেই মনযিলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে।

মূলে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন তারা "মাকবূহীন'দের অন্তরভুক্ত হবে। এই মাকবূহীন শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তারা হবে প্রত্যাখ্যাত ও বহিষ্কৃত। আল্লাহর রহমত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত হবে। তাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় করে দেয়া হবে। তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কোরআনে ফিরআউনের বর্ণনা প্রসঙ্গে হামানের নাম এসেছে। এই হামানের নাম উল্লেখ থাকার কারণে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদরা বেশ ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলেছে, হামান তো ছিল ইরানের বাদশাহ আখসোবীরাস অর্থাৎ খাশিয়ারশার দরবারের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। আর এই বাদশাহের শাসনকাল ছিল হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্মের কয়েক শত বছর পরের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৪৬৫ ও ৪৮৬ সালেই শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোরআন এই হামানকে মিশরে নিয়ে গিয়ে ফিরআউনের মন্ত্রী বানিয়ে দিয়েছে। এভাবেই ইউরোপের ইসলাম বিদ্বেষী পন্ডিতরা আল্লাহর কোরআন নিয়ে বিদ্রুপ করেছে। তাদের বিবেক বুদ্ধি যদি হিংসা বিদ্বেষের আবরণে আচ্ছাদিত না থাকতো, তাহলে তারা নিজেরাই এই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্ত-ভাবনা করে সঠিক সত্য উপলব্ধি করতে পারতো। আখসোবীরাসের সভাসদ হামানের পূর্বে পৃথিবীতে এই একই নামে দ্বিতীয় বা অধিক কোন ব্যক্তি ছিল কিনা এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলার মতো তাদের কাছে এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে ?

যে ফিরআউনের আলোচনা পবিত্র কোরআনে করা হয়েছে, যদি তার সমস্ত মন্ত্রী, ও রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তা এবং সভাসদদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা একেবারে নির্ভর যোগ্য সূত্রে কোন ইউরোপীয় পন্ডিত পেয়ে থাকেন, যে তালিকায় হামানের নাম নেই, তাহলে তিনি তা গোপন রেখেছেন কেন ? এখনই তা ছাপিয়ে প্রকাশ করা উচিত। কেননা কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তো তাদের কাছে এটা মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে পরিগণিত হবে। যদি তাদের ক্ষমতা থাকে তাহলে এই অস্ত্র প্রয়োগ করুক।

হযরত মুসাকে হত্যার হুমকি

আলাইহিস্ সালাম

জাদুর ভেলকি চালে ফেরাউন ব্যর্থ হবার পরে সে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল যে, তার হাত হতে কখন যেন দেশের ক্ষমতা হারিয়ে যায়। এ অবস্থায় স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী যে মাতালের মতই আচরণ করতে থাকে, ফেরাউনও সেই ধরণের আচরণ করছিল এবং পাগলের প্রলাপ বকছিল। একবার সে হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে কারাগারে আবদ্ধ করার কথা বলতো, আবার কখনো বলতো আমি তাকে হত্যা করবো। আসলে সে কোন একটা কিছুই করতে সাংঘাতিকভাবে ভয় পাচ্ছিল। কোরআনের বর্ণনা হতে বুঝা যায়ঃ-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ-اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْاَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ-وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (المؤمن)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

একদিন ফেরাউন তার সভাসদদের বললোঃ আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসকে হত্যা করবো। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দীনকে পাল্টে দেবে কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।"

মূসা বললো, যেসব অহংকারী হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান পোষন করে না, তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি। (সূরায়ে মু'মিন, আয়াত নম্বর ২৬-২৭)

এখান থেকে যে ঘটনার বর্ণনা শুরু হচ্ছে তা বনী ইসরাঈল জাতির ইতিহাসের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অথচ বনী ইসরাঈল নিজেরাই তা বিস্মৃত হয়ে বসেছে। বাইবেল এবং তালমুদে এর কোন উল্লেখ নেই এবং অন্যান্য ইসরাঈলী বর্ণনায়ও তার কোন নাম গন্ধ পর্যন্ত দেখা যায় না। ফেরাউন এবং হযরত মূসার আলাইহিস্ সালাম মধ্যকার সংঘাতের যুগে এক সময় এ ঘটনাটিও যে সংঘটিত হয়েছিলো বিশ্ববাসী কেবল কোরআন মজীদের মাধ্যমেই তা জানতে পেরেছে। ইসলাম ও কোরআনের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অন্ধ হয়ে না থাকলে যে ব্যক্তিই এ কাহিনী পাঠ করবে সে একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে, ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবানের দৃষ্টিকোণ থেকে এ কাহিনী অত্যন্ত মূল্যবান ও বিশেষ মর্যাদার দাবীদার। তাছাড়া হযরত মূসার আলাইহিস্ সালাম ব্যক্তিত্ব, তাঁর আন্দোলন ও প্রচার এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফেরাউনের নিজের সভাসদদের মধ্যে থেকে কারো সংগোপনে ঈমান গ্রহণ করা এবং মূসা আলাইহিস্ সালামকে হত্যার ব্যাপারে ফেরাউনকে উদ্যোগী হতে দেখে আত্মসংবরণ করতে না পারা বুদ্ধি-বিবেক ও যুক্তি বিরোধীও নয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার লম্বা চওড়া দাবি সত্ত্বেও গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতায় অন্ধ হয়ে কোরআনের সুস্পষ্ট সূত্রসমূহের ধামাচাপা দেয়ার প্রচেষ্টা চালায়। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামের "মূসা" নামক প্রবন্ধের লেখক এ শিরোনামের প্রবন্ধে যা লিখেছেন তা থেকেই একথা বুঝা যায়। তিনি লিখছেনঃ-

"ফেরাউনের দরবারে একজন বিশ্বাসী মূসাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, কোরআনের বর্ণিত এ কাহিনী সুস্পষ্ট নয়। আমরা কি তাহলে হাগ্‌গাদায় বর্ণিত কাহিনীর বিষয়বস্তুর সাথে এ কাহিনীর তুলনা করবো যাতে ক্ষমা সুলভ দৃষ্টিতে কাজ করার জন্য ইয়েথরো ফেরাউনের দরবারে পরামর্শ দিয়েছিলো?"

জ্ঞান গবেষণার এসব দাবিদারদের কাছে এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ যে, কোরআনের প্রতিটি বিষয়ে অবশ্যই খুঁত বের করতে হবে। কোরআনের কোন বক্তব্যের মধ্যে যদি কোন খুঁত বের করার সুযোগ না-ই পাওয়া যায় তাহলেও অন্তত এতটুকু যেন বলা যায় যে, এ কাহিনী পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। এভাবে ধীরে ধীরে পাঠকদের মনে এ সন্দেহও সৃষ্টি করে দেয়ার চেষ্টা করা যে, ইয়েথরো কর্তৃক মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্ম পূর্ব যে কাহিনী হাগ্‌গাদায় বর্ণিত হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো কোথাও থেকে তা শুনে থাকবেন এবং সেটাই এখানে এভাবে বর্ণনা করে থাকবেন। এটা হচ্ছে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার একটা বিশেষ স্টাইল যা এসব লোকেরা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ইসলাম, কোরআন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে অবলম্বন করে চলেছে।

আমাকে ছাড়ো, আমি এ মূসাকে হত্যা করবো–এ কথার দ্বারা ফেরাউন এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করছে যেন কিছু লোক তাকে বিরত রেখেছে আর সেই কারণে সে মূসা আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করছে না। তারা যদি বাধা না দিতো তাহলে বহু পূর্বেই সে তাঁকে হত্যা করে ফেলতো। অথচ প্রকৃতপক্ষে বাইরের কোন শক্তিই তাকে বাধা দিচ্ছিলো না তার মনের ভীতিই তাকে আল্লাহর রাসূলের গায়ে হাত তোলা থেকে বিরত রেখেছিলো।

আমার আশংকা হয়, সে তোমাদের দীনকে পাল্টে দেবে কিংবা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে–অর্থাৎ আমি তার পক্ষ থেকে বিপ্লবের আশংকা করছি। আর সে যদি বিপ্লব করতে নাও পারে তাহলে এতটুকু বিপদাশঙ্কা অন্তত অবশ্যই আছে যে, তার কর্ম-তৎপরতার ফলে দেশে অবশ্যই বিপর্যয় দেখা দেবে। তাই সে মৃত্যুদন্ড লাভের মতো কোন অপরাধ না করলেও শুধু দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার (Maintenance of publice order) খাতিরে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। সে ব্যক্তির ব্যক্তি সত্তা আইন শৃঙ্খলার জন্য সত্যিই বিপজ্জনক কিনা তা দেখার দরকার নেই। সে জন্য শুধু "হিজ ম্যাজেষ্টি"র সন্তুষ্টিই যথেষ্ট। মহামান্য সরকার যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে, এ লোকটি বিপজ্জনক তাহলে মেনে নিতে হবে, সে সত্যিই বিপজ্জনক এবং সে জন্য শিরোচ্ছেদের উপযুক্ত।

এই ধরনের আইনের অস্তিত্ব শুধু ফেরাউনের শাসনামলেই ছিল না। বর্তমানেও বিভিন্ন দেশে রয়েছে এবং প্রয়োজনে নতুনভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে। নিজেদের অন্যায় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কেউ যেন কোন প্রতিবাদ করতে না পারে, প্রতিপক্ষকে কারাগারে আবদ্ধ করার জন্য এ ধরণের আইনের প্রয়োজন স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর কাছে চিরকালই পছন্দের ছিল, বর্তমানেও আছে।

এই আয়াতে "দীন পাল্টে দেয়া"র অর্থও ভালভাবে বুঝে নিন, যার আশঙ্কায় ফেরাউন হয়রত মূসা আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করতে চাচ্ছিলো। এখানে দ্বীন অর্থ শাসন ব্যবস্থা। তাই ফেরাউনের কথার অর্থ হলো, 'ফেরাউন ও তার খান্দানের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে ধর্ম, রাজনীতি, সভ্যতা ও অর্থনীতির যে ব্যবস্থা মিশরে চলছিলো তা ছিল তৎকালে ঐ দেশের 'দ্বীন'।' আর ফেরাউন হযরত মূসার আন্দোলনের কারণে এ দ্বীন পাল্টে যাওয়ার আশঙ্কা করছিলো। কিন্তু প্রত্যেক যুগের কুচক্রী ও ধূরন্ধর শাসকদের মত সে-ও এ কথা বলছে না যে, আমার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। তাই আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই। বরং পরিস্থিতিকে সে এভাবে পেশ করছে যে, হে জনগণ, বিপদ আমার নয়, তোমাদের। কারণ মূসার আন্দোলন যদি সফল হয়, তাহরে তোমাদের দ্বীন বদলে যাবে। নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই। আমি তোমাদের চিন্তায় নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, আমার ক্ষমতার ছত্রছায়া থেকে বঞ্চিত হলে তোমাদের কি হবে। তাই যে জালেমের দ্বারা তোমাদের ওপর থেকে এ ছত্রছায়া উঠে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তাকে হত্যা করা প্রয়োজন। কারণ সে দেশ ও জাতি উভয়ের শত্রু।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি–এখানে দু'টি সমান সম্ভাবনা বিদ্যমান। এ দু'টি সম্ভাবনার কোনটিকেই অগ্রাধিকার দেয়ার কোন ইংগিত এখানে নেই। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে, হযরত মূসা নিজেই সে সময় দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতেই ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাকে ও তার সভাসদদের উদ্দেশ্য করে তখনই সবার সামনে প্রকাশ্যে উল্লেখিত জবাব দেন।

অপর সম্ভাবনাটি হচ্ছে ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর অনুপস্থিতিতে তার সরকারের দায়িত্বশীর লোকদের কোন মজলিসে এ কথা প্রকাশ করে এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাসকে তার এ আলোচনার খবর কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক পৌছিয়ে দেয়, আর তা শুনে তিনি তাঁর অনুসারীদের এ কথা বলেন যে, তাদের প্রত্যেকের মোকাবিলায় আমি আমার ও তোমাদের রবের আশ্রয় গ্রহণ করেছি'। এ দু'টি অবস্থার যেটিই বাস্তবে ঘটে থাকুক না কেন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর কথায় স্পষ্টত প্রকাশ পাচ্ছে যে, ফেরাউনের হুমকি তাঁর মনে সামান্যতম ভীতিও সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তার হুমকির জবাব তার মুখের ওপরেই দিয়ে দিয়েছেন। যে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কোরআন মজীদে এ ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা থেকে আপনা আপনি একথা প্রকাশ পায় যে, "হিসেবের দিন" সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে যেসব জালেমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিলো তাদের জন্যও সে একই জবাব।

হযরত মূসাকে কিতাব দান

আলাইহিস্ সালাম

واذفرقنا بكم البحر فانجينكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون–واذ وعدنا موسى اربعين ليلة ثم اتخذ تم العجا من بعده وانتم ظلمون–ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون–واذ اتينا موسى الكتب والفرقان لعلكم تهتدون–واذ قال موسى لقومه يقوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارءكم فاقتلوا انفسكم–ذلكم خير لكم عند بارءكم–فتاب عليكم

ahlussunnah-bd.blogspot.com

انه هو التواب الرحيم-واذ قلتم يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذ تكم الصعقة وانتم تنظرون- ثم بعثنكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون (البقرة)

স্মরণ করো আমি মূসাকে চল্লিশ দিন ও রাত্রির নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ডেকেছিলাম। তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলে। বস্তুত তখন তোমরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিলে। কিন্তু তারপরেও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম–এই জন্য যে, এরপর তোমরা সম্ভবত কৃতজ্ঞ হবে।

স্মরণ করো (তোমরা যখন এই জুলুম করছিলে ঠিক তখনই) আমি মূসাকে কিতাব এবং ফুরকান দান করেছি। সম্ভবত এর সাহায্যে তোমরা সহজ ও সত্য লাভ করতে পারবে। স্মরণ করো মূসা যখন (আল্লাহর এই দান নিয়ে ফিরে এলো) তাঁর জাতিকে লক্ষ্য করে বললো, হে মানুষ তোমরা বাছুরকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নিজেরদের ওপর বড় জুলুম করেছো, সুতরাং তোমরা আপন স্রষ্টার কাছে তওবা করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করো। বস্তুত এর ফলে তোমাদের জন্য তোমাদের স্রষ্টার কাছে কল্যাণ রয়েছে। তখন তোমাদের সৃষ্টি কর্তা তোমাদের তওবা কবুল করে নিলেন, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। স্মরণ করো, তোমরা মূসাকে বলেছিলে, আমরা আল্লাহকে নিজের চোখে প্রকাশ্যভাবে (তোমার সাথে কথা বলতে) দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমার কথায় আদৌও বিশ্বাস করতে পারি না। এই সময় দেখতে দেখতেই এক প্রচন্ড বজ্র এসে তোমাদের ওপর পড়লো, তোমরা প্রাণহীন হয়ে গেলে। কিন্তু পুনরায় আমি তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম। আশা ছিল এই অনুগ্রহের পরে তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। (সূরায়ে বাকারাহ, আয়াত নম্বর ৫১-৫৬)

গাভী ও গরু পূজার রোগ বনী-ইসরাঈলের প্রতিবেশী জাতিসমূহের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়েছিল। মিশর ও কিনয়ানে তার সাধারণ প্রচলন ছিল। হযরত ইসউসুফ আলাইহিস্ সালাম-এর পর বনী-ইসরাঈলের যখন চরম অধঃপতন ঘটে এবং ক্রমান্বয়ে কিব্তীদের দাসানুদাসে পরিণত হয় তখন, তাদের শাসকদের কাছ থেকেই অন্যান্য রোগ ছাড়া এই রোগটিও তাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। (বাছুর পূজার এই ঘটনা বাইবেলের নির্গমন পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে।)

আমি মূসাকে কিতাব এবং ফুরকান দান করেছি–ফোরকান এমন এক শব্দ যা সত্য আর মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারীকেই বলা হয়। অর্থাৎ হক আর বাতিলের ভেতরে পার্থক্যকারীকে ফোরকান বলা হয়। বাংলা ভাষায় একে মানদন্ড বলা যেতে পারে। এই আয়াতে ফোরকান শব্দ দিয়ে ইসলাম সম্পর্কিত এমন জ্ঞান বুদ্ধি ও বোধ শক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কিন্তু পুনরায় আমি তোমাদের পুনরুজ্জীবিত করলাম–এখানে যে ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে, এর সামান্য বিশ্লেষণ আবশ্যক। চল্লিশ দিন-রাত্রির সময় নিয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন তুর পাহাড়ে চলে গেলেন, তখন বনী-ইসরাঈলের মধ্য হতে সত্তর জন প্রতিনিধিকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা যখন মূসা আলাইহিস্ সালাম-কে কিতাব ও ফুরকান' দান করলেন, তখন তিনি তা এই প্রতিনিধিদের সামনেই দান করেছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে যে, তখন তাদের মধ্য হতে কোন দুষ্ট লোক বলতে লাগলো যে, আল্লাহ যে তোমার সাথে কথা বলেছেন, তা শুধুমাত্র তোমার মুখে শুনে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করতে পারি ? এদেরই ওপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে শাস্তি দান করা হয়।

পক্ষান্তরে বাইবেল বলছে, তারা ইসরাঈলের ঈশ্বরকে দেখেছে, তাঁর চরণতলের স্থান নীলকান্ত মণি নির্মিত শিলা স্তরের কার্যবৎ এবং নির্মলতায় সাক্ষাৎ আকাশের তুল্য ছিল। তিনি বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিদের ওপর নিজের হস্ত প্রসারিত করেননি। মোটকথা তারা ঈশ্বরকে দেখেছে এবং পানাহার করেছে। (যাত্রা পুস্তক, ২৪-অধ্যায় ১০-১১ স্তোত্র)

মহান আল্লাহ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে যখন কিতাব দান করার জন্য একান্ত নিভৃতে আহ্বান করলেন, সে সময় তিনি তাঁর সহকারী হযরত হারুণ আলাইহিস্ সালাম-এর ওপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করে গেলেন, যে দায়িত্ব তিনি স্বয়ং পালন করতেন। এ ঘটনা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছেঃ–

ووعدنا موسى ثلثين ليلة واتممنها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليلة–وقال موسى لاخيه هرون اخلفنى فى قومى واصلح ولا تتبع سبيل الفسدين–ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه–قال رب ارنى انظر اليك–قال لن ترنى ولكن انظوالى الجبل فان استقرمكا نه فسوف ترنى–فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا–فلما افاق قال سبحنك تبت اليك وانا اول المؤمنين–قال يموسى انى اصطفيتك على الناس

ahlussunnah-bd.blogspot.com

برسلتى وبكلامى-فخذ ماآتيتك وكن من الشكرين

(الاعراف)

আমি মূসাকে ত্রিশ রাত্র ও দিনের জন্য (সিনাই পর্বতের উপর) ডাকলাম। পরে আরো দশ দিন বাড়িয়ে দিলাম। এইভাবে তাঁর রব্ব-এর নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল। রওয়ানা হওয়ার সময় সে তার ভাই হারুনকে বললো, 'আমার অনুপস্থিতির সময় তুমি আমার লোকজনের উপর আমার প্রতিনিধিত্ব করবে, ভালভাবে কাজ করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের রীতিনীতি অনুসারে কাজ করবে না।'

সে যখন আমার নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌছলো এবং তার রব্ব তার সাথে কথা বললেন, তখন সে নিবেদন করলো, 'হে আল্লাহ! আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমাকে দেখবো।" তিনি বললেন, "তুমি আমাকে দেখতে পারো না। তবে হ্যাঁ, সামনের এই পাহাড়টির দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, যদি তা নিজ স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।" এইভাবে তার রব্ব পাহাড়ের উপর আলোকসম্পাৎ করলেন এবং সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন। আর মূসা চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। যখন তাঁর চেতনা ফিরে এলো, তখন বললো, 'পবিত্র তোমার সত্ত্বা হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে তওবা করছি আর সর্বপ্রথম আমিই ঈমান আনছি।" তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি সব লোকের মধ্য হতে তোমাকে নির্বাচিত করে নিয়েছি আমার নবুয়্যাত প্রদানের জন্য এবং আমার সাথে কথা বলার জন্য। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দেই, তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায় করো।' (সূরায়ে আ'রাফ, আয়াত নম্বর ১৪২-১৪৪)

মিশর হতে বেরিয়ে যাবার পরে বনী-ইসরাঈলীদের উপর হতে গোলামীর বিধি-নিষেধ যখন নিঃশেষ হয়ে গেল এবং তারা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতির মর্যাদা লাভ করলো, তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সিনাই পর্বতে আমন্ত্রিত হলেন। তাঁর কাছে বনী-ইসরাঈলীদের জন্য শরীয়াত প্রদানই এই আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল। এখানে এই পর্যায়ের প্রথম আমন্ত্রণের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এর জন্য চল্লিশ দিনের মেয়াদ ঠিক করা হয়েছিল, যেন তিনি চল্লিশ দিনের এক 'চিল্লা' পর্বত দেশে অতিবাহিত করতে পারেন এবং রোযা রেখে রাতদিন ইবাদত-বন্দেগী ও চিন্তা-গবেষণা করে এবং মন ও মগজকে একমুখী ও একনিষ্ঠ করে তাঁর প্রতি যে গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম অবতীর্ণ হবার ছিল এর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সেটা গ্রহণের জন্য পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এই নির্দেশ পালনের জন্য সিনাই পর্বতে যাবার সময় বনী-ইসরাঈলীদের যে স্থানে রেখে গিয়েছিলেন, বর্তমান মানচিত্রে তা বনী সালেহ ও সিনাই পর্বতের মাঝখানে ওয়াদী আল-শেয়খ-শেয়খ উপত্যকার যে অংশে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বনী-ইসরাঈলীরা তাঁবু স্থাপন করেছিল সেটা বর্তমান 'আর-রাহাহ' ময়দান নামে অভিহিত। উপত্যকার এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতি মতে হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালাম সেখানে সামূদদের অঞ্চল হতে হিজরত করে এসে পৌছেছিলেন। বর্তমানে তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। অপরপ্রান্তে আর একটি ছোট পাহাড় রয়েছে। সেটার নাম 'হারুন পাহাড়'। বলা হয়, হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম বনী ইসরাঈলীদের বাছুর পূজা দেখে অসন্তুষ্ট চিত্তে এখানে এসে বসেছিলেন। তৃতীয় দিকে সিনাইর উচ্চ পাহাড় অবস্থিত। এর শৃংগদেশ প্রায়ই মেঘাবৃত হয়ে থাকে; এর উচ্চতা ৭৩৫৯ ফিট। এই পর্বতের চূড়ায় আজ সেই সুরঙ্গটি জনগণের দৃশ্যস্থল হিসেবে এখনো বর্তমান রয়েছে, যেখানে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম 'চিল্লা' অর্থাৎ চল্লিশ দিনরাত্রি অতিবাহিত করেছিলেন। এর কাছে মুসলমানদের একটি মসজিদ ও খৃষ্টানদের একটি গির্জা অবস্থিত। আর পর্বতের পাদদেশে রোমান কাইজার জাষ্টিনিয়নের সময়কার একটি খানকাহ আজও পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে।

হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম যদিও হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম অপেক্ষা তিন বৎসরে বড় ছিলেন, তৎসত্ত্বেও নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর অধীন ও সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও নবী ছিলেন বটে; কিন্তু তার নবুয়্যাত স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল না। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র কাছে তাকে নিজের সহকারীরূপে পেতে চেয়েছিলেন, পরে কোরআন মজীদে এই কথা সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, তাকে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর সহকারী নির্বাচিত করা হলো।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর ওপরে কিতাব অবতীর্ণ করা হলো। কি ধরণের কিতাব দান করলেন, এ কিতাবে জীবনের কোন কোন বিভাগ সম্পর্কে আইন বিধান ছিল, এ সম্পর্কে মহন আল্লাহ বলেনঃ-

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ-فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا- سَأُوْرِيْكُمْ دَارَ الْفَسِقِيْنَ-سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ-وَإِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا-وَإِيَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً-وَإِنْ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

يَرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً-ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ-وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ-هَلْ يُجْزَوْنَ اِلاَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (الاعراف)

এরপর আমি মূসাকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ ও সর্ববিষয়ে সুস্পষ্ট হেদায়েত 'তখতি'র উপর লিখে দিলাম এবং তাকে বললাম, 'এই হেদায়েতসমূহকে মজবুত হাতে শক্ত করে ধরো এবং তোমার লোকজনকে আদেশ করো, এর উত্তম তাৎপর্য মেনে চলবে। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে ফাসিকদের ঘর দেখাবো।

আমি সেই লোকদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে দিব, যারা কোন অধিকার ব্যতীতই জমিনের বুকে বড়-মানুষি করে বেড়ায়। তারা যে নিদর্শনই দেখুক না কেন, তার প্রতি কখনই ঈমান আনবে না। সঠিক-সরল পথ তাদের সম্মুখে আনলেও তারা তা গ্রহণ করবে না। বাঁকা পথ দেখা দিলে তাকেই বরং পথরূপে গ্রহণ করে চলবে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করেছে এবং তাকে কিছুমাত্র পরোয়া করেনি। বস্তুত আমার নিদর্শনসমূহকে যে কেউই মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। লোকেরা "যেমন করবে, তেমন ফলই পাবে–হিসাব ছাড়া আর কি প্রতিফল পেতে পারে"? (সূরায়ে আ'রাফ, আয়াত নম্বর ১৪৫-১৪৭)

এরপর আমি মূসাকে জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে উপদেশ ও সর্ববিষয়ে সুস্পষ্ট হেদায়েত 'তখতি'র উপর লিখে দিলাম –বাইবেলে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, এই দুইখানা 'তখতি'ই প্রস্তরময় ছিল। এতে লিখন কার্য স্বয়ং আল্লাহ-ই সম্পন্ন করেছিলেন বলে বাইবেলে ও কোরআন উভয় গ্রন্থেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তখতির ওপর লিখন কার্য স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্বীয় কুদরাতে সম্পন্ন করেছিলেন, না কোন ফেরেশতা দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন অথবা স্বয়ং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর হাত এই কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল-তা নিশ্চয় করে বলার মত কোন উপায় বা দলীলই আমাদের হাতে নেই। তুলনামূলক পাঠের জন্য বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ৩১ অধ্যায় ১৮ স্তোত্র, ৩২ অধ্যায় ১৫ ও ১৬ স্তোত্র এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৫ অধ্যায় ৬ হতে ২২ স্তোত্র)।

এই হেদায়েতসমূহকে মজবুত হাতে শক্ত করে ধরো এবং তোমার লোকজনকে আদেশ করো, এর উত্তম তাৎপর্য মেনে চলবে–অর্থাৎ আল্লারহ আদেশ নিষেধের সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন ও সহজ সরল অর্থাৎ, যা যে কোন সাদারণ বুদ্ধির মানুষও বুঝতে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পারে-বুঝতে পারে এমন প্রতিটি ব্যক্তি, যারা আল্লাহর বিধানের সহজ-সরল শব্দগুলোতে আইনের মার-প্যাঁচ, কলা-কৌশল ও ফেৎনা-বিপর্যয়ের অবকাশ বের করে, তাদের এই সব খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাবার্তাকে যেন কেউ আল্লাহর কিতাব ও তার অনুসরণকে আল্লাহর অনুসরণ বলে মনে না করে।

শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে ফাসিকদের ঘর দেখাবো–অর্থাৎ ভবিষ্যতে তোমারা আল্লাহর দাসত্ব অমান্যকারী, ভুল পথের পথিক ও খোদাদ্রোহী জাতিগুলোর প্রাচীন ধ্বংস-চিহ্নগুলো নিজেদের চোখে দেখতে পাবে। তা দেখে এই ধরণের আজরণের পরিণাম কত ভয়াবহ হতে পারে তা তোমারা নিজেরাই জানতে ও বুঝতে পারবে।

আমি সেই লোকদের দৃষ্টি আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে দিব, যারা কোন অধিকার ব্যতীতই জমিনের বুকে বড়-মানুষি করে বেড়ায়–তোমার স্বভাব সম্মত বিধান এই যে, এই ধরণের লোকেরা কোন কঠোর শিক্ষামূলক ব্যাপার দেখেও সঠিক শিক্ষা লাভ করতে পারে না। হামবড়া ভাব বা অহংকার বলতে কোরআনের ভাষায় এমন অবস্থাকে বুঝিয়েছে যে, যখন মানুষ নিজেকে আল্লাহর দাস্তব করার মর্যাদা হতে উর্ধে মনে করে ও আল্লাহর আদেশ নিষেধের কোন পরোওয়া করে না। এরপর এমন আচরণ করতে থাকে যে, সে না আল্লাহর বান্দাহ, না আল্লাহর তার রব্ব। বড় ধরণের ভুলের ভেতরে নিমজ্জিত না থাকলে এই ধরণের মনোভাবের আর কোন অর্থ হতে পারে না। কারণ আল্লাহর জমিনে বসবাস করে কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর গোলাম না হয়ে থাকার কোন অধিকার এই পৃথিবী তাকে দেয়নি। এ কারণেই কোরআনে বলা হয়েছে, 'কোন অধিকার ব্যতীতই এই জমিনের বুকে তারা বড় মানুষি করে বেড়ায়।'

বস্তুত আমার নিদর্শনসমূহকে যে কেউই মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে–বিনষ্ট হয়ে গেল, অর্থাৎ নিষ্ফল হয়ে গেল, কোন ফল দিতে পারলো না, এর দ্বারা কোন মংগল বা কোন কল্যাণ লাভ করা গেল না। কারণ আল্লাহর কাছে মানুষের চেষ্টা ও কর্মের ফলদায়ক হওয়া সম্পূর্ণভাবে দুটো জিনিষের ওপরে নির্ভর করে। প্রথমত এই যে, সব চেষ্টা ও কর্ম কেবলমাত্র আল্লাহর নির্ধারিত আইন-বিধান অনুসারে হতে হবে। আর দ্বিতীয়ত এই যে, এই চেষ্টা ও কর্ম সাধনা ব্যাপদেশে পৃথিবীর পরিবর্তে পরকালের সাফল্যই হবে প্রধান ও চরমতম লক্ষ্য। এই দুটো শর্ত যেখানে পূরণ হবে না, সেখানে সব কাজ অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে। আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করে বরং তাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে বিদ্রোহাত্মক নীতিতে পৃথিবীতে কাজ করা হলে তা দ্বারা কেউ আল্লাহর কাছ হতে কোন ফল লাভেরই আশা করতে পারে না–সে অধিকারও যে তার থাকে না এ কথা অতি স্পষ্ট। আর এই ধরণের আশা করারও কোন কারণ থাকতে পারে না।

মহান আল্লাহর বক্তব্যের মর্মহলো, যে ব্যক্তি আমার মালিকানাধীন পৃথিবীতে আমার ইচ্ছা ও বাসনার বিপরীত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে, সে আমার কাছ হতে শাস্তি আর দন্ড লাভ ব্যতীত আর কি আশা করতে পারে ? এরপরে এই পৃথিবীকে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

অন্যায়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সমস্ত কাজ যদি কেউ এই মনোভাব নিয়ে সম্পন্ন করে যে, এই পৃথিবীর আসল ও প্রকৃত মালিক যতদিন তার এই অন্যায় দুঃসাহসকে চলতে দিবেন, ততদিন সে তা হতে পূর্ণ ফায়দা লাভের আশা বা প্রার্থনা যদি না করে তা হলে সেই পৃথিবী বা রাষ্ট্রের গদি তার দখল হতে কেড়ে নেয়ার পরিবর্তে তার সুফলের কিছু অংশই বা তাকে আমি কোন কারণে দান করবো ? মালিকানাধীন জমিনে আমার ইচ্ছা ও বাসনার সম্পূর্ণ বিপরীত কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে, সে আমার কাছ হতে শাস্তি আর দন্ড পাওয়া ব্যতীত আর কি লাভের আশা করতে পারে ?

হযরত হারুণের প্রতি বাইবেলের অপবাদ

আলাইহিস্ সালাম

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে নবী রাসুলদের প্রেরণ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাঁরা এসে মানুষকে মহান আল্লাহর গোলামী শিক্ষাদান করবেন। মানুষের নৈতিক চরিত্র উন্নত করে গড়বেন। কিন্তু এই বাইবেল স্বয়ং সেসব নবী স্বয়ং স্রষ্টার চরিত্র এমনভাবে মানুষের সামনে পেশ করেছে যে, নবী এবং খোদ স্রষ্টা হলেন চরিত্রহীন। যেমন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর জাতি বনী ইসরাঈলীদের নিয়ে গোপনে মিশর ত্যাগ করবেন, এ প্রসঙ্গে বাইবেল বলছে যে, স্রষ্টা তার নবী মূসাকে বললেন, তুমি তোমার জাতির নারী-পুরুষকে বলো, তারা যেন তাদের মিশরীয় প্রতিবেশীদের কাছ হতে মিশর ত্যাগ করার পূর্ব দিন গহনা বা সোনা দানা ধার হিসেবে গ্রহণ করে। আর এসব নিয়েই যেন তারা গোপনে মিশর ত্যাগ করে।

এভাবে অপরের জিনিষ প্রতারণা পূর্বক গ্রহণ করার শিক্ষা বাইবেল দিয়েছে এবং সেই সাথে তারা স্রষ্টা ও নবীকে প্রতারক বানিয়েছে। হযরত হারুণ আলাইহিস্ সালাম-কে তারা মূর্তির স্রষ্টা বানিয়েছে। অথচ তাকে মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর সহকারী হিসেবে মহান আল্লাহ নিয়োগই করেছিলেন, তাঁর জাতির ভেতর থেকে মূর্তি উৎখাত করার জন্য। যে সব স্থানে বাইবেল এসব ঘটনা বর্ণনা করেছে, সেসব বর্ণনা স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাইবেলের এসব মিথ্যা বর্ণনা কোরআনের কাহিনী হিসেবে মুসলিম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হীন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে এসব কাহিনী কোরআন-হাদিসের কাহিনী হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ইসলামের নামে গ্রন্থ রচনা করে তার ভেতরে এসব কাহিনী ইসলামের নামেই পরিবেশন করা হয়। বাইবেলের এসব মিথ্যা বর্ণনার মোকাবেলায় পবিত্র কোরআন প্রকৃত সত্য এভাবে বর্ণনা করেছেঃ-

وما اعجلك عن قومك يموسى-قال هم اولاء على اثرى

وعجلت اليك رب لترضى-قال فانا قد فتنا قومك من

ahlussunnah-bd.blogspot.com

بعدك واضلهم السامرى-فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا-قال يقوم الم يعد كم ربكم وعدا حسنا-افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى-قالوا ماا خلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذ فنها فكذلك القى السامرى-فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى-فنسى-افلا يرون الا يرجع اليهم قولا- ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا-ولقد قال لهم هرون من قبل يقوم انما فتنتم به-وان ربكم الرحمن فاتبعونى واطيعوا امرى-قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع الينا موسى-قال يهرون مامنعك اذ بلحيتى ولا براسى-انى خشيت ان تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى (طه)

আর কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের আগে নিয়ে এলো হে মূসা ? সে বললো, "তারা তো ব্যস আমার পেছনে এসেই যাচ্ছে। আমি দ্রুত তোমার সামনে এসে গেছি হে আমার রব! যাতে তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও।" তিনি বললেন, "ভালো কথা, তাহলে শোনো, আমি তোমার পেছনে তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।"

ভীষণ ক্রোধ ও মর্মজ্বালা নিয়ে মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো। সে বললো, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ওয়াদা করেননি? তোমাদের কি দিনগুলো দীর্ঘতর মনে হয়েছে ? অথবা তোমরা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নিজেদের রবের গযবই নিজেদের উপর আনতে চাচ্ছিলে, যে কারণে আমার সাথে ওয়াদা ভংগ করলে ?"

তারা জবাব দিল, 'আমরা স্বেচ্ছায় আপনার সাথে ওয়াদা ভংগ করিনি। ব্যাপার হলো, লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা স্রেফ সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।' তারপর এভাবে সামেরীও কিছু ছুঁড়ে ফেললো এবং তাদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি বানিয়ে নিয়ে এলো, যার মধ্য থেকে গরুর মতো আওয়াজ বের হতো। লোকেরা বলে উঠলো, 'এটাই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, মূসা একে ভুলে গিয়েছে।' তারা কি দেখছিল না যে, সে তাদের কথারও জবাব দেয় না এবং তাদের উপকার ও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতাও রাখে না ?

(মূসার আসার) আগেই হারুন তাদেরকে বলেছিল, 'হে লোকেরা! এর কারণে তোমরা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো। তোমাদের রব তো করুণাময়, কাজেই তোমরা আমার অনুসরণ করো এবং আমার কথা মেনে নাও।" কিন্তু তারা তাকে বলে দিল, "মূসার না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই পূজা করতে থাকবো।"

মূসা (তার সম্প্রদায়কে ধমকাবার পর হারুনের দিকে ফিরে) বললো, "হে হারুন! তুমি যখন দেখলে এরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন আমার পথে চলা থেকে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছিল ? তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো ?"

হারুন জবাব দিল, ! "হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না। আমার আশংকা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাইলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি।"(সূরায়ে ত্বা-হা, আয়াত নম্বর ৮৩-৯৪)

আর কোন্ জিনিসটি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের আগে নিয়ে এলো হে মূসা–এ বাক্য থেকে বুঝা যাচ্ছে, নিজ সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে হযরত মূসা আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আগ্রহের আতিশয্যে আগে চলে গিয়েছিলেন। তূরের ডান পাশের যেখানকার ওয়াদা বনী ইসরাঈলদের সাথে করা হয়েছিল সেখানে তখনো কাফেলা পৌছুতে পারেনি। ততক্ষণ হযরত মূসা একাই রওয়ানা হয়ে গিয়ে আল্লাহর সামনে হাজিরা দিলেন। এ সময় আল্লাহ ও বান্দার সাথে যা ঘটে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে সূরা আ'রাফের ১৭ রুকুতে যা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি। হযরত মূসার আল্লাহর সাক্ষাতের আবেদন জানানো এবং আল্লাহর এ কথা বলা যে, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না তারপর আল্লাহর একটি পাহাড়ের ওপর সামান্য তাজাল্লি নিক্ষেপ করে তাকে ভেঙে গুঁড়ো করে দেয়া এবং হযরত মূসার বেহুশ হয়ে পড়ে যাওয়া, আর তারপর পাথরের তখ্‌তিতে লেখা বিধান লাভ করা-এসব সেই সময়েরই ঘটনা। এখানে এ ঘটনার শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের গো-বৎস পূজার সাথে সম্পর্কিত অংশটুকুই বর্ণনা করা হচ্ছে। একটি জাতির মধ্যে মূর্তিরসূচনা কিভাবে হয় এবং আল্লাহর নবী এ ফিত্‌নাটি দেখে কেমন অস্থির হয়ে পড়েন, মক্কার কাফেরদেরকে এ কথা জানানোই এ বর্ণনার উদ্দেশ্য।

সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে–এটা ঐ ব্যক্তির নাম নয়। বরং শব্দের শেষে সম্বন্ধসূচক আরবী 'ইয়া' অক্ষর ব্যবহারের সুস্পষ্ট আলামত থেকে এ কথা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

জানা যায় যে, এটা গোত্র, বংশ বা স্থানের সাথে সম্পর্কিত কোন শব্দ। তারপর আবার কোরআন যেভাবে আস্ সামেরী বলে তার উল্লেখ করছে তা থেকে এ কথাও অনুমান করা যায় যে, সে সময় সামেরী গোত্র, বংশ বা স্থানের বহুলোক ছিল এবং তাদের এক বিশেষ ব্যক্তি ছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যে স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎস পূজার প্রচলনকারী এ সামেরী। কোরআনের এ জায়গার ব্যাখ্যার জন্য প্রকৃতপক্ষে এর চাইতে বেশী কিছু বর্ণনার দরকার নেই। কিন্তু এ জায়গায় যা বলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীরা বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরা কোরআনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আপত্তি উত্তাপন করেছেন।

তারা বলেন, (নাউযুবিল্লাহ) এটা কোরআন রচয়িতার মারাত্মক অজ্ঞতার প্রমাণ। কারণ এ ঘটনার কয়েকশ' বছর পর খৃষ্টপূর্ব ৯২৫ অব্দের কাছাকাছি সময় ইসরাঈল সম্রাজ্যের রাজধানী "সামেরীয়া" নির্মিত হয়। তারপর এরও কয়েকশ' বছর পর ইসরাঈলী ও অ-ইসরাঈলীদের সমন্বয়ে শংকর প্রজন্মের উদ্ভব হয়, যারা "সামেরী" নামে পরিচিত হয়। তাদের মতে এই সামেরীদের মধ্য অনান্য মুশরিকী বিদআতের সাথে সাথে সোনালী বাছুর পূজার রেওয়াজও ছিল এবং ইহুদীদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে নিয়ে থাকবেন, তাই তিনি একে নিয়ে হযরত মূসার যুগের সাথে জুড়ে দিয়েছেন এবং এ কাহিনী তৈরি করেছেন যে, সেখানে সোনার বাছুর পূজার প্রচলনকারী সামেরী নামে এক ব্যক্তি ছিল। এ ধরনের কথা এই ইউরোপের ইসলাম বিরোধিরা হামানের ব্যাপারেও বলেছে। কোরআন এই হামানকে ফেরাউনের মন্ত্রী হিসেবে পেশ করেছে। অন্যদিকে খৃষ্টান মিশনারী ও প্রাচ্যবিদরা তাকে ইরানের বাদশাহ আখসোয়ার্সের সভাসদ ও উমরাহ "হামান" এর সাথে মিলিয়ে দিয়ে বলেন, এটা কোরআন রচয়িতার অজ্ঞতার আর একটা প্রমাণ। সম্ভবত এ জ্ঞান ও গবেষণার দাবীদারদের ধারণা প্রাচীন যুগে এক নামের একজন লোক, একটি গোত্র অথবা একটি স্থানই হতো এবং এক নামের দু'জন লোক, গোত্র বা দু'টি স্থান হবার আদৌ কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

অথচ প্রাচীনকালের একটি অতি পরিচিত জাতি ছিল সুমেরী। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগে ইরাক ও তার আশপাশের এলাকায় এ জাতিটি বসবাস করতো। আর এ জাতির বা এর কোন শাখার লোকদেরকে মিশরে সামেরী বলা হতে পারে, এর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর এই সামেরীয়ার মূলের দিকেও নজর দিন। এরই সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতেই তো পরবর্তীকালে উত্তর ফিলিস্তীনের লোকদেরকে সামেরী বলা হতে থাকে। বাইবেলের বর্ণনা মতে ইসরাঈল রাজ্যের শাসক উমরী "সামর" (বা শেমর) নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পাহাড় কিনেছিলেন যার ওপর পরে তিনি জিনের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। যেহেতু পাহাড়ের সাবেক মালিকের নাম সামর ছিল তাই এ শহরের নাম রাখা হয় সামেরিয়া (বা শামরিয়া)। (রাজাবলী ১৬-২৪) এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, সামেরীয়ার অস্তিত্ব লাভের পূর্বে "সামর" নামক লোকের অস্তিত্ব ছিল এবং তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে তার বংশ বা গোত্রের নাম সামেরী এবং স্থানের নাম সামেরীয়া হওয়া অবশ্যই সম্ভবপর ছিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে ভালো ওয়াদা করেননি–এই আয়াতের অনুবাদ "ভালো ওয়াদা করেননি"ও হতে পারে। মূল আয়াতের যে অনুবাদ তাফহিমুল কোরআনে করা হয়েছে, তার অর্থ হচ্ছে, আজ পর্যন্ত তোমাদের রব তোমাদের সাথে যেসব কল্যাণের ওয়াদা করেছেন তার সবই তোমরা লাভ করতে থেকেছো। তোমাদের নিরাপদে মিশর থেকে বের করেছেন দাসত্ব মুক্ত করেছেন। তোমাদের শত্রুকে তছনছ করে দিয়েছেন। তোমাদের জন্য তাই মরুময় ও পার্বত্য অঞ্চলে ছায়া ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সমস্ত ভালো ভালো ওয়াদা কি পূর্ণ হয়নি? দ্বিতীয় অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদেরকে শরীয়াত ও আনুগত্যনামা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের মতে তা কি কোন কল্যাণ ও হিতসাধনের ওয়াদা ছিল না?

দ্বিতীয় অনুবাদ এও হতে পারে, 'ওয়াদা পূর্ণ হতে কি অনেক বেশি সময় লাগে যে, তোমরা অধৈর্য হয়ে পড়েছো?' প্রথম অনুবাদের অর্থ হবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা এই মাত্র যে বিরাট অনুগ্রহ করেছেন, এর পর কি অনেক বেশি সময় অতীত হয়ে গেছে যে, তোমরা তাঁকে ভুলে গেলে? তোমাদের বিপদের দিনগুলো কি সুদীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গেছে যে, তোমরা পাগলের মতো বিপথে ছুটে চলেছো? দ্বিতীয় অনুবাদের পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, পথনির্দেশনা দেবার যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হতে তো কোন প্রকার বিলম্ব হয়নি, যাকে তোমরা নিজেদের জন্য ওজর বা বাহানা হিসেবে দাঁড় করাতে পারো।

যে কারণে আমার সাথে ওয়াদা ভংগ করলে–এ কথার মানে হলো, প্রত্যেক জাতি তার নবীর সাথে যে ওয়াদা করে তার কথাই এখানে বলা হয়েছে। এ ওয়াদা হচ্ছে, তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর দেওয়া নির্দেশের ওপর অবিচল থাকা এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব না করা।

আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমরা স্রেফ সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম–যারা সামেরীর ফিতনায় জড়িয়ে পড়েছিল এটি ছিল তাদের ওজর। তাদের বক্তব্য ছিল, আমরা অলংকার ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। বাছুর তৈরি করার নিয়ত আমাদের ছিল না বা তা দিয়ে কি করা হবে তাও আমাদের জানা ছিল না। এরপর যা কিছু ঘটেছে তা আসলে এমন ব্যাপারই ছিল যে, সেগুলো দেখে আমরা স্বতস্ফূর্তভাবে শিরকে লিপ্ত হয়ে গেছি।

'লোকদের অলংকারের বোঝায় আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম' এ বাক্যের সোজা অর্থ হচ্ছে এই যে, আমাদের পুরুষ ও মেয়েরা মিশরের রীতি অনুযায়ী যেসব ভারী ভারী গহনা পরেছিল তা এ মরুচারী জীবনে আমাদের জন্য বোঝায় পরিণত হয়েছিল। এ বোঝা আর কতদিন বয়ে বেড়াবো এ চিন্তায় আমরা পেরেশান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী এ গহনাগুলো মিশর ত্যাগ করার সময় প্রত্যেক ইসরাঈলী নারী ও পুরুষ তাদের প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার হিসেবে চেয়ে নিয়েছিল। এভাবে তারা প্রত্যেক ইসরাঈলী নিজেই এ কাজে ব্রতী হয়েছিল, এ নৈতিক কর্মকাণ্ডটি শুধুমাত্র এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এ মহৎ কর্মটি আল্লাহর

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাদেকে শিখিয়েছিলেন এবং নবীকেও এ নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ নিজেই। দেখুন বাইবেলের যাত্রাপুস্তক এ ব্যাপারে কি বলেঃ

"ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, তুমি যাও ইস্রায়েলের প্রাচীনগণকে একত্র কর, তাহাদিগকে এই কথা বল, তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবে না, কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিবে; এবং তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে, এই রূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।" (৩ঃ১৩-২২)

"আর সদা প্রভু মোশিকে বলিলেন, তুমি লোকদের কর্ণগোচরে বল, আর প্রত্যেক পুরুষ আপন আপন প্রতিবাসী হইতে, ও প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসীনী হইতে রৌপ্যালংকার ও স্বর্ণালংকার চাহিয়া লউক। আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিলেন।" (১১ঃ৩৫-৩)

"আর ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে কার্য করিল; ফলে তাহারা মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যালংকার, স্বর্ণালংকার ও বস্ত্র চাহিল; আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহ পাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়রা তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।" (১২ঃ৩৫-৩৬)

অর্থাৎ বাইবেল স্বয়ং স্রষ্টাকে পরস্বার্থ অপহরণকারী বানালো, নবীকেও তাই বানালো, নবীও তার জাতিকে তাই শিক্ষা দান করলেন। বাইবেল এভাবেই তার অনুসারীদেরকে পরস্বার্থ অপহরণকারী হবার শিক্ষাদান করেছে। বাইবেলের এই শিক্ষা যে সেই খৃষ্টান এবং ইহুদী জাতি কতটা অনুসরণ করে আমরা তা তাদের জাতিয় জীবনে প্রতিফলিত দেখতে পাই। অন্যের স্বার্থ অন্যায়ভাবে অপহরণ করার জন্য তারা পারে না, এমন কোন হীন কাজ এই পৃথিবীতে নেই। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশকেই তারা কোন কোনভাবে শোষণ করে নিজেদের দেশকে উন্নত করছে।

দুঃখের বিষয় আমাদের মুফাসরিগণও কোরআনের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাইবেলের বর্ণনা চোখবন্ধ করে উদ্ধৃত করেছেন এবং তাদের এ ভুলের কারণে মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে যে, অলংকারের এ বোঝা আসলে ছিল লুটের বোঝা।

আয়াতের দ্বিতীয় অংশ "আমরা স্রেফ সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" এর অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, যখন নিজেদের গহনাপাতির বোঝা বইতে বইতে লোকেরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে গেছে তখন পারস্পরিক পরমার্শের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবে যে, সবার গহনাপাতি এক জায়গায় জমা করা হোক এবং কার সোনা ও রূপা কি পরিমাণ আছে তা লিখে নেয়া হোক, তারপর এগুলো গালিয়ে ইট ও শলাকায় পরিণত করা হোক। এভাবে জাতির সামগ্রিক মালপত্রের সাথে গাধা ও গরুর পিঠে এগুলো উঠিয়ে দেয়া যাবে। কাজেই এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের যাবতীয় অলংকার এনে অলংকারে স্তূপের ওপর নিক্ষেপ করে গিয়ে থাকবে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এখান থেকে উল্লেখিত আয়াতের শেষ ইবারত পর্যন্ত চিন্তা করলে পরিষ্কার অনুভব করা যায় যে, জাতির জবাব "ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম" পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী এ বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ নিজেই দিচ্ছেন। এ থেকে যে আসল ঘটনা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে, আসন্ন ফিত্না সম্পর্কে বেখবর হয়ে লোকেরা যার যার গহনাপাতি এনে স্তূপীকৃত করে চলেছে এবং সামেরী সাহেবও তাদের মধ্যে শামিল ছিলো। পরবর্তী পর্যায়ে অলংকার গলাবার দায়িত্ব সামেরী সাহেব নিজের কাঁধে নিয়ে নেন এবং এমন কিছু জালিয়াতি করেন যার ফলে ইট বা শলাকা তৈরি করার পরিবর্তে একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি হয়ে আসে। তার মুখ থেকে গরুর মতো হাম্বা রব বের হতো। এভাবে সামেরী জাতিকে প্রতারিত করে। তার কথা হচ্ছে, আমি তো শুধু সোনা গালাবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম কিন্তু তার মধ্য থেকে তোমাদের এ দেবতা নিজেই স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছে।

মূসার না আসা পর্যন্ত আমরা তো এরই পূজা করতে থাকবো–বাইবেল এর বিপরীত হযরত হারুনের বিরুদ্ধেএ অভিযোগ আনছে যে, বাছুর বানানো এবং তাকে উপাস্য বানানোর মহা পাপ তিনিই করেছিলেন ঃ

"পর্বত হইতে নামিতে মোশির বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া লোকেরা হারোণের নিকটে একত্র হইয়া তাহাকে কহিল, উঠুন, আমাদের অগ্রগামী হইবার জন্য আমাদের নিমিত্ত দেবতা নির্মাণ করুন, কেননা যে মোশি মিশর দেশ হইতে আমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, সেই ব্যক্তির কি হইল, তাহা আমরা জানি না। তখন হারোণ তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা আপন আপন স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণের কর্ণের সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সমস্ত লোক তাহাদের কর্ণ হইতে সুবর্ণ কুণ্ডল খুলিয়া হারোনের নিকটে আনিল। তখন তিনি তাহাদের হস্ত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া শিল্পাস্ত্রে গঠন করিলেন; এবং একটি ঢালা গো-বৎস নির্মাণ করিলেন, তখন লোকেরা বলিতে লাগিল, হে ইস্রায়েল, এ তোমার দেবতা, যিনি মিশর দেশ হইতে তোমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন। আর হারোণ তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখে এক বেদি নির্মাণ করিলেন এবং হারোণ ঘোষণা করিয়া দিলেন, বলিলেন, কল্য সদা প্রভুর উদ্দেশে উৎসব হইবে।" (যাত্রা পুস্তক ৩২ঃ১-৬)

বনী ইসরাঈলের সমাজে এ ভুল বর্ণনার খ্যাতিলাভের সম্ভাব্য কারণ এও হতে পারে যে, হয়তো সামেরীর নাম হারুনই ছিল এবং পরবর্তী লোকেরা মূর্তিপূজক হারুনকে–হারুন নবীর সাথে মিশিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আজ খৃষ্টান মিশনারী ও পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা জোর দিয়ে এ কথাই বলতে চায় যে, এখানেও কোরআন নিশ্চয়ই ভুল করেছে। তাদের পাক-পবিত্র নবী-ই বাছুরকে ইলাহ বানিয়েছিলেন এবং তাঁর গাত্রাবরণ থেকে এ দাগটি তুলে দিয়ে কোরআন একটি উপকার করেনি বরং উলটো অপরাধ করেছে। এ হচ্ছে তাদের হঠকারিতার অবস্থা। তবে তারা এটা দেখছেন না যে, এ একই অধ্যায়েই মাত্র কয়েক লাইন পরেই বাইবেল কিভাবে নিজেই নিজের ভুল বর্ণনার রহস্য ভেদ করছে।

এ অধ্যায়ের শেষ দশটি শ্লোকে বাইবেল বর্ণনা করছে যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এরপর লেবীর সন্তানদেরকে একত্র করলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর এই

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আদেশ শুনালেন যে, যারা এই শিরকের মহাপাপে লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে হত্যা করতে হবে এবং প্রত্যেক মু'মিন নিজ হাতে নিজের যেসব ভাই, সাথী ও প্রতিবেশী গো-বৎস পুজায় লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে হত্যা করবে। এভাবে সেদিন তিন হাজার লোক নিহত হলো।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত হারুনকে হত্যা না করে কেন ছেড়ে দেয়া হলো? যদি তিনিই এ অপরাধের মুল উদ্‌গাতা ও স্রষ্টা হয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে এ গণহত্যা থেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখা হলো? লেবীর সন্তানরা কি তাহলে একথা বলতো না যে, হে মূসা! আমাদের তো হুকুম দিচ্ছো নিজেদের গুনাহগার ভাই, সাথী ও প্রতিবেশীদেরকে নিজেদের হাতে হত্যা করার কিন্তু নিজের ভাইয়ের গায়ে হাত উঠাচ্ছো না কেন, অথচ আসল গোনাহগার তো সে-ই ছিল?

সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বাইবেলে আরো বলা হয়েছে, মূসা সদাপ্রভুর কাছে গিয়ে আবদেন জানান, এবার বনী ইসরাঈলের গোনাহ মাফ করে দেন, নয়তো তোমার কিতাব থেকে আমার নাম কেটে দাও। এ কথায় আল্লাহ জবাব দেন, "যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে গোনাহ করছে আমি তার নাম আমার কিতাব থেকে মুছে ফেলবো।" কিন্তু আমরা দেখছি, হযরত হারুণের নাম মুছে ফেলা হয়নি। বরং তার পরিবর্তে তাঁকে ও তাঁর সন্তান সন্ততিদেরকে বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পদ অর্থাৎ বনী লেবীর নেতৃত্ব ও বায়তুল মাকদিসের সেবায়েতের দায়িত্ব দান করা হয়। (গণণা পুস্তক ১৮ ঃ ১ -৭) বাইবেলের এ আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য কি তার নিজের পূর্ববর্তী বর্ণনার প্রতিবাদ ও কোরআনের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণ করছে না?

তুমি কি আমার হুকুম অমান্য করেছো–হুকুম বলতে এখানে পাহাড়ে যাবার সময় এবং নিজের জায়গায় হযরত হারুনকে বনী ইসরাঈলের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করার পূর্ব মুহূর্তে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তাঁকে যে হুকুম দিয়েছিলেন সে কথাই বুঝানো হয়েছে। সূরা আ'রাফে একে এভাবে বলা হয়েছে, "আর মূসা (যায়ার সময়) নিজের ভাই হারুনকে বললো, তুমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার প্রতিনিধিত্ব করো এবং দেখো, সংশোধন করবে, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করোনা। (১৪২ আয়াত)

হে আমার সহোদর ভাই! আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরে টেনো না–এ আয়াতগুলোর অনুবাদের সময় তাফহিমুল কোরআনে এ বিষয়টি সামনে রাখা হয়েছে যে, হযরত মূসা ছোট ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন বড়। অন্যদিকে হযরত হারুন বড় ভাই ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন ছোট।

আমার আশংকা ছিল, তুমি এসে বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছো এবং আমার কথা রক্ষা করোনি–হযরত হারুণের জবাবের অর্থ কখনোই এই নয় যে, জাতির ঐক্যবদ্ধ থাকা তার সঠিক পথে থাকার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং শিরকের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকা তার এমন অনৈক্যের চেয়ে ভালো যার ভিত্তি গড়ে ওঠে হক ও বাতিলের বিরোধের ওপর। কোন ব্যক্তি যদি এ আয়াতের এ অর্থ করে তাহলে সে কোরআন থেকে গোমরাহী গ্রহণ করবে। হযরত হারুনের পুরো কথাটা বুঝতে হলে এ আয়াতটিকে সূরা আ'রাফের ১৫০ আয়াতের সাথে মিলিয়ে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পড়তে হবে। সেখানে বলা হয়েছে, "হে আমার সহোদর ভাই! এ লোকেরা আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। কাজেই তুমি দুশমনদেরকে আমার প্রতি হাসবার সুযোগ দিয়ো না এবং ঐ জালেম দলের মধ্যে আমাকে গন্য করো না।'

এখন এ উভয় আয়াত একত্র করে দেখলে যথার্থ ঘটনার এ ছবি সামনে আসে যে, হযরত হারুন লোকদেরকে এ গোমরাহী থেকে রুখবার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু তাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে মহা বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাঁকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। বাধ্য হয়ে তিনি এই আশংকায় নীরব হয়ে যান যে, হযরত মূসার ফিরে আসার আগেই গৃহযুদ্ধ শুরু না হয়ে যায় এবং হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম পরে এসে এ অভিযোগ না করে বসেন যে, তোমার যখন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না তখন তুমি পরিস্থিতিকে এতদূর গড়াতে দিলে কেন ? আমার আসার অপেক্ষা করলে না কেন ? সূরা আরাফের আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও একথাই প্রতিভাত হয় যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে উভয় ভাইয়ের একদল শত্রু ছিল।

হযরত মূসা ও খিযির-এর ইতিহাস-আল্ কোরআন

আলাইহিস্ সালাম

হযরত খিযির আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে মুসলিম সমাজে নানা ধরনের ভিত্তিহীন কাহিনী চালু রয়েছে। এ সব মিথ্যা কাহিনী অবলম্বনে বেশ কিছু গ্রন্থও রচিত হয়েছে। অথচ তাঁর জটিল কাজকর্মের ব্যাপারে আল্লাহর নাজিল করা কোন শরিয়তই সমর্থন করে না। কেউ আবার বলেছেন, যে মূসার সাথে এই ঘটনা, সে মূসা আর আল্লাহর নবী মূসা আলাইহিস্ সালাম এক ব্যক্তি নন। খিযির নামটিও যে তাঁর আসল নাম নয়, হাদিস সে কথাও প্রমাণ করছে। খিযির নামে তাকে কেন সম্বোধন করা হতো হাদিসের বর্ণনা হতে তা আমরা জানতে পারবো। কোরআন এবং হাদিস নানা মিথ্যা ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। প্রচলিত কাহিনীর কোন ভিত্তি নেই। কোরআন এবং হাদিস যা বর্ণনা করেছে, তা-ই এক মাত্র সত্য। এ সম্পর্কে কোরআন ও সহীহ হাদিসের বর্ণনা আমরা নিচে পেশ করলাম।

واذ قال موسى لفته لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين
اوامضى حقبا-فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما
فاتخذ سبيله فى البحر سربا-فلما جاوزا قال لفته
اتنا غداءنا-لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا-قال ار ء
يت اذ اوينا الى الصخرة فانى نسيت الحوت-وما

ahlussunnah-bd.blogspot.com

انسنيه الا الشيطن ان اذكره-واتخذ سبيله فى البحر
عجبا-قال ذلك ما كنا نبغ-فارتدا على اثار هما
قصصا-فوجدا عبدا من عباد نا اتينه رحمة من عندنا
وعلمنه من لدنا علما-قال له موسى هل اتبعك على ان
تعلمت مما علمت رشدا-قال انك لن تستطيع معى
صبرا-وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا-قال
ستجد نى ان شاء الله صابرا ولا اعصى لك امرا-قال
فان اتبعتنى فلا تسءلنى عن شىء حتى احدث لك منه
ذكرا-فانطلقا-حتى اذا ركبا فى السفية خرقها-قال
اخر قتها لتها لتغرق اهلها-لقد جءت شياء امرا-قال
الم اقل انك لن تستطيع معى صبرا-قال لاتؤا خذنى
بما نسيت ولا ترهقنى من امرى عسرا-فانطلقا-حتى
اذا لقيا غلما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير
نفس-لقد جءت شياء نكرا-قال الم اقل لك انك لن
تستطيع معى صبرا-قال ان سالتك عن شىء بعد هافلا
تصحبنى-قد بلغت من لد نى عذرا-فانطلقا-حتى اذا
اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفو هما
فوجدا فيها جدا رايريد ان ينقض فاقامه-قال لوشءت

ahlussunnah-bd.blogspot.com

لتخذت عليه اجرا-قال هذا فراق بينى وبينك-سانبءك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا-اما السفينة فكانت لمسكين يعملون فى البحر فاردت ان اعيبها وكان وراء هم ملك ياخذ كل سفينة غصبا-واما الغلم فكان ابوه مؤمنين غخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا-فاردنا ان يبد لهما ربهما خيرا منه زكوة واقرب رحما-واما الجدار فكان لغلمين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا-فاراد ربك ان يبلغا اشد هما ويستخر جاكنز هما-رحمة من ربك-ومافعلته امرى-ذلك تاويل مالم تسطع عليه صبرا (الكهف)

(এদেরকে সেই ঘটনাটি একটু শুনিয়ে দাও যা মূসার সাথে ঘটেছিল) যখন মূসা তর খাদেমকে বলেছিল, 'দুই দরিয়ার সংগমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি ভ্রমণ শেষ করবো না, অন্যথায় আমি দীর্ঘকাল ধরে চলতেই থাকবো।' সে অনুসারে যখন তারা তাদের সংগমস্থলে পৌছে গেলো তখন নিজেদের মাছের ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে গেলো এবং সেটি বের হয়ে সুড়ংগের মতো পথ তৈরি করে দরিয়ার মধ্যে চলে গেলো। সামনে এগিয়ে যাওয়ার পর মূসা তার খাদমকে বললো, 'আমাদের নাশ্‌তা আনো, আজকের ভ্রমণে তো আমরা ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

খাদেম বললো, 'আপনি কি দেখেছেন, কি ঘটে গেছে ? যখন আমরা সেই পাথরটার পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন আমার মাছের কথা মনে ছিল না এবং শয়তান আমাকে এমন অমনোযোগী করে দিয়েছিল যে, আমি (আপনাকে) তার কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। মাছ তো অদ্ভুতভাবে বের হয়ে দরিয়ার মধ্যে চলে গেছে।' মূসা বললো, 'আমরা তো এরই খোঁজে ছিলাম।' সুতরাং তারা দু'জন নিজেদের পদরেখা অনুসরণ করে পেছনে ফিরে এলো এবং সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এক বান্দাকে পেলো, যাকে আমি নিজের অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলাম।

মূসা তাকে বললো, 'আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি, যাতে আপনাকে যে জ্ঞান শেখানো হয়েছে তা থেকে আমাকেও কিছু শেখাবেন ?' সে বললো, 'আপনি আমার সাথে সবর করতে পারবেন না। আর তাছাড়া যে ব্যাপারের আপনি কিছুই জানেন না সে ব্যাপারে আপনি সবর করবেনই বা কেমন করে।' মূসা বললো, 'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী হিসেবেই পাবেন এবং কোন ব্যাপারেই আমি আপনার হুকুম অমান্য করবো না।' সে বললো, 'আচ্ছা, যদি আপনি আমার সাথে চলেন তাহলে আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি নিজে সে সম্পর্কে আপনাকে বলি।'

অতপর তারা দু'জন রওয়ানা হলো। শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটি নৌকায় আরোহণ করলো তখন ঐ ব্যক্তি নৌকা ছিদ্র করে দিল। মূসা বললো, 'আপনি কি নৌকার সকল আরোহীকে ডুবিয়ে দেবার জন্য তাতে ছিদ্র করলেন ? এতো আপনি বড়ই মারাত্মক কাজ করলেন।' সে বললো, 'আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না ? মূসা বললো, 'ভুল ভ্রান্তির জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমার ব্যাপারে আপনি কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।'

এরপর তারা দু'জন চললো। চলতে চলতে তারা একটি বালকের দেখা পেলো এবং ঐ ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। মূসা বললো, আপনি এক নিরপরাধকে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি ? এটা তো বড়ই খারাপ কাজ করলেন।' সে বললো, 'আমি না তোমাকে বলেছিলাম, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না ? মূসা বললো, 'এরপর যদি আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে আপনি আমাকে আপনার সাথে রাখবেন না। এখন তো আমার পক্ষ থেকে আপনি ওজর পেয়ে গেছেন।'

তারপর তারা সামনের দিকে চললো। চলতে চলতে একটি জনবসতিতে প্রবেশ করলো এবং সেখানে লোকদের কাছে খাদ্য চাইলো। কিন্তু তারা তাদের দু'জনের মেহমানদারী করতে অস্বীকৃতি জানালো। সেখানে তারা একটি দেয়াল দেখলো, সেটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। সে দেয়ালটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দিল। মূসা বললো, আপনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। সে বললো, ব্যাস, তোমার ও আমার সঙ্গ শেষ হয়ে গেল। এখন আমি যে কথাগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারোনি সেগুলোর তাৎপর্য তোমাকে বলবো। সেই নৌকাটির ব্যাপার ছিল এই যে, সেটি ছিল কয়েকজন গরীব লোকের। তারা সাগরে মেহনত করে জীবিকা অর্জন করতো। আমি সেটিকে ত্রুটিযুক্ত করে দিতে চাইলাম। কারণ সামনের দিকে ছিল এমন বাদশাহের এলাকা যে প্রত্যেকটি নৌকা শক্তি প্রয়োগ করে ছিনিয়ে নিতো।

আর ঐ বালকটির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। আমাদের আশংকা হলো, এ বালক তার বিদ্রোহাত্মক আচরণ ও কুফুরীর মাধ্যমে তাদেরকে বিব্রত করবে। তাই আমরা চাইলাম তাদের রব্ব তার পরিবর্তে যেন এমন একটি

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সন্তান দেন যে চরিত্রের দিক দিয়েও তার চেয়ে ভালো হবে এবং যার কাছ থেকে সদয় আচরণও বেশী আশা করা যাবে।

এবার থাকে সেই দেয়ালের ব্যাপারটি। সেটি হচ্ছে এ শহরে অবস্থানকারী দুটি এতীম বালকের। এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য সম্পদ লুকানো আছে এবং তাদের পিতা ছিলেন একজন সৎলোক। তাই তোমার রব্ব চাইলেন এ কিশোর দু'টি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে যাক এবং তারা নিজেদের গুপ্ত ধন বের করে নিক। তোমার রবের দয়ার কারণে এটা করা হয়েছে। নিজ ক্ষমতা ও ইখতিয়ারে আমি এটা করিনি। তুমি যেসব ব্যাপারে সবর করতে পারোনি এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।' (সূরায়ে কাহাফ, আয়াত নম্বর ৬০-৮২)

এই আয়াতের এ পর্যায়ে কাফের ও মুমিন উভয় গোষ্টীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সজাগ করাই মুল উদ্দেশ্য। সেই সত্যটি হচ্ছে, দুনিয়ায় যা কিছু ঘটে মানুষের স্থুল দৃষ্টি তা থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ফলাফল গ্রহণ করে। আর আল্লাহ যে উদ্দেশ্য ও কল্যাণ সামনে রেখে কাজ করেন তা তার জানা থাকে না। মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে, জালেমরা স্ফীত হচ্ছে, উন্নতি লাভ করছে, নিরপরাধরা কষ্ট ও সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে, নাফরমানদের প্রতি অজস্রধারায় অনুগ্রহ বর্ষিত হচ্ছে, আর আল্লাহর বিধান যারা অনুসরণ করছে, নবীর প্রতি আনুগত্যশীলদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে, অসৎলোকরা আয়েশ আরামে দিন যাপন করছে এবং সৎলোকদের দূরবস্থার শেষ নেই। লোকেরা নিছক এর গুঢ় রহস্য না জানার কারণে সাধারণভাবে তাদের মনে দোদুল্যমানতা এমন কি বিভ্রান্তিও দেখা দেয়। কাফের ও জালেমরা এ থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌছে যায় যে, পৃথিবীটা একটা অরাজকতার মুল্লুক। এখানে কোন রাজা নেই। আর থাকলেও তার শাসন শৃংখলা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। এখানে যার যা ইচ্ছা করতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস বা কৈফিয়ত তলব করার কেউ নেই।

এ ধরনের ঘটনাবলী দেখে মুমিন মনমরা হয়ে পড়ে এবং অনেক সময়কঠিন পরীক্ষাকালে তার ঈমানের ভিতও নড়ে যায়। এহেন অবস্থায় মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে তাঁর নিজের ইচ্ছা জগতের পরদা উঠিয়ে এক ঝলক দেখিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সেখানে দিনরাত কি হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে এবং ঘটনার বহিরাংগন তার অভ্যন্তর থেকে কেমন ভিন্নতর হয় তা তিনি জানতে পারেন। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে এ ঘটনাটা কোথায় ও কবে সংঘটিত হয় ? কোরআনে একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। হাদীসে অবশ্যি আমরা আওফীর একটি বর্ণনা পাই, যাতে তিনি ইবনে আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন মিশরে নিজের জাতির বসতি স্থাপন করেন তখন এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তা এ বর্ণনা সমর্থন করে না। তাছাড়া অন্য কোন উপায়েও একথা প্রমাণ হয় না যে, ফেরাউনের ধ্বংসের পর হযরত মূসা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আলাইহিস্ সালাম কখনো মিশরে গিয়েছিলেন। বরং কোরআন একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, মিশর ত্যাগ করার পর তাঁর সমস্তটা সময় সিনাই ও তীহ অঞ্চলে কাটে। কাজেই এ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দু'টি কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি।

এক, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-কে হয়তো তাঁর নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে এ পর্যবেক্ষণ করানো হয়েছিল। কারণ নবুওয়াতের শুরুতেই পয়গম্বরদের জন্য এ ধরনের শিক্ষা ও অনুশীলনের দরকার হয়ে থাকে। দুই, মুসলমানরা মক্কা মু'আয্যমায় যে ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল বনী ইসরাঈলও যখন তেমনি ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছিল তখনই হযরত মূসার জন্য এ পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকবে। এ দু'টি কারণে আমাদের অনুমান, (অবশ্য সঠিক কথা একমাত্র আল্লাহ জানেন) এ ঘটনার সম্পর্ক এমন এক যুগের সাথে যখন মিশরে বনী ইসরাঈলদের ওপর ফেরাউনের অত্যাচারের ধারাবাহকতা জারি ছিল এবং মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মতো ফেরাউন ও তার সভাসদরাও আযাবে বিলম্ব দেখে ধারণা করছিল যে, তাদের ওপরে এমন কোন সত্তা নেই যার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে এবং মক্কার মজলুম মুসলমানদের মতো মিশরের মজলুম মুসলমানরাও অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, হে আল্লাহ! আর কত দিন এ জালেমদেরকে পুরস্কৃত এবং আমাদের ওপর বিপদের সয়লাব-স্রোত প্রবাহিত করা হবে?

অত্যাচারের ভয়াবহতা দেখে এমনকি হযরত মূসাও চীৎকার করে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে পরওয়ারদিগার! তুমি ফেরাউন ও তার সভাসদদেরকে দুনিয়ার জীবনে বড়ই শান শওকত ও ধন-দওলত দান করেছো। হে আমাদের প্রতিপালক! এটা কি এ জন্য যে, তারা দুনিয়াকে তোমার পথ থেকে বিপথে পরিচালিত করবে?' (সূরায়ে ইউনুস, আয়াত নম্বর ৮৮)

যদি আমাদের এ অনুমান সঠিক হয় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্ভবত হযরত মূসার আলাইহিস্ সালাম এ সফরটি ছিল সুদানের দিকে। এ ক্ষেত্রে দু'দরিয়ার সংগমস্থল বলতে বুঝাবে বর্তমান খার্তুম শহরের নিকটবর্তী নীল নদের দুই শাখা বাহ্রুল আব্ইয়াদ (হোয়াইট নীল) ও বাহরুল আযরাক্ (ব্লু নীল) যেখানে এসে মিলিত হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম সারা জীবন যেসব এলাকায় কাটিয়েছেন সেসব এলাকায় এ একটি স্থান ছাড়া আর কোথাও দু'নদীর সংগমস্থল নেই।

এ ঘটনাটির ব্যাপারে বাইবেল একেবারে নীরব। তবে তালমুদে এ কাহিনীর উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে এ ঘটনাটিকে মূসা আলাইহিস্ সালাম

পরিবর্তে 'রাব্বী ইয়াহ্হানান বিন লাভীর' সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'হযরত ইলিয়াসের সাথে উল্লেখিত রাব্বীর (ইহুদীদের ধর্ম নেতাকে রাববী বলা হয়) এ ঘটানটি ঘটে। হযরত ইলয়াস আলাইহিস্ সালাম-কে দুনিয়া থেকে জীবিত অবস্থায় উঠিয়ে নেয়ার পর ফেরেশতাদের দলভুক্ত করা হয়েছে এবং তিনি দুনিয়ার ব্যাবস্থাপনায় নিযুক্ত হয়েছেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

[The Talmud Selections By H. Polano. PP. 313-16]

ইসরাঈলের মিশর ত্যাগের পুর্বেকার ঘটনাবলীর ন্যায় এ ঘটনাটিও সঠিক অবস্থায় সংরক্ষিত থাকেনি এবং শত শত বছর পরে তারা ঘটনার এক জায়গার কথা নিয়ে আর এক জায়গায় জুড়ে দিয়েছে। তালমুদের এ বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে কোন কোন গবেষক এ কথা বলে দিয়েছেন যে, কোরআনের এ স্থানে যে মূসার কথা বলা হয়েছে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নন বরং অন্য কোন মূসা হবেন। কিন্তু তালমুদের প্রত্যেকটি বর্ণনাকে নির্ভুল ইতিহাস গণ্য করা যেতে পারে না। আর কোরআনে কোন অজানা ও অপরিচিত মূসার উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে, এ ধরনের কোন কথা অনুমান করার কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তাছাড়া নির্ভরযোগ্য হাদীসমূহে যখন হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে মূসা বলতে বনী ইস্‌রাঈলের নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-কে নির্দেশ করেছেন। তখন কোন মুসলমানের জন্য তালমুদের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা তাদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে কোরআন মজীদের এ কাহিনীটিও উৎস সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার চেষ্টা করেছেন। তারা তিনটি কাহিনীর প্রতি অংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন যে, এসব জায়গা থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি নকল করেছেন এবং তারপর দাবী করেছেন, আমাকে অহীর মাধ্যমে এ ঘটনা জানানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে গিলগামিশের কাহিনী, দ্বিতীয়টি সুরিয়ানী সিকান্দার নামা এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ওপরে যে ইহুদী বর্ণনাটির উল্লেখ আমরা করেছি। কিন্তু এ কুটীল স্বভাব সম্পন্ন লোকেরা জ্ঞান চর্চার নামে যেসব গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান সেখানে পূর্বাহ্নেই এ সিদ্ধান্ত করে নেন যে, কোরআনকে কোনক্রমেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বলে মেনে নেয়া যাবে না। তাদের মনে এই ভিত্তিহীন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত রেখেই তারা গবেষণা কাজে প্রবৃত্ত হন। কাজেই এখন যে কোনভাবেই এ বিষয়ের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু পেশ করেছেন তা অমুক অমুক জায়গা থেকে চুরি করা বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি থেকে গৃহীত। এ ন্যক্কারজনক গবেষণা পদ্ধতিতে তারা এমন নির্লজ্জভাবে টানাহেচড়া করে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় যে, তা দেখে স্বতঃফূর্তভাবে ঘৃণায় মন রি রি করে ওঠে এবং মানুষ বলতে বাধ্য হয় ঃ যদি এর নাম হয় তাত্বিক গবেষণা তাহলে এ ধরনের তত্ব-জ্ঞান ও গবেষণার প্রতি অভিশাপ। আল্লাহর কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য এ ধরণের লোক দেখানো গবেষণার কোন প্রয়োজন মানব জাতির নেই।

কোন জ্ঞানান্বেষণকারী, সত্যসন্ধানকারী যদি এই তথাকথিত গবেষকদের কাছে যদি কেবলমাত্র চারটি বিষয়ের জবাব চায় তাহলে তাদের বিদ্বেষমূলক মিথ্যাচারের একেবারেই হাঁটে হাঁড়ি ভেঙ্গে যাবে। প্রকাশ হয়ে পড়বে তারা কতটা মুসলিম বিদ্বেষী এবং ইসলামের কত বড় শত্রু। তাদের কাছে প্রশ্ন করতে হবেঃ-

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এক. আপনাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে, যার ভিত্তিতে আপনারা দু'চারটে প্রাচীন গ্রন্থে কোরআনের কোন বর্ণনার সাথে কিছুটা মিলে যায় এমন ধরনের বিষয় পেলেই দাবী করে বসেন যে, কোরআনের বর্ণনাটি অবশ্যই এ গ্রন্থগুলো থেকে নেয়া হয়েছে ? আপনরা এ কথা কোন প্রামাণের ভিত্তিতে বলে থাকেন এবং কেন বলে থাকেন ?

দুই, আপনারা বিভিন্ন ভাষার যেসব গ্রন্থকে কোরআন মজীদের কাহিনী ও অন্যান্য বর্ণনার উৎস গণ্য করেছেন সেগুলোর তালিকা তৈরি করলে দস্তুরমতো একটি বড়সড় লাইব্রেরীর গ্রন্থ তালিকা তৈরি হয়ে যাবে। এ ধরনের কোন লাইব্রেরী কি সে সময় মক্কায় ছিল এবং বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকবৃন্দ সেখানে বসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপাদান সরবরাহ করছিলেন ? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আরবী ব্যতীত আর অন্য কোন ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন যে, তিনি অন্য ভাষায় রচিত কিতাব পাঠ করে তা থেকে কাহিনী নকল করে কোরআনের নামে চালিয়ে দেবেন ? যদি এমনটি না হয়ে থাকে এবং নবুওয়াত লাভের কয়েক বছর পুর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের বাইরে, যে দু'তিনটি সফর করেছিলেন শুধুমাত্র তারই ওপর আপনারা নির্ভর করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বাণিজ্যিক সফরগুলোয় তিনি কয়টি লাইব্রেরীর বই অনুলিখন বা মুখস্ত করে এনেছিলেন ? নবুওয়াতের ঘোষণার একদিন আগেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তায়-এ ধরনের তথ্যের কোন চিহ্ন পাওয়া না যাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ কি ?

তিন, মক্কার কাফের সম্প্রদায়, ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাগুলো কোথা থেকে আমদানী করেন, তিনি যা বলেন তার উৎস কি, কে তাকে এসব প্রাচীন কাহিনী শিখিয়ে দিচ্ছে। এসব বিষয়ে সমকালিন লোকজন তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছে, কিন্তু তারা কোন সন্ধান করতে না পেরে অবশেষে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ হতে ওহী আসা ব্যতীত এ কথা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। নবী যদি কোন কাহিনী নকল বা চুরি করে থাকেন, তাহলে আপনারা বলতে পারেন নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমকালীন অনুসন্ধানকারী লোকজন তাঁর এ চুরির কোন সন্ধান লাভ করতে পারেনি কেন ? এর কারণ কি ? তাদেরকে তো বারবারই এ মর্মে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছিল যে, এ কোরআন আল্লাহ নাযিল করছেন, অহী ছাড়া এর দ্বিতীয় কোন উৎস নেই, যদি তোমরা একে মানুষের বাণী বলো তাহলে মানুষ যে এমন বাণী তৈরি করতে পারে তা প্রমাণ করে দাও। এ চ্যালেঞ্জটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমকালীন ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেংগে দিয়েছিল। তারা এমন একটি উৎসের প্রতিও অংগুলি নির্দেশ করতে পারেনি যা থেকে কোরআনের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে বলে কোন বিবেকবান ব্যক্তি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা সন্দেহও করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, সমকালীনরা এ গোয়েন্দাবৃত্তিতে ব্যর্থ হলো কেন? আর কোরআন নাজিলের

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হাজার বারোশো বছর পরে আজ ইউরোপের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী পক্ষ এতে সফলতার ভান ধরছেন কেমন করে ?

শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হচ্ছে, এ কথার সম্ভবনা তো অবশ্যি আছে যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং এ কিতাবটি বিগত ইতিহাসের এমনসব ঘটনার সঠিক খবর দিচ্ছে যা হাজার হাজার বছর ধরে শ্রুতির মাধ্যমে বিকৃত হয়ে অন্য লোকদের কাছে পৌছেছে এবং গল্পের রূপ নিয়েছে। কোন্ ন্যায়-সংগত প্রমাণের ভিত্তিতে এ সম্ভাবনাটিকে একদম উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে এবং কেন শুধুমাত্র এ একটি সম্ভাবনাকে আলোচনা ও গবেষণার ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে যে, লোকদের মধ্যে গল্প ও মৌখিক প্রবাদ আকারে যেসব কিস্‌সা কাহিনী প্রচলিত ছিল কোরআন সেগুলো থেকেই গৃহীত হয়েছে ? ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও হঠকারিতা ছাড়া এ প্রাধান্য দেবার জন্য কোন কারণ বর্ণনা করা যেতে পারে কি ?

এ প্রশ্নগুলো নিয়ে যে ব্যক্তিই একটু চিন্তা-ভাবনা করবে তারই এ সিদ্ধান্তে পৌছে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকতে পারেনা যে, প্রাচ্যবিদরা "তত্ত্বজ্ঞানের" নামে যা কিছু পেশ করেছেন কোন দায়িত্বশীল শিক্ষার্থী ও জ্ঞানানুশীলনকারীর কাছে তার কানাকড়িও মূল্য নেই।

মূসা বললো, 'আমরা তো এরই খোঁজে ছিলাম–অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের এ লক্ষস্থলের কথাই তো আমাকে বলা হয়েছিল। এ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ইংগিতই পাওয়া যায় যে, আল্লাহর ইংগিতেই হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম এ ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর গন্তব্য স্থলের চিহ্ন হিসেবে তাঁকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, যেখানে তাঁদের নাশ্‌তার জন্য নিয়ে আসা মাছটি অদৃশ্য হয়ে যাবে সেখানে তাঁরা আল্লাহর সেই বান্দার দেখা পাবেন, যার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে মহান আল্লাহ যার সাথে সাক্ষাৎ করতে পাঠিয়েছিলেন, সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীসে এ বান্দার নাম বলা হয়েছে খিযির। সুতরাং ইসরাঈলী বর্ণনায় প্রভাবিত হয়ে যারা হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম-এর সাথে এ ঘটনাটি জুড়ে দেন তাদের বক্তব্য মোটেই প্রণিধানযোগ্য নয়। তাদের এ বক্তব্য শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর সাথে সংঘর্ষশীল হবার কারণেই যে ভুল তা নয় বরং এ কারণেও ভুল যে, হযরত ইলিয়াস হযরত মূসার কয়েকশ বছর পরে জন্মলাভ করেছিলেন।

কোরআনে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর খাদেমের নামও বলা হয়নি। তবে কোন কোন হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, তিনি ছিলেন হযরত ইউশা' বিন নূন। পরে তিনি হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর খলীফা হন।

এ কাহিনীটির মধ্যে বিরাট জটিলতা আছে। এই জটিলতা দূর করা প্রয়োজন। হযরত খিযির যে তিনটি কাজ করেছিলেন তার মধ্যে তৃতীয় কাজটির সাথে শরীয়াতের বিরোধ নেই কিন্তু প্রথম কাজ দু'টি নিঃসন্দেহে মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আল্লাহ যতগুলো শরীয়াত নাযিল করেছেন তাদের প্রতিষ্ঠিত বিধানের বিরোধী। কারোর মালিকানাধীন কোন জিনিস নষ্ট করার এবং কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি কোন শরীয়াত কোন মানুষকে দেয়নি। এমন কি যদি

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কোন ব্যক্তি ইলহামেরম (আল্লাহর পক্ষ হতে মনোজগতে প্রদত্ত ধারণা) মাধ্যমে জানতে পারে যে, সামনের দিকে এক জালেম একটি নৌকা ছিনিয়ে নেবে এবং অমুক বালকটি বড় হয়ে খোদাদ্রোহী ও কাফের হয়ে যাবে তবুও আল্লাহ প্রেরিত বিধানগুলোর মধ্য থেকে কোন বিধানের দৃষ্টিতেই তার জন্য এ তত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নৌকা ছেঁদা করে দেয়া এবং একটি নিরপরাধ বালককে হত্যা করা জায়েয নয়। এর জবাবে একথা বলা যে, হযরত খিযির এ কাজ দু'টি আল্লাহর হুকুমে করেছিলেন। আসলে এতে এই জটিলতা একটুও দূর হয় না। প্রশ্ন এ নয় যে, হযরত খিযির কার হুকুমে এ কাজ করেছিলেন। এগুলো যে আল্লাহর হুকুমে করা হয়েছিল তা তো সন্দোহাতীতভাবে প্রমাণিত। কারণ হযরত খিযির নিজেই বলছেন, তাঁর এ কাজগুলো তাঁর নিজের ক্ষমতা ইখতিয়ারভুক্ত নয় বরং এগুলোর উদ্যোক্তা হচ্ছে আল্লাহর দয়া ও করুণা। আর হযরত খিযিরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তত্বজ্ঞান দেয়া হয়েছিল বলে প্রকাশ করে আল্লাহ নিজেই এর সত্যতার ঘোষনা দিয়েছেন।

অতএব আল্লাহর হুকুমে যে এ কাজ করা হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে যে আসল প্রশ্ন দেখা দেয় সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর এ বিধান কোন্ ধরনের ছিল ? একথা সুস্পষ্ট যে, এগুলো শরীয়াতের বিধান ছিল না। কারণ কোরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ থেকে আল্লাহর শরীয়াতের যেসব মূলনীতি প্রমাণিত হয়েছে তার কোথাও কোন ব্যক্তিকে এ সুযোগ দেয়া হয়নি যে, সে অপরাধ প্রমাণিত হওয়া ছাড়াই কাউকে হত্যা করতে পারবে। তাই নিশ্চিতভাবে এ কথা মেনে নিতে হবে যে, এ বিধানগুলো প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এমন সব সৃষ্টিগত বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল যেগুলোর আওতাধীনে দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে কাউকে রোগগ্রস্ত করা হয়, কাউকে রোগমুক্ত করা হয়, কাউকে মৃত্যু দান করা হয়, কাউকে জীবন দান করা হয়, কাউকে ধ্বংস করা হয় এবং কারোর প্রতি করুণাধারা বর্ষণ করা হয়। এখন যদি এগুলো সৃষ্টিগত বিধান হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর দায়িত্ব একমাত্র ফেরেশতাগণের ওপরই সোপর্দ হতে পারে। তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শরীয়াতগত বৈধতা ও অবৈধতার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা-ইখতিয়ার ছাড়া একমাত্র আল্লাহর হুকুম তামিল করে থাকে।

আর মানুষের ব্যাপারে বলা যায়, সে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন সৃষ্টিগত হুকুম প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিণত হোক বা ইলহামের সাহায্যে এ ধরনের কোন অদৃশ্য জ্ঞান ও হুকুম লাভ করে তা কার্যকর করুক, সর্বাবস্থায় যে কাজটি সে সম্পন্ন করেছে সেটি যদি শরীয়াতের কোন বিধানের পরিপন্থী হয় তাহলে তার গুনাহগার হওয়া থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কারণ মানব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষ শরীয়াতের বিধান মেনে চলতে বাধ্য। কোন মানুষ ইলহামের মাধ্যমে শরীয়াতের কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণের হুকুম লাভ করেছে এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মাধ্যমে এ বিরুদ্ধাচরণকে কল্যাণকর বলা হয়েছে বলেই শরীয়াতের বিধানের মধ্য থেকে কোন বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করা তার জন্য বৈধ হয়ে গেছে, শরীয়াতের মূলনীতির মধ্যে কোথাও এ ধরনের কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এটি এমন একটি কথা যার ওপর কেবলমাত্র শরীয়াতের আলেমগণই যে, একমত তাই নয় বরং প্রধান সুফীগণও একযোগে একথা বলেন। আল্লামা আলুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিস্তারিতভাবে আবদুল ওয়াহ্হাব শি'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, মুজাদ্দিদে আলফিসানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, জুনায়েদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, সাররী সাকৃতী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবুল হাসান আন্নুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবু সাঈদ আলখাররায্ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আবুল আব্বাস আহমদ আদ্দাইনাওয়ারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম গায্যালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর ন্যায় খ্যাতনামা বুযর্গগণের উক্তি উদ্ধৃত করে একথা প্রমাণ করেছেন যে, তাসাউফপন্থীদের মতেও কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান বিরোধী ইলহামকে কার্যকর করা যার প্রতি ইলহাম হয় তার জন্যও বৈধ নয়।

এখন কি আমরা একথা মেনে নেবো যে, এ সাধারণ নিয়ম থেকে মাত্র একজন মানুষকে পৃথক করা হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন হযরত খিযির ? অথবা আমরা মনে করবো, খিযির কোন মানুষ ছিলেন না বরং তিনি আল্লাহর এমনসব বান্দার দলভুক্ত ছিলেন যারা আল্লাহর ইচ্ছার আওতাধীনে (পৃথিবীতে নবীর মাধ্যমে নাজিল করা আল্লাহর শরীয়াতের আওতাধীনে নয়) কাজ করেন ?

প্রথম অবস্থাটি আমরা মেনে নিতাম যদি কোরআন স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতো যে, হযরত মূসাকে যে 'বান্দা'র কাছে অনুশীলন লাভের জন্য পাঠানো হয়েছিল তিনি মানুষ ছিলেন। কিন্তু কোরআন তার মানুষ হবার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি বরং কেবলমাত্র, 'আমার বান্দাদের একজন' বলে ছেড়ে দিয়েছে। আর একথা সুস্পষ্ট, এ বাক্যাংশ থেকে ঐ বান্দার মানব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া অপরিহার্য হয় না। বান্দাহ বলতে শুধু মানুষকেই বুঝানো হয়নি। কোরআন মজীদে বিভিন্ন জায়গায় ফেরেশতাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যেমন দেখুন সূরা আম্বিয়া ২৬ আয়াত এবং সূরা যখরুফ ১৯ আয়াত। তাছাড়া কোন সহী হাদীসেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন বক্তব্য উদ্ধৃত হয়নি যাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হযরত খিযিরকে মানব সম্প্রদায়ের একজন সদস্য গণ্য করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীসটি সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে, তিনি উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস শাস্ত্রের ইমামগণের নিকট পৌছেছে। সেখানে হযরত খিযিরের জন্য শুধুমাত্র 'রজুল' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এ শব্দটি যদিও মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হয় তবুও শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় না। কাজেই কোরআনে এ শব্দটি জিনদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা জিনে জিনদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এ কথা সুস্পষ্ট যে, জিন বা ফেরেশ্‌তা অথবা অন্য কোন অদৃশ্য অস্তিত্ব যখন মানুষের সামনে আসবে তখন মানুষের আকৃতি ধরেই আসবে এবং এ অবস্থায় তাকে মানুষই

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বলা হবে। হযরত মারয়ামের সামনে যখন ফেরেশতা এসেছিল তখন কোরআন এ ঘটনাটিকে এভাবে বর্ণনা করেছে 'ফাতামাছছালা লাহা বাশারান ছাভিইয়া'। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি যে 'সেখানে তিনি একজন পুরুষকে পেলেন' হযরত খিযিরের মানুষ হবার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করছে না। এরপর এ জটিলতা দূর করার জন্য আমাদের কাছে হযরত খিযিরকে মানুষ নয় ফেরেশতা হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথই থাকে না। অথবা তাঁকে আল্লাহর এমন কোন সৃষ্টি মনে করতে হবে যিনি শরীয়াতের বিধানের আওতাধীন নন এবং আল্লাহর ইচ্ছা পুরণের কাজে নিযুক্ত একজন কর্মী। প্রথম যুগের আলেমগণের কেউ কেউ এমত প্রকাশ করেছেন এবং ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর তাফসীর গ্রন্থে মাওয়ারদীর বরাত দিয়ে তা উদ্ধৃত করেছেন।

হযরত মূসার ইন্তেকাল

আলাইহিস্ সালাম

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর ইন্তেকাল ও কবর সম্পর্কে বোখারী শরীফের হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মৃত্যুর ফেশেরতা যখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর কাছে তাঁর প্রাণ গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন তখন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফেরেশতাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছে গিয়ে আবেদন করেছিলেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যিনি মৃত্যুবরণ করতে আগ্রহী নন।

মহান আল্লাহ সে ফেরেশতাকে বললেন, তুমি তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বলো, সে যেন তাঁর একটা হাত গরুর পিঠের ওপরে রাখে। তাঁর হাতের নিচে যতগুলো পশম পড়বে, তার প্রতিটি পশমের বিনিময়ে এক বছরের হায়াত সে লাভ করবে।

ফেরেশতা এসে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-কে সে কথা জানালেন। আল্লাহর নবী হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! এই হায়াত তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে। তারপর কি হবে?

মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে জানালেন, তারপর মৃত্যুকে বরণ করতেই হবে।

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম বললেন, মৃত্যুই যদি বরণ করতেই হয়, তাহলে আর দেরি করে কি লাভ হবে? এখনই মৃত্যু হয়ে যাক।

হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন, তাঁকে যেন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে কবর দেয়া হয়। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কাছে বলেছেন, যদি আমি সেখানে অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের কাছে থাকতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল টিলার নিচে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম-এর কবর দেখিয়ে দিতাম। (বোখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত দাউদ ও সোলাইমান

আলাইহিস সালাম

মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা বাকারায় আমাদেরকে শুনিয়েছেন। সেখানে আমরা জানতে পেরেছি যে, হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পরে বনী ইসরাঈলীদের ভেতরে যেসব নবী এসেছিলেন, তাঁদের ভেতর থেকে কোন একজন নবীর সময়ে তিনি এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও তাঁর পিতার নাম ও বংশাবলী কোন কোন গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে, আমরা কোরআনের আলোচনার মোকাবেলায় সংগত কারণেই তাঁর বংশাবলী আলোচনা করা হতে বিরত থাকলাম। তাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ-

ولقد اتينا داود منا فضلا-يجبال اوبى معه والطير-

والنا له الحديد-ان اعمل سبغت وقدر فى السرد

واعملوا صالحا-انى بما تعملون بصير (السبا)

দাউদকে আমি নিজের কাছ থেকে বিরাট অনুগ্রহ দান করেছিলাম। (আমি হুকুম দিলাম) হে পর্বতমালা! এর সাথে একাত্মতা করো (এবং এ হুকুমটি আমি) পাখিদেরকে দিয়েছি। আমি তার জন্য লোহা নরম করে দিয়েছি এ নির্দেশ সহকারে যে, বর্ম নির্মাণ করো এবং তাদের পরিমাপ যথার্থ আন্দাজ অনুযায়ী রাখো। (হে দাউদের পরিবার!) সৎকাজ করো, তোমরা যা কিছু করছো সবই আমি দেখছি। (সূরায়ে সাবা, আয়াত নম্বর ১০-১১)

মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি যে অসংখ্য অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন বাইতুল লাহমের ইয়াহুদা গোত্রের একজন সাধারণ যুবক। ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জালুতের মতো এক বিশাল দেহী ভয়ংকর শত্রুকে হত্যা করে তিনি রাতারাতি বনী ইসরাঈলের নয়ন মণিতে পরিণত হন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর উত্থান শুরু হয়। এমনকি তালুতের ইন্তিকালের পরে প্রথমে তাঁকে 'হাব্রুনে' (বর্তমান আল খালীল) ইয়াহুদিয়ার শাসনকর্তা করা হয়। এর কয়েক বছর পর সকল বনী ইসরাঈল গোত্র সর্বসম্মতভাবে তাঁকে নিজেদের বাদশাহ নির্বাচিত করে এবং তিনি জেরুসালেম জয় করে ইসরাঈলী রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ইতিহাসে প্রথমবার এমন একটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার সীমানা আকাবা উপসাগর থেকে ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এসব অনুগ্রহের সাথে সাথে আল্লাহ তাঁকে আরো দান করেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর বন্দেগী ও তাঁর প্রতি আনুগত্যশীলতা। উল্লেখিত আয়াতে পর্বতমালা, পাখি ও লোহা সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, এই অধ্যায়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আমরা সূরা বাকারায় দেখেছি, তালুতের সাথে যে বীরত্ব পূর্ণ কাজের পরিচয় হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম দিয়েছিলেন, তাঁর এ কাজই তাকে শাসকের পদ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। বনী ইসরাঈলীদের ভেতরে এক নিয়ম চলে আসছিল যে, দেশের শাসন ক্ষমতা থাকতো হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামের বংশের লোকদের হাতে আর নবুওয়াত ও রেসালাতের দায়িত্ব অর্পিত হতো ইয়াহুদার বংশের লোকদের হাতে। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি–যিনি একাধারে ছিলেন শাসক ও আল্লাহর একজন মহান নবী। সূরা বাকারায় তাঁর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন, আমি তাকে রাজদন্ড দান করেছিলাম এবং হেকমত ও তাঁকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে যা ইচ্ছে করেছেন তা শিখিয়েছেন।

সূরায়ে ছোয়াদে বলা হয়েছে, হে দাউদ ! অনশ্যই আমি তোমাকে পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছি। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পরে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামই প্রথম নবী যাকে মহান আল্লাহ খলীফা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম বিশাল এলাকার শাসক ছিলেন। তিনি তাঁর শাসনাধীন এলাকায় মহান আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছিলেন, সে বিধান অনুসারে শাসন কার্য পরিচালনা করতেন। মোট কথা তিনি আল্লাহর দেয়া বিধান শাসন দন্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ফলে তাঁর শাসনাধীন এলাকায় বিরাজ করছিল অনাবিল শান্তি আর সমৃদ্ধি। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের সামনে যে বিচার কার্য পেশ করা হতো, তার সমাধান করার মতো জ্ঞান তাঁর থাকলে তিনি তা তৎক্ষণাত সমাধান করতেন। আর সে সম্যার সমাধান করার মতো জ্ঞান না থাকলে তিনি মহান আল্লাহর ওহীর জন্য অপেক্ষা করতেন। মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে সমাধান অবগত করতেন। দেশের সাধারণ মানুষ হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে এমন ধারণা করতো যে, যে কোন মিথ্যা মামলা তাঁর কাছে দায়ের করা হোক না কেন এবং সে মিথ্যার পেরে যতোই চাকচিক্য দিয়ে তা সত্য বলে চালানো হোক না কেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের কাছে তা গোপন থাকতো না। কারণ আল্লাহ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে সত্য জানিয়ে দিতেন।

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের এলাকায় এমন কোন সৃষ্টি ছিল না, যারা তাঁর আদেশ অমান্য করে সাহস পেতো। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কোন মিথ্যা মামলা তাঁর দরবারে দায়ের করলে, তিনি তা ওহীর মাধ্যম্যে জানতে পারতেন, কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। মহান আল্লাহ সূরা ছোয়াদে বলেছেন, আর আমি তাঁর রাজত্বকে শক্তিশালী করে দিয়েছি এবং তাঁকে নবুওয়াত দান করেছি, তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছি।

মহান আল্লাহ তাঁর ওপরে যাবুর কিতাব নাজিল করেছিলেন। আল্লাহর কালাম যখন তিনি তেলওয়াত করতেন, তখন সমস্ত সৃষ্টি নীরব হয়ে যেতো তাঁর কিতাব পাঠ শোনার জন্য। মহান আল্লাহ তাঁকে এমন সুন্দর ও সুমিষ্ট কণ্ঠদান করেছিলেন যে,

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সমস্ত সৃষ্টি তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠ শুনে মোহিত হয়ে যেতো। উড়ন্ত পাখির শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে যখন হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের যাবুর কিতাব পাঠের শব্দ প্রবেশ করতো, তখন তারা ওড়া বন্ধ করে দিয়ে নীরবে বসে পড়তো, তন্ময় হয়ে কিতাব পাঠ শুনতো।

পৃথিবীতে সমস্ত নবীকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়নি। আল্লাহর কাছে কারো মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে আবার কারো মর্যাদা কম করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সূরা বনী ইসরাঈলে বলেছেন, আর নিঃসন্দেহে আমি কতিপয় নবীকে কতিপয় নবীর ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আমি দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি। সূরায়ে নিছাতেও বলা হয়েছে, আর আমি দাউদকে যাবুর দান করেছি। বোখারী শরীফের কিতাবুল আম্বিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী আলাইহিস্ সালাম বলেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের ওপরে যে যাবুর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, তা তিনি এত সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতরে পাঠ করতেন যে, তিনি যখন তাঁর বাহন ঘোড়ার পিঠে গিদ বাঁধতেন, তখন যাবুর কিতাব পাঠ করা শুরু করতেন। ঘোড়ার পিঠে গদি বাঁধা শেষ হতো তাঁর যাবুর কিতাব পাঠ করাও শেষ হয়ে যেতো। এত অল্প সময়ের ভেতরে তাঁর সম্পূর্ণ যাবুর কিতাব পাঠ শেষ হতো।

পবিত্র কোরআনে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে প্রবল প্রতাপশালী শাসক এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নবী ও রাসুল হিসেবে উপস্থাপন করেছে। পক্ষান্তরে তাওরাত কিতাবে তাঁকে শুধু শাসক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, নবী হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। মহান আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের পর্বত শ্রেণী ও নানা ধরণের সৃষ্টি জীবকে বাধ্যানুগত করে দিয়েছিলেন। এই মর্যাদা সব নবীকে দান করা হয়নি। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম যখন মহান আল্লাহর প্রশংসা করতেন, তখন তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসা করতো। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে তাঁর সন্তান হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। এ কারণে আমরা এই পিতা-পুত্রের ইতিহাস একত্রেই এ গ্রন্থেই পেশ করলাম।

আমি দাউদকে জবুর দিয়েছি

আলাইহিস সালাম

বাইবেল হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে নবী হিসেবে উল্লেখ করেনি। কিন্তু মহান আল্লাহ এই ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথার প্রতিবাদ করে বলেছে, তিনি নবী ছিলেন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেমন ওহী দান করা হয়েছে এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের ওপরে যেমন ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছিল, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের ওপরেও তেমনি ওহী তথা যাবুর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেনঃ-

انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده-

ahlussunnah-bd.blogspot.com

واوحينا الى ابرهيم واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهرون وسليمن-واتينا داود زبورا (نساء)

হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পরগম্বরগণের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলাইমানের প্রতি ওহী পাঠাইয়াছি। আমি দাউদকে জবুর দিয়েছি। (সূরায়ে আন্ নিছা, আয়াত নম্বর ১৬৩)

বর্তমান বাইবেলে 'জবুর' নামে যে কিতাব পাওয়া যায়, তা সবই দাউদ আলাইহিস্ সালামের প্রতি অবতীর্ণ জবুর নয়। এতে অন্যান্য লোকের বহু কথা (স্তোত্র) শামিল করে দেয়া হয়েছে এবং সেব কথা নিজ নিজ রচয়িতাদের নামেই পরিচিত হচ্ছে। অবশ্য যেসব বাণী (স্তোত্র) হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের নামে লিখিত হয়েছে, তাতে বাস্তবিকই সত্য-বাণীর উজ্জ্বল আলো লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে বাইবেলে 'আমসালে সোলাইমান' নামে যে কিতাব রয়েছে, তাতে যথেষ্ট মিশ্রণ রয়েছে বলে প্রমাণ হয়। এই গ্রন্থের শেষ দুটো অধ্যায় যে পরে যোগ করা হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও এর বেশীর ভাগ অংশই সঠিক ও যথার্থ মনে হয়। এই দুই কিতাবের সঙ্গে আর একটি কিতাবও হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালামের নামে বাইবেলে সংযোজিত হয়েছে; কিন্তু সে কিতাবে জ্ঞানময় বহু অমূল্য রত্ন থাকা সত্ত্বে তা পাঠ করার সময় এর উপদেশাবলীর সাথে হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের সম্পৃকক্ততাকে সঠিক বলে বিশ্বাস হয় না। কেননা, কোরআন এবং উক্ত কিতাবের প্রথম দিকে হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালামের যে বিরাট ধৈর্য সহিষ্ণুতার প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়, এই কিতাব তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পেশ করে। এই কিতাবে বলা হয়েছে যে, হযরত আইয়ূব আলাইহিস্ সালাম তাঁর বিপদের সময় আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগের বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে বসেছিলেন। এমন কি, তাঁর সহচর নাকি এই কথা বলে তাঁকে সান্তনা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্ জালিম নন। কিন্তু তার কথা নাকি তিনি মোটেই মানেননি।

এই সব সহীফা ছাড়াও বনী ইসরাঈলী নবীদের আরো ১৭ টি সহীফা বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার অধিকাংশকেই সহীহ মনে হয়। বিশেষত ইয়াস্ইয়াহ, ইয়ারমিয়াহ, হজকীইল, আমূস এবং অন্যান্য কয়েটি সহীফায় এমন আনেক জায়গা রয়েছে, যা পাঠ করে প্রাণ নেচে ওঠে। তাতে খোদায়ী কালামের মাহাত্ম্যও সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়। সেগুলোর নৈতিক শিক্ষা, শিরকের বিরুদ্ধে সেগুলোর জিহাদ, তওহীদের সমর্থনে অকাট্য যুক্তি এবং বনী-ইসরাঈলের নৈতিক পতন সম্পর্ক সেগুলির কঠোর ও তীব্র সমালোচনা পাঠ করার সময় মানুষ এই কথা অনুভব করতে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বাধ্য হয় যে, ইনজীলের কিতাবসমূহে উল্লেখিত হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ভাষণ, কোরআন মজীদ এবং এই সহীফাসমূহ একই উৎস হতে উৎসারিত অমীয় ধারা বই কিছুই নয়।

বাইবেলে বর্ণনা করছে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম শুধুমাত্র শাসক ছিলেন এবং সেভাবেই তাকে বাইবেলে উপস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণত অধিকাংশ শাসকদের নৈতিক চরিত্রে দুর্বলতা থাকে। বাইবেল এই দিকটা সামনে রেখে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের মতো একজন মহান নবীকে চরিত্র হীন বানিয়ে ছেড়েছে। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাইবেলের সেই কুৎসিত বর্ণনা ইসলামের নামে রচিত পুস্তকে কোরআন হাদিসের বর্ণনার সাথে জুড়ে দিয়ে এক সীমাহীন অপরাধ করা হয়েছে।

হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের ওপর যে মহান আল্লাহ যাবুর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, এ কথা পবিত্র কোরআনের সূরা বনী ইসরাঈলেও বলেছেন। বলা হয়েছেঃ–

وربك اعلم بمن فى السموت والارض-ولقد فضلنا بعض النبين على بعض واتينا داود زبورا (اسراءيل)

তোমার রব পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টিসমূহকে বেশী জানেন। আমি কতক নবীকে কতক নবীর ওপর মর্যাদা দিয়েছি এব আমি দাউদকে যাবুর দিয়েছিলাম। (সূরায়ে বনী ইসরাঈল, আয়াত নম্বর ৫৫)

এখানে বিশেষভাবে দাউদ আলাইহিস সালামকে যাবুর দান করার কথা সম্ভবত এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, দাউদ আলাইহিস সালাম বাদশাহ ছিলেন এবং বাদশাহ সাধারণত আল্লাহর কাছ থেকে বেশী দুরে অবস্থান করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন লোকেরা যে কারণে তাঁর পয়গম্বরী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার বিষয়টি মেনে নিতে অস্বীকার করতো তা তাদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী এ ছিল যে, সাধারণ মানুষের মতো তাঁর স্ত্রী-সন্তান ছিল, তিনি পানাহার করতেন, হাটে-বাজারে চলাফেরা করেন কেনাবেচা করতেন এবং একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি নিজের দুনিয়াবী প্রয়োজনাদি পূরণ করার জন্য যেসব কাজ করতো তিনি তা সব করতেন। মক্কার কাফেরদের বক্তব্য ছিল, তুমি একজন দুনিয়াদার ব্যক্তি, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীরা তো হচ্ছে এমন সব লোক, নিজেদের দৈহিক ও মানসিক চাহিদার ব্যাপারে যাদের কোন জ্ঞান থাকে না। তারা তো একটি নির্জন জায়গায় বসে দিনরাত আল্লাহর ধ্যানে ও স্মরণে মশ্‌গুল থাকে। ঘর সংসারের চাল-ডালের কথা ভাববার সময় ও মানসিকতা তাদের কোথায়! এর জবাবে বলা হচ্ছে, পুরোপুরি একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার চাইতে বড় দুনিয়াদারী আর কি হতে পারে, কিন্তু এরপরও হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নবুওয়াত ও কিতাবের নিয়ামত দান করা হয়েছিল। বিশেষ করে এ আয়াতে ধর্মনিরপেক্ষদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দান করা হয়েছে। যারা ইসলামকে আর রাজনীতিকে পৃথক করতে চায়, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের ইতিহাস তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব।

হযরত দাউদের ওপর মারাত্মক অপবাদ

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, তখন আমি তার ত্রুটি ক্ষমা করে দিলাম এবং নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান–এই আয়াত থেকে জানা যায়, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের ত্রুটি তো অবশ্যই হয়েছিল এবং সেটি এমন ধরনের ত্রুটি ছিল যার সাথে দুম্বীর মামলার এক ধরনের সামঞ্জস্য ছিল। তাই তার ফায়সালা শুনাতে গিয়ে সংগে সংগেই তাঁর মনে চিন্তা জাগে, এর মাধ্যমে আমার পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু এ ত্রুটি এমন মারাত্মক ধরনের ছিল না যা ক্ষমা করা যেতো না অথবা ক্ষমা করা হলেও তাঁকে উন্নত মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয়া হতো। আল্লাহ নিজেই এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন, যখন তিনি সিজদায় পড়ে তাওবা করলেন তখন তাঁকে কেবল ক্ষমাই করে দেয়া হয়নি বরং দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি যে উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাতেও পার্থক্য দেখা দেয়নি।

তাওবা কবুল করার ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দেবার সাথে সাথে মহান আল্লাহ সে সময় হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে এ সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন। এ থেকে একথা আপনা আপনি প্রকাশ হয়ে যায় যে, তিনি যে কাজটি করেছিলেন তাতে প্রবৃত্তির কামনার কিছু দখল ছিল, শাসন ক্ষমতার অসংগত ব্যবহারের সাথেও তার কিছু সম্পর্ক ছিল এবং তা এমন কোন কাজ ছিল যা কোন ন্যায়নিষ্ঠ শাসকের জন্য শোভনীয় ছিল না।

এখানে এসে আমাদের সামনে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয়। এক, সেটি কি কাজ ছিল? দুই, আল্লাহ পরিষ্কারভাবে সেটি না বলে এভাবে অন্তরালে রেখে সেদিকে ইংগিত করছেন কেন ? তিন, এ প্রেক্ষাপটে তার উল্লেখ করা হয়েছে কোন্ সম্পর্কের ভিত্তিতে?

যারা বাইবেল (খৃষ্টান ও ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ) অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে এ কথা গোপন নেই যে, তথাকথিত এসব পবিত্র গ্রন্থে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের বিরুদ্ধে হিত্তীয় উরিয়ার (Uriah the Hittite) স্ত্রীর সাথে জিনা করার এবং তারপর উরিয়াকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে তার স্ত্রীকে বিয়ে করার পরিষ্কার অভিযোগ আনা হয়েছে। আবার এই সংগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এ মেয়েটি যে এক ব্যক্তির স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে হযরত দাউদের হাওয়ালা করে দিয়েছিল সেই ছিল হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের মা। এ সম্পর্কিত পুরো কাহিনীটি বাইবেলের শামুয়েল-২ পুস্তকের ১১-১২ অধ্যায়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। কোরআন নাযিল হবার শত শত বছর পূর্বে এগুলো বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়েছিল। সারা দুনিয়ার ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তাদের এ পবিত্র কিতাব পাঠ করতো অথবা এর পাঠ শুনতো সে-ই এ কাহিনীটি কেবল জানতোই না বরং এটি বিশ্বাসও করতো। তাদেরই মাধ্যমে পৃথিবীতে এ কাহিনীটি চারদিকে ছড়িয়ে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পড়েছে এবং আজ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে বনী ইসরাঈল ও ইহুদী ধর্মের ইতিহাস সম্পর্কিত এমন কোন একটি বইও লিখিত হয় না যেখানে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে এই দোষারোপের পুনরাবৃত্তি করা হয় না। এ বহুল প্রচরিত কাহিনীতে এ কথাও লিখিত হয়েছে ঃ

"পরে সদাপ্রভু দাউদের নিকটে নাথনকে প্রেরণ করিলে। আর তিনি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিলেন,-এক নগরে দুইটি লোক ছিল; তাদের মধ্যে একজন ধনবান, আর একজন দরিদ্র। ধনবানের অতি বিস্তর মেষাদি পাল ও গো-পাল ছিল। কিন্তু সেই দরিদ্রের আর কিছুই ছিল না, কেবল একটি ক্ষুদ্র মেষবৎস ছিল, সে তাহাকে কিনিয়া পুষিতে ছিল; আর সেটি তাহার সংগে ও তাহার সন্তানদের সংগে থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল; সে তাহারই খাদ্য খাইত ও তাহারই পাত্রে পান করিত, আর তাহার বক্ষস্থলে শয়ন করিত ও তাহার কন্যার মত ছিল। পরে ঐ ধনবানের গৃহে একজন পথিক আসিল, তাহাতে বাটিতে আগত অতিথির জন্য পান করণার্থে সে আপন মেষাদি পাল ও গো-পাল হইতে কিছু লইতে কাতর হইল, কিন্তু সেই দরিদ্রের মেষবৎসটি লইয়া যে, অতিথি আছিয়াছিল, তাহার জন্য তাহাই পাক করিল। তাহাতে দাউদ সেই ধনবানের প্রতি অতিশয় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন তিনি নাথনকে কহিলেন, জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, যে ব্যক্তি সেই কর্ম করিয়াছে, সে মৃত্যুর সন্তান; সে কিছু দয়া না করিয়া এ কর্ম্ম করিয়াছে, এই জন্য সেই মেষ বৎসার চর্তুগুণ ফিরাইয়া দিবে।

তখন নাথন দাউদকে কহিলেন, আপনিই সেই ব্যক্তি। ইস্রায়েলের ঈশ্বর, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমাকে ইস্রায়েলের উপরে রাজপদে আভিষেক করিয়াছি এবং শৌলের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছি, আর তোমার প্রভুর বাটী তোমাকে দিয়াছি ও তোমার প্রভুর স্ত্রীগণকে তোমার বক্ষস্থলে দিয়াছি এবং ইস্রায়েলের ও জিহদার কুল তোমাকে দিয়াছি; আর তাহা যদি অল্প হইত, তবে তোমাকে আরও অমুক অমুক বস্তু দিতাম। তুমি কেন সদাপ্রভুর বাক্য তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিয়াছ ? তুমি হিত্তীয় উরিয়কে খড়গ দ্বারা আঘাত করাইয়াছ ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া আপনার স্ত্রী করিয়াছ, আম্মোন-সন্তানদের খড়গ দ্বারা উরিয়াকে মারিয়া ফেলিয়াছ।"

এই কাহিনী এবং এর বহুলপ্রচারের উপস্থিতিতে কোরআন মজীদে এ সম্পর্কে কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেবার প্রয়োজন ছিল না। এ ধরনের বিষয়গুলোকে আল্লাহর কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাও আল্লাহর রীতি নয়। তাই এখানে পরদার অন্তরালে রেখে এদিকে ইংগিতও করা হয়েছে এবং এ সংগে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসল ঘটনা কি ছিল এবং কিতাবাধারীরা তাকে কিবাবে ভিন্নরূপ দিয়েছে। কোরআন মজীদের উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে যে আসল ঘটনা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় তা হচ্ছে এই ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম উরিয়ার (অথবা এ ব্যক্তির যে নামই থেকে থাকুক) কাছে নিছক নিজের মনের এ আকাংখা পেশ করেছিলেন যে, সে যেন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। আর যেহেতু এ আকাংখা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়নি বরং একজন মহাপরাক্রমশালী শাসক এবং জবরদস্ত দ্বীনি

ahlussunnah-bd.blogspot.com

গৌরব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে প্রজামন্ডলীর একজন সদস্যের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছিল. তাই এ ব্যক্তি কোন প্রকার বাহ্যিক বল প্রয়োগ ছাড়াই তা গ্রহণ করে নেবার ব্যাপারে নিজেকে বাধ্য অনুভব করছিল। এ অবস্থায় হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামের আহবানে সাড়া দেবার জন্য তার উদ্যোগ নেবার পুর্বেই জাতির দু'জন সৎলোক অকস্মাৎ হযরত দাউদের কাছে গেলেন এবং একটি কাল্পনিক মামলার আকারে এ বিষয়টি তাঁর সামনে পেশ করলেন। প্রথমে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম মনে করেছিলেন এটি যথার্থই তাঁর সামনে পেশকৃত একটি মামলা। কাজেই মামলাটির বিবরণ শুনে তিনি নিজের ফয়সালা শনিয়ে দিলেন। কিন্তু মুখ থেকে ফায়সালার শব্দগুলো বের হবার সাথে সাথেই তাঁর বিবেক তাঁকে সতর্ক করে দিল যে, এটি একটি রূপক আকারে তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ের সাথে মিলে যায় এবং যে কাজটিকে তিনি জুলুম গণ্য করছেন তাঁর ও ঐ ব্যক্তির বিষয়ে তার প্রকাশ ঘটছে। এ অনুভূতি মনের মধ্যে সৃষ্টি হবার সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা ও তাওবা করলেন এবং নিজের ঐ কাজটি থেকেও বিরত হলেন।

বাইবেলে এ ঘটনাটি এহেন কলংকিতরূপে চিত্রিত হলো কেমন করে ? সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এ কথাটিও বুঝতে পারা যায়। মনে হয়, কোন উপায়ে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম ঐ ভদ্রমহিলার গুণাবলী জানতে পেরেছিলেন। তাঁর মনে আকাংখা জেগেছিল, এ ধরনের যোগ্যতাসম্পন্না মহিলার পক্ষে একজন সাধারণ অফিসারের স্ত্রী হয়ে থাকার পরিবর্তে রাজরাণী হওয়া উচিত। এ চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি তার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সে যেন তাকে তালাক দিয়ে দেয়। বনী ইসরাঈলী সমাজে এটা কোন নিন্দনীয় বিষয় ছিল না বলেই তিনি এতে কোন প্রকার অনিষ্টকারিতা অনুভব করেননি। তাদের সমাজে এটা অত্যন্ত মামুলি ব্যাপার ছিল যে, একজন অন্য একজনের স্ত্রীকে পছন্দ করলে নিসংকোচে তার কাছে আবদেন করতো তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও। এ ধরনের আবেদনে কারো মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতো না। বরং অনেক সময় এক বন্ধু অন্য বন্ধুকে খুশী করার জন্য নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতো। যাতে সে তাকে বিয়ে করতে পারে। কিন্তু এ কথা বলতে গিয়ে হযরত দাউদের মনে এ অনুভূতি জাগেনি যে, একজন সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা জুলুম ও বলপ্রয়োগের রূপধারণ না করতে পারে তবে একজন শাসকের পক্ষ থেকে যখন এ ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয় তখন তা বল প্রয়োগমুক্ত হতে পারেনা। উল্লেখিত রূপক মোকদ্দমার মাধ্যমে যখন এ দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হলো তখন নির্দ্বিধায় তিনি নিজের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। এভাবে একটি কথার উদ্ভব হয়েছিল এবং তার খতমও হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পরে কোন এক সময় যখন তাঁর কোন ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা ছাড়াই ঐ ভদ্রমহিলার স্বামী এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলো এবং হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম তাকে বিয়ে করে নিলেন তখন ইহুদীদের দুষ্ট মানসিকতা কল্পকাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হলো। আর বনী ইসরাঈলীদের একটি দল যখন হযরত সুলাইমানের শত্রু হয়ে গেলো তখন তাদের এ দুষ্ট মানসিকতা দ্রুত কাজ শুরু করে দিল।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এসব উদ্যোগ ও ঘটনাবলীর প্রভাবাধীনে এ কাহিনী রচনা করা হলো যে, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর প্রাসাদের ছাদের ওপর উরিয়ার স্ত্রীকে এমন অবস্থায় দেখে নিয়েছিলেন যখন তিনি উলংগ হয়ে গোসল করছিলেন। তিনি তাকে নিজের মহলে ডেকে এনে তার সাথে জিনা করলেন। এতে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি বনী আম্মোন এর মোকাবিলায় উরিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেনাপতি যোয়াবকে হুকুম দিলেন তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে এমন এক জায়গায় নিযুক্ত করতে যেখানে সে নিশ্চিতভাবে নিহত হবে। তারপর যখন সে মারা গেলো, তিনি তার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিলেন। এ মহিলার গর্ভে সুলাইমানের (আলাইহিস সালাম) জন্ম হলো। এসব মিথ্যা অপবাদ জালেমরা তাদের পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছে। এভাবে বংশ পরম্পরায় এর পাঠের ব্যবস্থা করেছে। তারা এসব পড়তে থাকবে এবং নিজেদের দু'জন শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করতে থাকবে। হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের পরে এঁরা দু'জনই ছিলেন তাদের সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক।

কোরআন ব্যাখ্যাতাগণের একটি দল তো বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে তাদের কাছে এ সম্পর্কিত যেসব কিস্সা কাহিনী এসে পৌছেছে সেগুলো হু-বহু গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্য থেকে কেবলমাত্র যে অংশটুকুতে হযরত দাউদের বিরুদ্ধে জিনার অপবাদ দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ভদ্রমহিলার গর্ভবতী হয়ে যাবার উল্লেখ ছিল সে অংশটুকু তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁদের উদ্ধৃত বাদ-বাকি সমস্ত কাহিনী বনী ইসরাঈলের সমাজে যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ঠিক সেভাবেই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় দলটি দুখীর মোকদ্দমার সাথে সামঞ্জস্য রাখে হযরত দাউদের এমন কোন কর্মতৎপরতার কথা সরাসরি অস্বীকার করেছেন। এর পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে এ কাহিনীর এমন সব ব্যাখ্যা দেন যা একেবারেই ভিত্তিহীন, যেগুলোর কোন উৎস নেই এবং কোরআনের পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথেও যার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুফাস্সিরদের মধ্যে আবার এমন একটি দলও আছে যারা সঠিক তত্ত্ব পেয়ে গেছেন এবং কোরআনের সুস্পষ্ট ইংগিতগুলো থেকে আসল সত্যটির সন্ধান লাভ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় উক্তি অনুধাবন করুন ঃ

মাসরূক ও সাঈদ ইবনে জুবাইর উভয়েই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, "হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম সে ভদ্র মহিলার স্বামীর কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করার চাইতে বেশী কিছু করেননি যে, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও।" (ইবনে জারীর)

আল্লামা যামাখশারী তাঁর কাশ্শাফ তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, 'আল্লাহ হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কাহিনীটি যে আকারে বর্ণনা করেছেন তা থেকে তো একথাই প্রকাশিত হয় যে, তিনি ঐ ব্যক্তির কাছে কেবলমাত্র এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন যে, সে তাঁর জন্য যেন তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে।"

আল্লামা আবু বকর জাসসাস এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ঐ ভদ্র মহিলা ঐ ব্যক্তির বিবাহিত স্ত্রী ছিল না বরং ছিল কেবলমাত্র তার বাগদত্তা বা তার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। হযরত দাউদ সে ভদ্র মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিলেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এর ফলে আল্লাহর ক্রোধ বর্ষিত হলো। কারণ, তিনি তাঁর মু'মিন ভাইয়ের পয়গামের ওপর পয়গাম দিয়েছিলেন। অথচ তাঁর গৃহে পূর্ব থেকেই কয়েকজন স্ত্রী ছিল। (আহকামুল কোরআন)

অন্য কয়েকজন মুফাস্‌সিরও এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ কথাটি কোরআনের বর্ণনার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য রাখে না। কোরআন মজীদে মোকদ্দমা পেশকারী মুখ নিসৃত শব্দাবলী হচ্ছে, 'আমার কাছে একটি মাত্র দুম্বী আছে এবং এ ব্যক্তি বলছে, ওটি আমাকে দিয়ে দাও।' একথাই হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর ফায়সালাও বলেছেন, 'তোমার দুম্বী চেয়ে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে।'

এ রূপকটি হযরত দাউদ ও উরিয়ার কাহিনীর সাথে তখনই খাপ খেতে পারে যখন ঐ ভদ্র মহিলা হবে তার স্ত্রী। একজনের বিয়ের পয়গামের ওপর যদি অন্যজনের পয়গাম দেবার ব্যাপার হতো তাহলে রূপকটি এভাবে বলা হতো, "আমি একটি দুম্বী নিতে চাইছিলাম কিন্তু সে বললো, ওটিও আমার জন্য ছেড়ে দাও।'

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন, "আসল ঘটনা মাত্র এতটুকুই যে, হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম তাঁর নিজের লোকদের মধ্য থেকে একজনকে বলেন, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও এবং গুরুত্ব সহকারে এ দাবী করেন। কোরআন মজীদে এ কথা বলা হয়নি যে, তাঁর দাবীর কারণে সে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে, হযরত দাউদ তারপর সে মহিলাকে বিয়ে করেন এবং তারই গর্ভে হযরত সুলাইমানের জন্ম হয়। যে কথার জন্য ক্রোধ নাযিল হয় সেটি এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তিনি এক মহিলার স্বামীর কাছে এ অভিলাস ব্যক্ত করেন যে, সে যেন তার স্ত্রীকে তাঁর জন্য ছেড়ে দেয়। এ কাজটি সামগ্রিকভাবে কোন বৈধ কাজ হলেও নবুওয়াতের মর্যাদা থেকে এটি ছিল অনেক নিম্নতর ব্যাপারে। এ জন্যই তাঁর ওপর আল্লাহর ক্রোধ নাযিল এবং তাঁকে উপদেশও দেয়া হয়।'

এখানে যে প্রেক্ষাপটে এ কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে এ তাফসীরটিই খাপ খেয়ে যায়। বক্তব্য পরম্পরা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন মজীদের এ স্থানে এ ঘটনাটি দু'টি উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবর করার উপদেশ দেয়া এবং এ উদ্দেশ্যে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, "এরা তোমার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে সে ব্যাপারে সবর করো এবং আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করো।' অর্থাৎ তোমাকে শুধুমাত্র যাদুকর ও মিথ্যুক বলা হচ্ছে কিন্তু আমার বান্দা দাউদকে তো জালেমরা ব্যভিচার ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপবাদ পর্যন্ত দিয়েছিল। কাজেই এদের কাছ থেকে তোমার যা কিছু শুনতে হয় তা বরদাশ্‌ত করতে থাকো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হচ্ছে কাফেরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তেমরা সব রকমের হিসেব-নিকেশের শংকা মুক্ত হয়ে দুনিয়ায় নানা ধরনের বাড়াবাড়ি করে যেতে থাকো কিন্তু যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে তোমরা এসব কাজ করছো তিনি কাউকেও হিসেব-নিকেশ না নিয়ে ছাড়েন না। এমনকি যেসব বান্দা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ও নৈকট্যলাভকারী হয় তাঁরাও যদি কখনো সামান্যতম ভুল-ভ্রান্তি করে বসেন তাহলে বিশ্ব-জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ তাঁদেরকেও কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন করেন। এ উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে, তাদের সামনে আমার বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা করো, যিনি ছিলেন বিচিত্র গুণধর ব্যক্তিত্বের অধিকারী কিন্তু যখন তাঁর দ্বারা একটি অসংগত কাজ সংঘটিত হলো তখন দেখো কিভাবে আমি তাকে তিরস্কার করেছি।

এ সম্পর্কে আর একটি ভুল ধারণাও থেকে যায়। এটি দূর করা জরুরী। রূপকের মাধ্যমে মোকদ্দমা পেশকারী বলছে, এ ব্যক্তির ৯৯টি দুম্বী আছে এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বী আর সেটিই এ ব্যক্তি চাচ্ছে। এ থেকে বাহ্যত এ ধারণা হতে পারে যে, সম্ভব হযরত দাউদের ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি আর একজন মহিলাকে বিয়ে করে স্ত্রীদের সংখ্যা একশত পূর্ণ করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আসলে রূপকের প্রত্যেকটি অংশের সাথে হযরত দাউদ ও হিত্তীয় উরিয়ার ঘটনার প্রত্যেকটি অংশের ওপর অক্ষরে অক্ষরে প্রযুক্ত হওয়া জরুরী নয়। চলিত প্রবাদে দশ, বিশ, পঞ্চাশ ইত্যাদি সংখ্যাগুলোর উল্লেখ কেবলমাত্র আধিক্য প্রকাশ করার জন্যই করা হয়ে থাকে, সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করার জন্য এগুলো বলা হয় না। আমরা যখন কাউকে বলি, দশবার তোমাকে বলেছি তবু তুমি আমার কথায় কান দাওনি, তখন এর মানে এ হয় না যে, গুণে গুণে দশবার বলা হয়েছে ববং এর অর্থ হয়, বারবার বলা হয়েছে। এমনি ধরনের ব্যাপার এখানে ঘটেছে। রূপকের আকারে পেশকৃত মোকদ্দমার মাধ্যমে সে ব্যক্তি হযরত দাউদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যে, আপনার তো কয়েকজন স্ত্রী আছেন এবং তারপরও আপনি অন্য ব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন।

এ কথাটিই মুফাস্‌সির নিশাপুরী হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হযরত দাউদের ৯৯টি স্ত্রী ছিল না বরং এটি নিছক একটি রূপক।'

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তো আকাশ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে জগত রয়েছে তাকে অনর্থক সৃষ্টি করিনি–অর্থাৎ নিছক খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি এর পেছনে কোন জ্ঞান প্রজ্ঞা ও নেই, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নেই, এর মধ্যে কোন ন্যায় ও ইনসাফ নেই এবং কোন ভালো ও মন্দ কাজের কোন ফল দেখা যায় না এমন নয়। এ উক্তি পেছনের ভাষণের সার-নির্যাস এবং সামনের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধন। পেছনের ভাষণের পর এ বাক্য বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এ সত্যটি শ্রোতাদের মনে বসিয়ে দেয়া যে, মানুষকে এখানে লাগাম ছাড়া উটের মতো ছেড়ে দেয়া হয়নি এবং দুনিয়াতে যার যা মন চাইবে তাই করে যেতে থাকবে এ জন্য কারো কাছে কোন জবাবদিহি করতে হবে না এমন কোন শাসকহিবীন অবস্থাও এখানে চলছে না। সামনের দিকের বিষয়বস্তুর মুখবন্ধ হিসেবে এ বাক্য থেকে বক্তব্য শুরু করে একথা বুঝানো হয়েছে যে, যে ব্যক্তি শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করে না এবং নিজে এ কথা মনে করে বসেছে যে, সৎকর্মকারী ও দুষ্কৃতকারী উভয়ই শেষ পর্যন্ত মরে মাটি হয়ে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

যাবে, কাউকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, ভালো বা মন্দ কাজের কেউ কোন প্রতিদান পাবে না সে আসলে দুনিয়াকে একটি খেলনা এবং এর সৃষ্টিকর্তাকে একজন খেলোয়াড় মনে করে। সে আরো মনে করে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা দুনিয়া সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করে একটি অর্থহীন কাজ করেছেন।

এ কথাটিই কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন, 'তোমরা কি মনে করেছো আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না।' (আল মু'মিনূন, ১১৫)

'আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে এবং তাদের মাঝখানে যে বিশ্ব-জাহান রয়েছে তাদেরকে খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি তাদেরকে সত্য সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। আসলে চূড়ান্ত বিচারের দিনে তাদের সবার জন্য উপস্থিতির সময় নির্ধারিত রয়েছে।' (আদ দুখান, ৩৮-৪০)

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, মুত্তাকীদেরকে কি আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো করে দেবো–অর্থাৎ সৎ ও অসৎ উভয় শেষ পর্যন্ত সমান হয়ে যাবে একথা কি তোমাদের মতে যুক্তিসংগত ? কোন সৎলোক তার সততার কোন পুরস্কার পাবে না এবং কোন অসৎলোক তার অসৎ কাজের শাস্তি ভোগ করবে না, এ ধারণায় কি তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো ? একথা সুস্পষ্ট, যদি আখেরাত না থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার জবাবদিহি না হয় এবং মানুষের কাজের কোন পুরস্কার ও শাস্তি না দেয়া হয় তাহলে এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ইনসাফ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থা একটি অরাজক ব্যবস্থায় পরিণত হয়। এ ধারণার ভিত্তিতে বিচার করলে দুনিয়ায় আদৌ সৎকাজের কোন উদ্যোক্তা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার জন্য কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব (নাউযুবিল্লাহ) যদি এমনি অরাজক ব্যাপার হয় তাহলে এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে নিজে সৎ জীবন যাপন করে এবং মানুষের সংস্কার সাধনের কাজে আত্মনিয়োগ করে সেই বড়ই নির্বোধ। আর যে ব্যক্তি অনুকুল সুযোগ-সুবিধা পেয়ে সব রকমের বাড়াবাড়ি করে লাভের ফল কুড়াতে থাকে এবং সব ধরনের ফাসেকী ও অশালীন কার্যকলাপের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতে থাকে সে বুদ্ধিমান।

উল্লেখিত আয়াতে বরকত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বরকতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি।" কোরআন মজীদকে বরকত সম্পন্ন কিতাব বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, এটি মানুষের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী কিতাব। এ কিতাবটি তার জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সর্বোত্তম বিধান দান করে। এর বিধান মেনে চলায় মানুষের লাভই হয় কেবল, কোন প্রকার ক্ষতির আংশকা নেই।

হযরত সোলাইমান সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা

আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামকে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছিলেন। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষনীয় ঘটনাবলীতে তাঁর ইতিহাস পরিপূর্ণ।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পক্ষান্তরে তাঁর সম্পর্কে সমাজে নানা ধরণের বিভ্রান্তি ছড়িয়ে রয়েছে। পবিত্র কোরআনের মোকাবিলায় সেসব কাহিনীর কোনই মূল্য নেই। মহান আল্লাহ তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ-

ولقد فتنا سليمن والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب- قال رب اغفرلى وهب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى-انك انت الوهاب-فسخرنا له الريح تجرى بامره رخاء حيث اصاب-والشيطين كل بناء وغواص-واخرين مقرنين فى الاصفاد-هذا عطاؤنا فامنن اوامسك بغير حساب-وان له عند نا لزلفى وحسن ماب (ص)

আর (দেখো) সোলাইমানকেও আমি পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনে নিক্ষেপ করেছি একটি শরীর। তারপর সে রুজু করলো এবং বললো, হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না; সিঃন্দেহে তুমি আসল দাতা।" তখন আমি বাতাসকে তার জন্য অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে যেদিকে সে চাইতো মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো। আর শয়তানদেরকে বিজিত করে দিয়েছি, সব ধরনের গৃহনির্মাণ কারিগর ও ডুবুরী এবং অন্য যারা ছিল শৃংখলিত। (আমি তাকে বললাম) "এ আমার দান, তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, যাকে চাও তাকে দাও এবং যাকে চাও না তাকে দেয়া থেকে বিরত থাকো, কোন হিসেব নেই। অবশ্যই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। (সূরায়ে সা-দ, আয়াত নম্বর ৩৪-৪০)

হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না; সিঃন্দেহে তুমি আসল দাতা-বক্তব্যের ধারবাহিকতা অনুসারে এখানে একথা বলাই মূল উদ্দেশ্য এবং পেছনের আয়াতগুলো এরই জন্য মুখবন্ধ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন প্রথমে হযরত দাউদের প্রশংসা করা হয়েছে, তারপর যে ঘটনার ফলে তিনি ফিতনার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন সেটি উল্লেখ করা হয়েছে, এ কথা বলা হয়েছে যে, মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজের এত প্রিয় বান্দাকেও জবাবদিহি না করে ছাড়েননি, তারপর তাঁর এ কার্যক্রম দেখান যে, ফিত্না সম্পর্কে সজাগ করে দেবার সাথে সাথেই তিনি তাওবা করেন এবং আল্লাহর

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সামনে মাথা নত করে নিজের ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে ফিরে আসেন, অনুরূপভাবে এখানেও বক্তব্য বিন্যাস এভাবে করা হয়েছে ঃ প্রথমে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের উচ্চ মর্যাদা ও মহিমান্বিত বন্দেগীর কথা বলা হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, তাঁকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল, তারপর তাঁর বন্দেগীর এ কৃতিত্ব দেখান যে, যখন তাঁর সিংহাসনে একটা দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়া হয় তখন সংগে সংগেই তিনি নিজের পদস্খলন সম্পর্কে সজাগ হন, নিজের রবের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যে কথার জন্য তিনি ফিত্নার সম্মুখীন হয়েছিলেন নিজের সে কথা ও কার্যক্রম থেকে ফিরে আসেন। অন্য কথায় বলা যায়, এ দু'টি কাহিনী থেকে আল্লাহ একই সংগে দু'টি কথা বুঝাতে চান। এক, তার নিরপেক্ষ সমালোচনা, পর্যালোচনা ও জবাবদিহি থেকে সাধারণ তো দূরের কথা নবীরাও বাঁচতে পারেননি। দুই, অপরাধ করে ঘাড় বেঁকিয়ে থাকা বান্দার জন্য সঠিক কর্মনীতি নয়। বরং তার কাজ হচ্ছে যখনই সে নিজের ভুল অনুভব করতে পারবে তখনই বিনীতভাবে নিজে রবের সামনে ঝুঁকে পড়বে। এ কর্মনীতিরই ফল স্বরূপ মহান আল্লাহ এ মনীষীদের পদস্খলনগুলো কেবল ক্ষমাই করে দেননি বরং তাঁদের প্রতি আরো বেশী দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন।

এখানে আবার এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম যে ফিত্নার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি কেমন ফিত্না ছিল ? তাঁর আসনের ওপর একটি দেহবরয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ কি ? এ দেহাবয়ব এনে তাঁর আসনে ফেলে দেয়া তাঁর জন্য কোন্ ধরনের সতর্কীকরণ ছিল যার ফলে তিনি তাওবা করেন ? এর জবাবে মুফাস্সিরগণ চারটি ভিন্ন ভিন্ন মত অবলম্বন করেছেন।

একটি দল একটি বিরাট কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে আবার বহু ধরনের মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাদের সবার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ হযরত সুলাইমানের থেকে এই ত্রুটি সংঘটিত হয়েছিল যে, তাঁর মহলে এক বেগম সাহেবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন এবং ব্যাপারে বেখবর। অথবা তিনি কয়েকদিন পর্যন্ত গৃহমধ্যে বসেছিলেন এবং কোন মজলুমের ফরিয়াদ শুনেননি। এর ফলে তিনি যে শাস্তি পেয়েছিলেন তা ছিল এই যে, এক শয়তান যে কোনভাবেই তাঁর এমন একটি অংটি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যার বদৌলতে তিনি জিন ও মানুষ জাতি এবং বাতাসের ওপর রাজত্ব করতেন। আংটি হাতছাড়া হয়ে যেতেই হযরত সুলাইমানের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব খতম হয়ে গিয়েছিল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন। সুলাইমানের সিংহাসনে একটি দেহাবয়ব এনে ফেলে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাঁর সিংহাসনে উপবেশনকারী এই শয়তান। কেউ কেউ একথাও বলে ফেলেছেন যে, সে সময় এই শয়তানের হাত থেকে সুলাইমানের হারেমের মহিলাদের সতীত্বও সংরক্ষিত থাকেনি।

শেষ পর্যন্ত দরবারের আমাত্যবর্গ, পারিষদ ও উলামায়ে কেরামের মনে তার কার্যকলাপ দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হলো এবং তারা মনে করতে থাকলেন, এ ব্যক্তি

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সোলাইমান নয়। কাজেই তারা তার সামনে তাওরাত খুলে মেলে ধরলেন এবং সে ভয়ে পালিয়ে গেলো। পথে তার হাত থেকে আংটি খুলে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলো অথবা সে নিজেই তা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো। একটি মাছ তা গিলে ফেললো। ঘটনাক্রমে সে মাছটি হযরত সুলাইমানের হস্তগত হলো। মাছটি রান্না করার জন্য তিনি তার পেট কেটে ফেললেন। সেখান থেকে আংটি বের হয়ে পড়লো। আংটি হাতে আসার সাথে সথেই জিন, মানুষ ইত্যাদি সবাই সালাম করতে করতে তাঁর সামনে হাজির হয়ে গেলো।

এ পুরো কাহিনীটিই ছিল একটি পৌরানিক গালগল্প। নওমুসলিম আহ্‌লি কিতাবগণ তালমুদ ও অন্যান ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করে এটি মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদের বড় বড় পণ্ডিতগণ একে কোরআনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা মনে করে নিজেদের ভাষায় এগুলো বর্ণনা করেছেন। অথচ সুলাইমানের আংটির কোন সত্যতা নেই। হযরত সুলাইমানের কৃতিত্ব কোন আংটির ভেল্কিবাজি ছিল না। শয়তানদেরকেও আল্লাহ নবীদের আকৃতি ধরে আসার ও মানুষকে গোমরাহ করার ক্ষমতা দেননি। তাছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে এমন কোন ধারণাও করা যেতে পারে না যে, তিনি কোন নবীর কোন ভুলের শাস্তি এমন ফিত্‌নার আকৃতিতে দান করবেন যার ফলে শয়তান নবী হয়ে একটি উম্মাতের সমগ্র জনগোষ্ঠীর সর্বনাশ করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, কোরআন নিজেই এ তাফসীরের প্রতিবাদ করছে। সামনের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, হযরত সোলাইমান যখন এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন এবং তিনি আমার কাছে ক্ষমা চান তখন আমি বায়ু ও শয়তানদের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে দিলাম। কিন্তু এ তাফসীর এর বিপরতীতে একথা বলছে যে, আংটির কারণে শয়তানরা পূর্বেই হযরত সুলাইমানের হুকুমের অনুগত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, যেসব মনীষী এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন তাঁরা পরবর্তী আয়াত কি বলছে তা আর দেখেননি।

দ্বিতীয় দলটি বলেন, ২০ বছর পর হযরত সুলাইমানের একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। শয়তানরা বিপদ গণে। তারা মনে করে যদি হযরত সুলাইমানের পর তাঁর এ পুত্র বাদশাহ হয়ে যায় তাহলে তাদেরকে আবার একই গোলামীর জিঞ্জির বহন করে চলতে হবে। তাই তারা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। হযরত সোলাইমান একথা জানতে পারেন। তিনি পুত্রকে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন। সেখানেই তার লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন। এটিই ছিল সেই ফিত্‌না যার সম্মুখীন তিনি হয়েছিলেন। অর্থাৎ আল্লাহর ওপর ভরসা করার পরিবর্তে তিনি মেঘের হেফাজতের ওপর ভরসা করেছিলেন। এর শাস্তি তাঁকে এভাবে দেয়া হয় যে, সে শিশুটি মরে গিয়ে তাঁর সিংহাসনের ওপর এসে পড়ে। এ কাহিনীটিও আগাগোড়া ভিত্তিহীন ও উদ্ভট এবং স্পষ্ট কোরআন বিরোধী। কারণ এখানেও ধারণা করে নেয়া হয়েছে যে, বায়ু ও শয়তানরা পূর্ব থেকেই হযরত সুলাইমানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অথচ কোরআন পরিষ্কার ভাষায় তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন হবার ব্যাপারটিকে এ ফিত্‌নার পরবর্তীকালের ঘটনা বলে উল্লেখ করছে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তৃতীয় দলটি বলেন, একদিন হযরত সোলাইমান কসম খান, আজ রাতে আমি সত্তরজন স্ত্রীর কাছে যাবো এবং প্রত্যেকের গর্ভে একজন করে আল্লাহর পথের মুজাহিদ জন্ম দেব। কিন্তু একথা বলতে গিয়ে তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি। এর ফলে মাত্র একজন স্ত্রী গর্ভবতী হয় এবং তাঁর গর্ভেও একটি অসমাপ্ত ও অপরিপক্ক শিশুর জন্ম হয়। ধাত্রী শিশুটিকে এনে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর ফেলে দেয়। এ হাদীসটি হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফেই এ হাদীসটি যেসব রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে স্ত্রীদের সংখ্যা বলা হয়েছে ৬০, কোনটিতে ৭০, কোনটিতে ৯০, কোনটিতে ৯৯ আবার কোনটিতে ১০০ ও বলা হয়েছে। সনদের দিক দিয়ে এর মধ্যে থেকে অধিকাংশই শক্তিশালী এবং রেওয়ায়াত হিসেবে এগুলোর নির্ভুলতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করা যেতে পারে না।

কিন্তু এ হাদীসের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী। এর ভাষা বলছে, একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো এভাবে বলেননি যেভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বরং তিনি সম্ভবত ইহুদীদের মিথ্যা ও অপবাদমূলক কিচ্ছা-কাহিনীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কোন পর্যায়ে একে এভাবে উদাহরণস্বরূপ বর্ণনা করে থাকবেন এবং শ্রোতার মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ ঘটনা বর্ণনা করছেন। এ ধরনের রেওয়ায়াতকে নিছক শক্তির মাধ্যমে লোকদের হজম করাবার চেষ্টা করানো ইসলামকে হাস্যাস্পদ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই হিসেব কষে দেখতে পারেন, শীতের দীর্ঘতম রাত ও এশা থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত দশ এগোরো ঘন্টার বেশী সময় হয় না। যদি স্ত্রীদের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০ জন বলে মেনে নেয়া যায়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায়, সেই রাতে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম কোন প্রকার বিশ্রাম না নিয়েই। অবিরাম ১০ বা ১১ ঘন্টা ধরে প্রতি ঘন্টায় ৬ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে থেকেছেন। কার্যত এটা কি সম্ভব ? আর এ কথাও কি আশা করা যেতে পারে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তব ঘটনা হিসেবে এ কথাটি বর্ণনা করে থাকবেন ? তারপর হাদীসে কোথাও একথা বলা হয়নি যে, কোরআন মজীদে হযরত সুলাইমানের আসনের ওপর যে দেহাবয়বটি ফেলে রাখার কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এ অপরিণত শিশু। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনাটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন তা বলা যায় না। তাছাড়া এ সন্তানের জন্মের পর হযরত সুলাইমানের ইস্‌তিগ্‌ফার করার কথা তো বোধগম্য হতে পারে কিন্তু তিনি ইস্‌তিগ্‌ফারের সাথে সাথে "আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করো যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভীয় নয়"-এ দোয়াটি কেন করেছিলেন তা বোধগম্য নয়।

এর আর একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং ইমাম রাযী এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে হযরত সোলাইমান কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন অথবা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কোন বিপদের কারণে এত বেশী চিন্তান্বিত ছিলেন যার ফলে তিনি শুকাতে শুকাতে হাড্ডি চর্মসার হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি কোরআনের শব্দের সাথে সাম সাশীল নয়। কোরআনের শব্দাবলী হচ্ছে, 'আমি সোলাইমানকে পরীক্ষায় ফেলে দিলাম এবং তার আসনের ওপর একটি দেহাবয়ব নিক্ষেপ করলাম তারপর সে ফিরে এলো।' এ শব্দগুলো পড়ে কোন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে না যে, এ দেহাবয়ব বলতে হযরত সোলাইমানকেই বুঝানো হয়েছে। এ থেকে তো পরিষ্কার জানা যায়, এ পরীক্ষার সম্মুখীন করার মূলে হযরত সুলাইমানের কোন ভুলচুক বা পদস্খলন ছিল। এ ভুলচুকের কারণে তাঁকে সতর্ক করে জানিয়ে দেয়া হয় যে, আপনার আসনের ওপর একটি দেহ এনে ফেলে দেয়া হয়েছে। এর ফলে নিজের ভুলচুক বুঝতে পেরে তিনি ফিরে আসেন।

আসলে এটি কোরআন মজীদের জটিলতম স্থানগুলোর মধ্যে একটি। চূড়ান্তভাবে এর ব্যাখ্যা করার মতো কোন নিশ্চিত বুনিয়াদ আমাদের কাছে নেই। কিন্তু হযরত সুলাইমানের দোয়ার এ শব্দাবলী, 'হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দিন এবং আমাকে এমন রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করুন যা আমার পরে আর কারোর জন্য শোভনীয় নয়" যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পড়া যায় তাহলে আপাত দৃষ্টে অনুভূত হবে, তাঁর মনে সম্ভবত এ আকাংখা ছিল যে, তাঁর পরে তাঁর ছেলে হবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং শাসন ও রাষ্ট্র কর্তৃত্ব আগামীতে তাঁর পরিবারের মধ্যে অব্যাহত থাকবে। এ জিনিসটিকেই আল্লাহ তার পুত্র যুবরাজ রাজুবয়াম এমন এক অযোগ্য তরুণ হিসেবে সামনে এসে গিয়ছিল যার আচরণ পরিষ্কার বলে দিচ্ছিল যে, সে দাউদ ও সোলাইমান আলাইহিমাস সালামের সম্রাজ্য চারদিনও টিকিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁর আসনে একটি দেহ নিক্ষেপ করার ভাবার্থ সম্ভবত এই হবে যে, যে পুত্রকে তিনি সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল একটি অযোগ্য পুত্র। এ সময় তিনি নিজের আকাংখা পরিহার করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ মর্মে আবদেন জানান যে, এ বাদাশাহী যেন আমার পর শেষ হয়ে যায় এবং আমার পরে আমার বংশের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অব্যাহত রাখার আকাংখা আমি প্রত্যাহার করলাম। বনী ইসরাঈলের ইতিহাস থেকেও একথাই জানা যায় যে, হযরত সোলাইমান নিজের পরে আর কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য অসিয়াত করে যাননি এবং কারো আনুগত্য করার জন্য লোকদেরকে বাধ্যও করেননি। পরবর্তীকালে তাঁর রাষ্ট্রীয় পারিষদবর্গ রাজুবয়ামকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু সামান্য কিছুদিন যেতে না যেতেই বনী ইসরাঈলের দশটি গোত্র উত্তর ফিলিস্তিনের এলাকাটি নিয়ে আলাদা হয়ে যায় এবং একমাত্র ইয়াহুদা গোত্র বাইতুল মাকদিসের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

তখন আমি বাতাসকে তার জন্য অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে যেদিকে সে চাইতো মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো–সূরা আল আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবে এখানে একটি কথা সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে, সূরা আর আম্বিয়ার সেখানে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত করার কথা বলা হয়েছে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সেখানে 'প্রবল বায়ু' শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে সে একই বাতাস সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'তার হুকুমে সে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হতো'। এর অর্থ হচ্ছে, সে বাতাস মূলত প্রবল ছিল যেমন বাতাস চালিত জাহাজ চালাবার জন্য প্রবল বায়ুর প্রয়োজন হয়, কিন্তু হযরত সুলাইমানের জন্য তাকে এ অর্থে মৃদুমন্দ করে দেয়া হয়েছিল যে, তাঁর বাণিজ্য বহর যেদিকে ভ্রমণ করতে চাইতো সেদিকেই তা প্রবাহিত হতো।

আর শয়তানদেরকে বিজিত করে দিয়েছি, সব ধরনের গৃহনির্মাণ কারিগর ও ডুবুরী এবং অন্য যারা ছিল শৃংখলিত–শয়তান বলতে জিন বুঝানো হয়েছে। আর শৃংখলিত জিন বলতে এমনসব সেবক জিন বুঝানো হয়েছে যাদেরকে বিভিন্ন দুষ্কর্মের কারণে বন্দী করা হতো। যেসব বেড়ী ও জিঞ্জির দিয়ে এ জিনগুলোকে বাঁধা হতো সেগুলো লোহা নির্মিত হওয়া এবং বন্দীদেরকেও মানুষদের মতো প্রকাশ্যে শৃংখলিত দেখতে পাওয়াও অপরিহার্য ছিল না। মোটকথা তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দী করা হতো যার ফলে তারা পালিয়ে যাবার ও কুকর্ম করার সুযোগ পেতো না।

এ আমার দান, তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হচ্ছে, যাকে চাও তাকে দাও এবং যাকে চাও না তাকে দেয়া থেকে বিরত থাকো, কোন হিসেব নেই–এ আয়াতের তিনটি অর্থ হতে পারে। এক, এটি আমার বেহিসেব দান। তুমি যাকে ইচ্ছা দিতে পারো, যাকে ইচ্ছা না-ও দিতে পারো। দুই, এটি আমার দান। যাকে ইচ্ছা দাও এবং যাকে ইচ্ছা না দাও, দেয়া বা না দেয়ার জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না। কোন কোন মুফাস্‌সির এর আরো একটি অর্থ করেছেন। সেটি হচ্ছে, এ শয়তানদেরকে পুরোপুরি তোমার অধীনে দিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্য থেকে যাকে চাও মুক্তি দিয়ে দাও এবং যাকে চাও তাকে আটকে রাখো, এ জন্য তোমাকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না।

অবশ্যই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম–এখানে একথা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানিয়ে দেয়া যে, বান্দার অংহকার আল্লাহর কাছে যত বেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় তার দীনতা ও বিনয়ের প্রকাশ তাঁর কাছে তত বেশী প্রিয়। বান্দা যদি অপরাধ করে এবং সতর্ক করার কারণে উলটো আরো বেশী বাড়াবাড়ি করে, তাহলে এর পরিণাম তাই হয় যা এই সূরার সামনের দিকে আদম আলাইহিস্ সালাম ও ইবলিসের কাহিনীতে বর্ণনা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে বান্দার যদি সামান্য পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে তাওবা করে দীনতা সহকারে তার রবের সামনে মাথা নত করে, তাহলে তার প্রতি এমন সব দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা হয়, যা ইতিপূর্বে দাউদ ও সোলাইমান আলাইহিস সালামের ওপর প্রদর্শিত হয়। হযরত সোলাইমান ইস্‌তিগ্‌ফারের পরে যে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ তাকে অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করেন এবং বাস্তবে তাঁকে এমন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করেন যা তাঁর পূর্বে কেউ লাভ করেনি এবং তাঁর পরে আজো পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। বায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জিনদের ওপর কর্তৃত্ব এ দু'টি এমন ধরনের অসাধারণ শক্তি যা মানুষের ইতিহাসে একমাত্র হযরত সোলাইমানকেই দান করা হয়েছে। অন্য কাউকে এর কোন অংশ দেয়া হয়নি।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আল্লাহর নবী হযরত আইয়ুব

আলাইহিস সালাম

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর ব্যক্তিত্ব, সময়, জাতীয়তা সব বিষয়েই মতবিরোধ আছে। আধুনিক যুগের মুফাস্‌সিরগণের মধ্য থেকে কেউ তাঁকে ইসরাঈলী গণ্য করেন। কেউ বলেন, তিনি মিশরীয় আবার কেউ বলেন আরব ছিলেন। কারো মতে, তিনি ছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর পূর্ববর্তীকালের লোক। কেউ বলেন তিনি হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও সোলাইমান আলাইহিস সালাম-এর আমলের লোক। আবার কেউ তাঁকে তাঁদেরও পরবর্তীকালের নবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে সংযোজিত ইয়োব তথা আইয়ুবের সিফ্‌র বা আইয়ুবের সহীফায় এ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা এসেছে। তার ভাষা, বর্ণনা ভংগী ও বক্তব্য দেখে গবেষকদের মধ্যে বিভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এই ইয়োব না আইয়ুবের সহীফার অবস্থা হচ্ছে এই যে, এর বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্য এবং এর বর্ণনা কোরআন মজীদের বর্ণনা থেকে এত বেশী ভিন্নতর যে, উভয়কে এক সাথে মেনে নেয়া যেতে পারে না। সুতরাং আমরা সে বর্ণনার ওপর একটুও নির্ভর করতে পারি না। বড় জোর নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য যদি কিছু হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, ইয়াসইয়াহ (যিশাইয়) নবী ও হিয্‌কীইল (যিহিষ্কেল) নবীর সহীফায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সহীফা দু'টি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য।

ইয়াসইয়াহ নবী খৃষ্টপুর্ব অষ্টম এবং হিয্‌কীইল নবী খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে অতিক্রান্ত হয়েছেন। তাই নিশ্চয়তা সহকারে বলা যেতে পারে যে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম খৃষ্টপূর্ব নবম শতক বা এরও পূর্বের নবী ছিলেন। তাঁর জাতীয়তা সম্পর্কে বলা যেতে পারে, সূরা নিসার ১৬৩ ও সুরা আনআমের ৮৪ আয়াতে যেভাবে তাঁর আলোচনা এসেছে তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তিনি বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ওহাব ইবনে মুনাব্‌বিহের এ বর্ণনাও একেবারে অযৌক্তিক নয় যে, তিনি হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর পুত্র ঈসূর বংশধর ছিলেন।

পবিত্র কোরআনে তাঁর সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত আলোচনা আসেনি। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আলোচনা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ-

وايوب اذنادى ربه انى مسنى الضر وانت ارحم الرحمين-فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتينه اهله ومثلهم معهم رحمة من عند نا وذكرى للعبدين (الانبياء)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ুবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো, "আমি রোগগ্রস্ত হয় গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।" আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম এবং শুধুমাত্র তার পরিবার পরিজনই তাকে দেইনি বরং এই সাথে এ পরিমাণ আরো দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এ টা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য। (সূরায়ে আল্ আম্বিয়া, আয়াত নম্বর ৮৩-৮৪)

হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর দোয়ার ধরণ অত্যন্ত পবিত্র, সূক্ষ্ম ও নমনীয়! সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে নিজের কষ্টের কথা বলে যাচ্ছেন এবং এরপর একথা বলেই থেমে যাচ্ছেন, 'তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' পরে কোন অভিযোগ ও নালিশ নেই, দোয়ার এই ভঙ্গিমা যে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন চিত্রটি তুলে ধরে তা হচ্ছে এই যে, কোন পরম ধৈর্যশীল, অল্পে তুষ্ট, ভদ্র ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি দিনের পর দিন অনাহার ক্লিষ্টতার দুঃসহ জ্বালায় ব্যাকুল হয়ে কোন পরমদাতা ও দয়ালু ব্যক্তির সামনে কেবলমাত্র এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়ে যায়, "আমি অনাহারে আছি এবং আপনি বড়ই দানশীল।" এরপর সে আর মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারে না।

আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম–সুরা সাদের চতুর্থ রুকূ'তে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে বলেন, 'নিজের পা দিয়ে আঘাত করো, এ ঠাণ্ডা পানি মজুদ আছে গোসল ও পান করার জন্য।'

এই আয়াত থেকে জানা যায়, মাটিতে পা ঠুকবার সাথে সাথেই আল্লাহ তাঁর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন। সে ঝরণার পানির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ পানি পান ও এতে গোসল করার সাথে সাথেই তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান। এ রোগ নিরাময়ে এদিকে ইংগিত করে যে, তাঁর কোন মারাত্মক চর্মরোগ হয়েছিল। বাইবেলের বর্ণনাও এর সমর্থক। বাইবেল বলছে, তাঁর সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফোঁড়ায় ভরে গিয়েছিল। (ইয়োব ২ ঃ ৭)

হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, তাঁর ঘটনা ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়, যারা আমার দাসত্ব করে। আমার যারা ইবাদাত করে তাদের জন্য আমার এই নবী আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম-এর মধ্যে অনেক কিছুর শিক্ষার রয়েছে। পবিত্র কোরআনে হযরত আইয়ুব আলাইহিস্ সালাম-এর যে যৎ সামান্য ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে, এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে কোরআন মজীদ হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-কে এমনভাবে পেশ করেছে যার ফলে তাঁকে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মনে হয়। এরপর কোরআন বলছে, তাঁর জীবন ইবাদাতকারীদের জন্য একটি আদর্শ।

অন্যদিকে বাইবেলের আইয়ুবের সহীফা (ইয়োব) পড়লে সেখানে এমন এক ব্যক্তির ছবি ফুটে উঠবে যিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগে সোচ্চার এবং নিজের

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বিপদের জন্য আপাদমস্তক ফরিয়াদী হয়ে আছেন। বারবার তাঁর মুখ থেকে এ বাক্যটি নিঃসৃত হচ্ছে, 'বিলুপ্ত হোক সেদিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছিল, আমি কেন গর্ভে মরে যাইনি ? মায়ের পেট থেকে বের হওয়া মাত্র আমি কেন প্রাণত্যাগ করিনি ?'

বারবার তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, 'সর্বশক্তিমানের বান আমার ভিতরে প্রবিষ্ট, আমার আত্মা তাঁরই বিষপান করছে, ঈশ্বরীয় ত্রাসদল আমার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ, হে মনুষ্য দর্শক ! আমি যদি পাপ করে থাকি, তবে আমার কর্মে তোমার কি হয় ? তুমি কেন আমাকে তোমার শর লক্ষ্য করেছো ? আমিতো আপনার ভার আপনি হয়েছি। তুমি আমার অধর্ম ক্ষমা করনা কেন ? আমার অপরাধ দূর কর না কেন ? আমি ঈশ্বরকে বলবো আমাকে দোষী করো না; আমাকে বল আমার সাথে কি কারণে বিবাদ করছো। এটা কি ভার যে, তুমি উপদ্রব করবে ? তোমার হস্তনির্মিত বস্তু তুমি তুচ্ছ করবে ? দুষ্টগণের মন্ত্রণায় প্রসন্ন হবে?'

তাঁর তিন বন্ধু এসে তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং ধৈর্য, আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টিলাভ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি কোন কথা শুনেন না। তিনি তাদের পরামর্শের জবাবে আল্লাহর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ আনতে থাকেন এবং তাদের শত বুঝাবার পরও জোর দিয়ে বলতে থাকেন যে, আল্লাহর এ কাজের মধ্যে কোন প্রজ্ঞা ও কল্যাণ নেই, আছে শুধু একটা জুলুম, যা আমার মতো মুত্তাকী ও ইবাদাতকারী ব্যক্তির প্রতি করা হচ্ছে। তিনি আল্লাহর ব্যবস্থাপনার কঠোর সমালোচনা করেন এই বলে যে, একদিকে দুস্কৃতকারীদেরকে অনুগৃহীত করা হয় এবং অন্যদিকে সুকৃতিকারীদেরকে জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ করা হয়। নিজের সৎকর্মগুলোকে তিনি এক এক করে গণনা করেন তারপর এর প্রতিদানে আল্লাহ তাঁকে যেসব কষ্ট দিয়েছেন সেগুলো বর্ণনা করতে থাকেন এবং এরপর বলেন, আল্লাহর কাছে যদি কোন জবাব থাকে তাহলে তিনি বলুন কোন্ অপরাধের শাস্ত হিসেবে আমার সাথে এ ব্যবহার করা হয়েছে ?

নিজের স্রষ্টা ও প্রভুর বিরুদ্ধে তাঁর এ অভিযোগ ধীরে ধীরে এত বেশী বেড়ে যেতে থাকে যে, শেষে তাঁর বন্ধুরা তার কথার জবাব দেয়া বন্ধ করে দেন। তারা চুপ করে যান। তখন চতুর্থ এক ব্যক্তি, যিনি তাঁদের কথা নিরবে শুনছিলেন, মাঝখান থেকে হস্তক্ষেপ করেন এবং আইয়ুবকে এ ব্যাপারে ভীষণভাবে তিরস্কার করতে থাকেন যে, "তিনি তো আল্লাহকে নয় বরং নিজেকে সঠিক গণ্য করছেন।" এ ভাষণ শেষ হবার আগেই মাঝখান থেকে আল্লাহ নিজেই বলে ওঠেন এবং তারপর তাঁর ও আইয়ুবের মধ্যে খুব মুখোমুখি বিতর্ক হতে থাকে! এ পুরো কাহিনীটি পড়তে পড়তে আমরা একবারও অনুভব করি না যে, আমরা এমন এক অতুলনীয় ধৈর্যশীল নবীর অবস্থা ও কথা পড়ছি যার চিত্র কোরআন ইবাদাতকারীদের জন্য শিক্ষণীয় ও আদর্শ হিসেবে পেশ করেছেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, এ পুস্তকের প্রথমাংশ এক ধরনের কথা বলে, মাঝখানের অংশ বলে ভিন্ন কথা এবং শেষে ফলাফল দেখা যায় সম্পূর্ণ অন্য কিছু। এ তিন

অংশের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য নেই। প্রথম অংশ বলে, আইয়ুব একজন বড়ই সত্যনিষ্ঠ, খোদাভীরু ও কুকর্ম ত্যাগকারী সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। এই সংগে তিনি এতই ধনাঢ্য ছিলেন যে, "পূর্ব দেশের লোকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড়লোক।" একদিন আল্লাহর কাছে তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর নিজের) পুত্রগণ হাজির হন। তাদের সাথে শয়তানও আসে। আল্লাহ সেই মজলিসে তাঁর বান্দা আইয়ুবের জন্য গর্ব করেন। শয়তান বলে, আপনি তাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তারপর সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আর কি করবে ? তার প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন সেগুলো একবার ছিনিয়ে নেন তারপর দেখুন সে যদি আপনার মুখের ওপর আপনাকে অস্বীকার না করে থাকে তাহলে আমার নাম শয়তান নয়।

আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে তার সব কিছু তোমার হস্তগত করে দেয়া হচ্ছে, শুধুমাত্র তার শারীরিক কোন ক্ষতি করো না। শয়তান গিয়ে আইয়ুবের সমস্ত ধন-দওলত ও পরিবার পরিজন ধ্বংস করে দেয়। আইয়ুব সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধুমাত্র একাই থেকে যান। কিন্তু এতে আইয়ুবের মনে কোন দুঃখ ও ক্ষোভ জাগেনি। তিনি আল্লাহকে সিজদা করেন এবং বলেন, "আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলংগ এসেছি এবং উলংগই ফিরো যাবো; খোদাই দিয়েছেন আবার খোদাই নিয়েছেন, খোদার নাম ধন্য হোক।"

আবার এক দিন আল্লাহর দরবারে একই ধরনের একটি মজলিস বসে। তাঁর ছেলেরা আসে, শয়তানও আসে। আল্লাহ শয়তানকে বলেন, আইয়ূব কেমন সত্যনিষ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে দেখে নাও। শয়তান বলে, আচ্ছা, জনাব, তার শরীরকে একবার বিপদগ্রস্থ করে দেখুন সে আপনার মুখের ওপর আপনার কুফরী করবে। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে যাও, তাকে তোমার হাতে দেয়া হচ্ছে, তবে তার প্রাণটি যেন সংরক্ষিত থাকে। অতপর শয়তান ফিরে যায়। সে "আইয়ুবকে মাথার চাঁদি থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়ায় ভরে দেয়।" তার স্ত্রী তাকে বলে, 'এখনো কি তুমি তোমার সত্যনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ? আল্লাহকে অমান্য করো এবং প্রাণত্যাগ করে। তিনি জবাব দেন, "তুমি মূঢ়া স্ত্রীর মতো কথা বলছো। আমরা কি আল্লাহর কাছে থেকে শুধু সুখ পাবো, দুঃখ পাবো না।"

এ হচ্ছে আইয়ূবের সহীফার (ইয়োব পুস্তক) প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার। কিন্তু এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে একটি ভিন্নতর বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। এটি বিয়াল্লিশতম অধ্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এসব অধ্যায়ে হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর ধৈর্যহীনতা এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও দোষারোপের একটি ধারাবাহিক কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। তা থেকে একথা পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে যায় যে, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর সম্পর্কে আল্লাহর অনুমান ভুল ও শয়তানের অনুমান সঠিক ছিল। তারপর বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ের শেষের দিকে আল্লাহর সাথে একচোট তর্ক বিতর্ক করার পর ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও তারওয়াক্কুলের ভিত্তিতে নয় বরং আল্লাহর তিরস্কার ও ধমক খেয়ে আইয়ুব তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন এবং

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তিনি তা গ্রহণ করে তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দেন। এরপর পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী সম্পদ তাকে দান করেন।

এ শেষ অংশটি পড়তে গিয়ে মনে হবে আইয়ুব ও আল্লাহ উভয়েই শয়তানের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। তারপর নেহাত নিজের কথা রাখার জন্যই আল্লাহ ধমক দিয়ে তাকে মাফ চাইতে বাধ্য করেন এবং মাফ চাওয়ার সাথে সাথেই তা গ্রহণ করে নেন, যাতে শয়তানের সামনে তাঁকে লজ্জিত হতে না হয়।

এ পুস্তকটি নিজ মুখেই একথা ঘোষনা করছে যে, এটি আল্লাহর বা হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর বাণী নয় বরং হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম-এর জামানার বইও নয় এটি। তাঁর ইন্তেকালের শত শত বছর পরে কোন এক ব্যক্তি হযরত আইয়ূব আলাইহিস সালাম-এর ঘটনাকে ভিত্তি করে "ইউসুফ যোলায়খা" ধরনের একটি চমকপ্রদ কাহিনী কাব্য রচনা করেন। তাতে আইয়ূব (ইয়োব), তৈমনীয় ইলীফস, শূহীয় বিলদদ, নামাথীয় সোফর, বুযীয় বারখেলের পুত্র ইলীহূ প্রমুখ কয়েকটি চরিত্র উপস্থাপন করে তাদের মুখ দিয়ে বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আসলে তিনি নিজের মনগড়া দর্শন বর্ণনা করেছেন। তার কাব্য প্রতিভা ও চমৎকার বর্ণনা ভংগীর যতই প্রশংসা করতে পারেন করুন কিন্তু তাকে পবিত্র কিতাব ও আসমানী সহীফার অন্তর্ভুক্ত করার কোন অর্থ নেই। আইয়ুব আলাইহিস সালামের জীবনী ও সীরাতের সাথে তার সম্পর্ক ঠিক ততটুকু যতটুকু সম্পর্ক আছে "ইউসুফ যোলায়খা"র সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামের। বরং সম্ভবত অতটুকুও নেই। বড়জোর আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, এ পুস্তকের প্রথম ও শেষ অংশে যেসব ঘটনা বলা হয়েছে তার মধ্যে সঠিক ইতিহাসের একটি উপাদান পাওয়া যায়। কবি তা শ্রুতি থেকে গহন করে থাকবেন, যা তাঁর যুগে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল অথবা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য এমন কোন সহীফাহ থেকে নিয়ে থাকবেন।

আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস

আলাইহিস্ সালাম

পবিত্র কোরআনে উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিক্ষার জন্য যেসব নবীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের সবার ইতিহাস ঐটুকুই বর্ণনা করা হয়েছে, যেটুকু উম্মতের জন্য প্রয়োজন। হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর ইতিহাসও ঐটুকুও আলোচনা করা হয়েছে, যতটুকু আমাদের জানা প্রয়োজন। যদি তাঁর নামে কোরআনে একটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে। কোরআনে তাঁর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, আমরা এখানে তা উল্লেখ করলাম। মহান আল্লাহ বলেনঃ-

فلولا كانت قرية امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس- لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحيوة الدنيا ومتعنهم الى حين (يونس)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে কি যে, একটি জনপদ আযাব দেখে ঈমান এনেছে আর তার ঈমান তার জন্য কল্যাণকর হয়েছে ? একমাত্র ইউনুসের জাতির ছাড়া (এর অপর কোন দৃষ্টান্ত নেই) সেই জাতির লোকেরা যখন ঈমান এনেছিল, তখন অবশ্য তাদের উপর হতে দুনিয়ার জীবনে আমি আযাবকে দূর করে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে একটি মেয়াদ পর্যন্ত জীবন ভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম। (সূরায়ে ইউনুস, আয়াত নম্বর ৯৮)

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম ,বাইবেলে তাঁর নাম বলা হয়েছে ইউনা, তিনি খৃষ্টপূর্ব ৮৬০-৭৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের লোক ছিলেন বলে জানা যায়। যদিও তিনি বনী ইসরাঈল বংশেরই নবী ছিলেন; কিন্তু তাঁকে পাঠানো হয়েছিল আসিরীয়দের হেদায়েতের জন্য। এই কারণেই এখানে আসিরীয়দেরকে ইউনুস-এর জাতির লোক বলা হয়েছে। সেকালের প্রখ্যাত নগরী 'নিনাওয়া' ছিল তাদের কেন্দ্র। এই নগরীর ব্যাপক ধ্বংসাবশেষ বর্তমান সময় পর্যন্ত দজলা নদীর পুর্ব তীরে বর্তমানের 'মুসেল' শহরের বিপরীত দিকে বিদ্যমান রয়েছে। এই অঞ্চলে 'ইউনুস নবী' নামে একটি স্থান এখন পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। এই জাতির লোকেরা যে কত উন্নত ছিল, তা বুঝা যায় এইভাবে যে, তাদের রাজধানী 'নিনাওয়া' প্রায় ৬০ মাইল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত ছিল।

তখন অবশ্য তাদের উপর হতে দুনিয়ার জীবনে আমি আযাবকে দূর করে দিয়েছিলাম– কোরআন মজীদের তিনটি জায়গায় এই ঘটনার প্রতি শুধু ইংগিত করা হয়েছে। কোথাও কোন বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। এ কারণে কোন লোকের ব্যাপারে আযাবের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর ঈমান আনায় কোনই ফায়দা হয় না-আল্লাহর এই অটল নিয়মের ব্যতিক্রম করে এবং কোন্ কোন্ বিশেষ কারণে এই জাতিকে বিঘোষিত আযাব হতে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বাইবেলে 'ইউনাহ্' নামে যে সংক্ষিপ্ত 'পুস্তক' রয়েছে, তাতে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু তা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা, একে তো তা আসমানী কিতাব নয়, না স্বয়ং হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর লিখিত কিতাব; বরং তার চার-পাঁচ শত বৎসর পর কোন এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ইউনুস-এর ইতিহাস হিসাবে তা রচনা করে 'পবিত্র গ্রন্থসমষ্টির' অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এতে কিছু কিছু স্পষ্ট অর্থহীন কথাবার্তাও রয়েছে, যা সত্য বলে মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এতৎসত্ত্বেও কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিতে বলা কথা এবং ইউনাহ্ পুস্তকের বিবরণ চিন্তা-বিবেচনা করলে মুফাসসিরদের বর্ণিত কথাই সত্য বলে মনে হয়।

তাঁরা বলেছেন, যেহেতু হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম আযাব আসার আগাম সংবাদ দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীতই নিজের স্থান ত্যাগ করে গিয়েছিলেন; এই কারণে আযাবের পূর্বাভাস দেখতে পেয়েই আসিরীয় লোকেরা যখন তওবা করলো এবং আল্লাহর কাছে গুনাহের ক্ষমা চাইলো, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। কোরআন মজীদে আল্লাহর যেসব নিয়ম-নীতি উল্লেখিত হয়েছে,

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তন্মধ্যে একটি স্থায়ী নীতি এই যে, কোন জাতির লোকদের সামনে সত্য দ্বীন যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ দলীল-প্রমাণসহকারে উপস্থাপন করা না হবে, ততক্ষণ কারো উপর তিনি আযাব নাযিল করেন না। কাজেই নবী যখন উক্ত জাতির জন্য দেওয়া অবকাশের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাওয়াত ও নসীহতকে অব্যাহত রাখেন নি এবং আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্থানান্তরে চলে গেলেন, তখন আল্লাহর ইনসাফ এই জাতিকে আযাব দেয়া পছন্দ করলো না। কেননা তাদের সামনে সত্য দ্বীনের দলীল চূড়ান্তকরণের আইনগত শর্তসমূহ সম্পূর্ণ হয়নি।

এই জাতির লোকেরা যখন ঈমান আনলো, তখন তাদের আয়ুকাল বৃদ্ধি করে দেয়া হলো। পরে তারা চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে গুমরাহী অবলম্বন করতে লাগলো। 'নাহুম' নবী (খৃষ্টপূর্ব ৭০-৬৯৮ সন) এই জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করে দেন। কিন্তু তার কোনই ফল দেখা যায়নি। অতঃপর 'সাফনীয়' নবী (খৃষ্টপূর্ব ৬৪০-৬০৯) তাদেরকে শেষবারের মতো হুশিয়ার করে দেন। এতেও কোন ফল হলো না। শেষ পর্যন্ত খৃষ্টপূর্ব ৬১২ সনের কাছাকাছি সময়ে আল্লাহ তা'আলা 'মিডিয়া' বাসীকে তাদের উপর জয়ী করে দিলেন। 'মিডিয়া'র বাদশাহ বেবিলনের লোকদের সাহায্য আসিরীয় অঞ্চলের উপর হামলা চালালো। আসিরীয় সেনাবাহিনী পরাজয় বরণ করে নিনাওয়া'য় অবরুদ্ধ হয়। কিছুকাল যাবত তারা প্রবল শক্তিতে মুকাবিলা করে। পরে দজলা নদীর বন্যা নগরের প্রাচীর চূর্ণ করে দেয় এবং আক্রমণকারীরা শহরের ভিতরে প্রবেশ করে। তারা গোটা শহরকে আগুন লাগিয়ে ভস্ম করে দিল। আশে-পাশের এলাকার পরিণতিও তাই হইল। আসিরীয় বাদশাহ নিজে নিজ প্রাসাদে আগুণ লাগিয়ে জ্বলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আর আসিরীয় রাজত্ব ও সভ্যতাও এই সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় চিরদিনের জন্য। আধুনিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক খোদাই কার্যের ফলে এতদঞ্চলে আগুনে পোড়ার বহু চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো

হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-কে কিভাবে মাছ নিজের পেটে ধারণ করেছিল এবং আল্লাহ তাকে কিভাবে রক্ষা করেছিলেন, এ সম্পর্কে সূরা সা-ফ্ফা-তে বলা হয়েছেঃ-

وان يونس لمن المرسلين-اذ ابق الى الفلك المشحون-
فساهم فكان من المدحضين-فالتقمة الحوت وهو
مليم-فلولا انه كان من المسبحين-للبث فى بطنه الى
يوم يبعثون-فنبذنه بالعراء وهو سقيم-وانبتنا عليه

ahlussunnah-bd.blogspot.com

شجرة من يقطين-وارسلنه الى مائة الف اويزيدون-
فامنوا فمتعنهم الى حين (الصفت)

আর অবশ্যই ইউনসু রাসূলদের একজন ছিল। স্মরণ করো যখন সে একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো, তারপর লটারীতে অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে হেরে গেলো শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং সে ছিল ধিকৃত। এখন যদি সে তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ মাছের পেটে থাকতো।

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বড়ই রুগ্ন অবস্থায় একটি তৃণলতাহীন বিরান প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং তার ওপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম। এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এরচেয়ে বেশী লোকদের কাছে পাঠালাম। তারা ঈমান আনলো এবং আমি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে টিকিয়ে রাখলাম। (সূরায়ে সা-ফ্ফা-ত, আয়াত নম্বর ১৩৯-১৪৮)

আর অবশ্যই ইউনুস রাসূলদের একজন ছিল। স্মরণ করো যখন সে একটি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলো–উল্লেখিত আয়াতে আরবী 'আবাক্ব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি কেবলমাত্র তখনই ব্যবহার করা হয় যখন গোলাম তার প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যায়। এ শব্দ সম্পর্কে লিসানুল আরব গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'আবাক অর্থ হচ্ছে প্রভুর কাছ থেকে গোলামের পালিয়ে যাওয়া।' (লিসানুল আরব)

তারপর লটারীতে অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে হেরে গেলো শেষ পর্যন্ত মাছ তাকে গিলে ফেললো এবং সে ছিল ধিকৃত–এ বাক্যগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে ঘটনার যে চিত্রটি সামনে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে ঃ

এক, হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম যে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন তা তার ধারণ ক্ষমতার চাইতে বেশী বোঝাই (Overloaded) ছিল।

দুই, নৌকায় লটারী অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্ভবত এমন সময় হয় যখন সামুদ্রিক সফরের মাঝখানে মনে করা হয় যে, নৌকা তার ধারণ ক্ষমতার বেশী বোঝা বহন করার কারণে সকল যাত্রীর জীবন বিপদের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। কাজেই লটারীতে যার নাম উঠবে তাকেই পানিতে নিক্ষেপ করা হবে, এ উদ্দেশ্যে লটারী করা হয়।

তিন, লটারীতে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর নামই ওঠে। তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং একটি মাছ তাঁকে গিয়ে ফেলে।

চার ঃ হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর এ পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজের প্রভুর (অর্থাৎ মহান আল্লাহ) অনুমতি ছাড়াই তাঁর কর্মস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। "আবাকা" শব্দটি এ অর্থই প্রকাশ করছে, ওপরে আবাক শব্দের

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এ ব্যাখ্যাই করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে 'মুলিম' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ "মুলীম" শব্দটিও এ কথাই বলছে। মুলীম এমন অপরাধীকে বলা হয় যে নিজের অপরাধের কারণে নিজেই নিন্দিত হবার হকদার হয়ে গেছে, তাকে নিন্দা করা হোক বা না হোক।

এখন যদি সে তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো–এর দু'টি অর্থ হয় এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম পূর্বেই আল্লাহ থেকে গাফিল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না বরং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ছিলেন আল্লাহর চিরন্তন প্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণাকারী। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যখন তিনি মাছের পেটে পৌছুলেন তখন আল্লাহরই দিকে নিজেকে রুজূ' করলেন এবং তারই প্রশংসা, মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকলেন। সূরা আল আম্বিয়ায় বলা হয়েছে, 'তাই সে অন্ধকারের মধ্যে তিনি ডেকে উঠলেন, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, পাক-পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধী।'

তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এ মাছের পেটে থাকতো–এর অর্থ এ নয় যে, এ মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতো এবং হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম কিয়ামত পর্যন্ত তার পেটে বেঁচে থাকতেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামত পর্যন্ত এ মাছের পেটই তাঁর কবরে পরিণত হতো। প্রখ্যাত মুফাস্সিরগণ এ আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বড়ই রুগ্ন অবস্থায় একটি তৃণলতাহীন বিরান প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম–অর্থাৎ হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম যখন তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নিলেন এবং একজন মু'মিন ও ধৈর্যশীল বান্দার ন্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা গাইতে লাগলেন তখন আল্লাহর হুকুমে মাছ তাঁকে উপকূলে উদ্গীরণ করলো। উপকূল ছিল একটি বিরাণ প্রান্তর। সেখানে সবুজের কোন চিহ্ন ছিল না এবং এমন কোন জিনিসও ছিল না যা হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-কে ছায়াদান করতে পারে। সেখানে খাদ্যেরও কোন সংস্থান ছিল না।

এখানে এসে অনেক বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের দাবীদারকে একথা বলতে শোনা গেছে যে, মাছের পেটে ঢুকে যাবার পর কোন মানুষের জীবিত বের হয়ে আসা অসম্ভব। কিন্তু বিগত শতকের শেষের দিকে এ তথাকথিত বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদীতার কেন্দ্র ভূমির (ইংল্যাণ্ড) উপকূলের সন্নিকটে একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাটি তাদের দাবী খণ্ডন করে। ১৮৯১ সালের আগষ্ট মাসে Star of the East নামক জাহাজে চড়ে কয়েকজন মৎস্য শিকারী তিমি শিকারের উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রে যায়। সেখানে তারা ২০ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ১০০ টন ওজনের একটি বিশাল মাছকে আহত করে। কিন্তু তার সাথে লড়াই করার সময় জেম্স বার্ডলে নামক একজন মৎস শিকারীকে তার সাথীদের চোখের সামনেই মাছটি গিলে ফেলে। একদিন পরে জাহাজের লোকেরা মাছটিকে মৃত অবস্থায় পায়। বহুকষ্টে সেটিকে তারা জাহাজে ওঠায় এবং তারপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর তার পেট কাটলে জেম্স তার মধ্য থেকে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

জীবিত বের হয়ে আসে। এ ব্যক্তি মাছের পেটে পুরা ৬০ ঘন্টা থাকে।" (উর্দু ডাইজেস্ট, ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪) চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে যদি এমনটি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে, তাহলে অস্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর মু'জিযা হিসেবে এমনটি হওয়া কেমন করে অসম্ভব হতে পারে?

এ তো গেল সেই ১৮৯১ সালের ঘটনা। বর্তমানে মানুষ এই ডিস এ্যান্টিনার যুগে ঘরে বসেই টিভিতে নানা চ্যানেলে বিশেষ করে ডিসকভারী ও ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলে, ষ্টার ওয়ার্ল্ডে প্রায় এ ধরণের অকল্পনীয় দৃশ্য দেখে থাকে। হাঙ্গরের পেট থেকে, তিমির পেট থেকে কিভাবে মানুষ জীবিত ফিরে আসছে। সুতরাং হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর বিষয়টা কোরআনে পাঠ করে অবাক হবার তেমন কিছুই নেই। মহান আল্লাহর কুদরতী ব্যবস্থার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

তার ওপর একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করলাম–এ আয়াতের মূলে বলা হয়েছে 'সাজারাতান মিন ইয়াকতীন' ইয়াকতীন আরবী ভাষায় এমন ধরনের গাছকে বলা হয় যা কোন গুঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না বরং লতার মতো ছড়িয়ে যেতে থাকে। যেমন লাউ, তরমুজ, শশা ইত্যাদি। মোটকথা সেখানে অলৌকিকভাবে এমন একটি লতানো গাছ উৎপন্ন করা হয়েছিল যার পাতাগুলো হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-কে ছায়া দিচ্ছিল এবং ফলগুলো একই সংগে তাঁর জন্য খাদ্য সরবরাহ করছিল এবং পানিরও যোগান দিচ্ছিল।

এরপর আমি তাকে এক লাখ বা এরচেয়ে বেশী লোকদের কাছে পাঠালাম–"এক লাখ বা এর বেশী" বলার মানে এ নয় যে, এর সঠিক সংখ্যার ব্যাপারে আল্লাহর সন্দেহ ছিল। বরং এর অর্থ হচ্ছে, যদি কেউ তাদের জনবসতি দেখতো তাহলে সে এ ধারণাই করতো যে, এ শহরের জনসংখ্যা এক লাখের বেশীই হবে, কম হবে না। সম্ভবত হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম যে শহরটি ত্যাগ কর পালিয়ে গিয়েছিলেন এটি সেই শহরই হবে। তাঁর চলে যাবার পর সে শহরের লোকেরা আযাব আসতে দেখে যে ঈমান এনেছিল তার অবস্থা ছিল এমন তাওবার মতো যা কবুল করে নিয়ে তাদের ওপর থেকে আযাব হটিয়ে দেয়া হয়েছিল। এখন হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে পুনরবার তাদের কাছে পাঠানো হলো, যাতে তারা নবীর প্রতি ঈমান এনে যথারীতি মুসলমান হয়ে যায়। এ বিষয়টি বুঝার জন্য সুরা ইউনুসের বর্ণিত ঘটনাবলী সামনে থাকা দরকার।

তাফহিমুল কোরআনের রচয়িতা আল্লামা মওদুদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, 'হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর এ ঘটনা সম্পর্কে আমি সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়ার ব্যাখ্যায় যা কিছু লিখেছি সে সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি উঠিয়েছেন। তাই সঙ্গতভাবেই এখানে অন্যান্য মুফাস্সিরগণের উক্তিও উদ্ধৃত করছি ঃ

বিখ্যাত মুফাস্সির কাতাদা সূরা ইউনুসের ৯৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'এমন কোন জনপদ দেখা যায়নি যার অধিবাসীরা কুফরী করেছে এবং আযাব এসে যাবার পরে ঈমান এনেছে আর তারপর তাদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র হযরত

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ইউনুস আলাইহিস সালাম-এর সম্প্রদায় এর ব্যতিক্রম। তারা যখন তাদের নবীর সন্ধান করে তাঁকে না পেয়ে অনুভব করলো আযাব নিকটে এসে গেছে তখন আল্লাহ তাদের মনে তওবার প্রেরণা সৃষ্টি করলেন।' (ইবনে কাসীর, ২ খণ্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

একই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখছেন, এ জাতির কাহিনী হচ্ছে, 'হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম মসুল এলাকায় নিনেভাবাসীদের কাছে আগমন করেছিলেন। তারা ছিল কাফের ও মুশরিক। হযরত ইউনুস তাদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ কর। হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে জানিয়ে দেন, তৃতীয় দিন আযাব আসবে এবং তৃতীয় দিন আসার আগেই অর্ধ রাতে তিনি জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন। তারপর দিনের বেলা যখন এ জাতির মাথার ওপর আযাব পৌছে যায় এবং তাদের বিশ্বাস জন্মে যে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তারা নিজেদের নবীকে খুঁজতে থাকে কিন্তু তাঁকে খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই নিজেদের ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও গবাদি পশু নিয়ে খোলা প্রান্তরে বের হয়ে আসে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও তাওবা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন।" (রূহুল মা'আনী, ১১ খন্ড, ১৭০ পৃষ্ঠা)

সুরা আম্বিয়ার ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলূসী লিখেছেন, 'হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর নিজের জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে যাওয়া ছিল হিজরাতের কাজ। কিন্তু তাঁকে এর হুকুম দেয়া হয়নি।' (রুহুল মা'আনী, ১৭ খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা) তারপর তিনি হযরত ইউনুস দোয়ার বাক্যাংশ 'ইন্নি কুনতু মিনায যলেমিন' এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'অর্থাৎ আমি অপরাধী ছিলাম। নবীদের নিয়মের বাইরে গিয়ে হুকুম আসার আগেই হিজরাত করার ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়া করেছিলাম।' হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে এটি ছিল তাঁর নিজের গোনাহের স্বীকৃতি এবং তওবার প্রকাশ, যাতে আল্লাহ তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।' (রূহুল মা'আনী, ১৭ খন্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা)

এ আয়াতটির টীকায় মওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন, 'তাঁর নিজের জাতি তাঁর প্রতি ঈমান না আনায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যান এবং জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাবার পরও নিজে তাদের কাছে ফিরে আসেননি। আর এ সফরের জন্য আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষাও করেননি।' (বায়ানুল কোরআন)

এ আয়াতের টীকায় মওলানা শাব্বির আহমদ উসামনী লিখেছেন, 'জাতির কার্যকলাপে ক্ষিপ্ত হয়ে ক্রুদ্ধচিত্তে শহর থেকে বের হয়ে যান। আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করেননি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, তিন দিনের মধ্যে তোমাদের ওপর আযাব নেমে আসবে। 'ইন্নি কুনতু মিনায যলেমিন' বলে নিজের অপরাধ স্বীকার করেন এ মর্মে যে, অবশ্যই আমি তাড়াহুড়া করেছি, তোমার হুকুমের অপেক্ষা না করেই জনপদের অধিবাসীদের ত্যাগ করে বের হয়ে পড়ি।'

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সূরা সা-ফ্ফা-তের ওপরে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাযী লিখেছেন, 'হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর অপরাধ ছিল, তাঁর যে জাতি তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল আল্লাহ তাকে ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এ আযাব নির্ঘাত এসে যাবে। তাই তিনি সবর করেননি। জাতিকে দাওয়াত দেবার কাজ বাদ দিয়ে বাইরে বের হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দাওয়াতের কাজ সবসময় জারী রাখাই ছিল তাঁর দায়িত্ব। কারণ আল্লাহর পক্ষ হতে তাদেরকে ধ্বংস না করার সম্ভাবনা তখনো ছিল।' (তাফসীরে কবীর, ৭ খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)।

আল্লামা আলুসী 'ইয আবাকা ইলাল ফুলকেল মাশহুন' সম্পর্কে লিখেছেন, 'আবাকা'-এর আসল মানে হচ্ছে, প্রভুর কাছ থেকে দাসের পালিয়ে যাওয়া। যেহেতু হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম তাঁর রবের অনুমতি ছাড়াই নিজের জাতির কাছ থেকে পলায়ন করেছিলেন তাই তাঁর জন্য এ শব্দটির ব্যবহার সঠিক হয়েছে। তারপর সামনের দিকে তিনি আরো লিখেছেন, 'তৃতীয় দিনে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই বের হয়ে গেলেন তখন তাঁর জাতি তাঁকে না পেয়ে তাদের বড়দের, ছোটদের ও গবাদি পশুগুলো নিয়ে বের হয়ে পড়লো। আযাব অবতীর্ণ হবার বিষয়টি তাদের কাছে এসে পৌছেছিল। তারা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলো। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন।' (রূহুল মা'আনী, ২৩ খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা)

মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ 'ওয়া হুওয়া মুলিম' এর ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, 'অভিযোগ এটিই ছিল যে, ইজতিহাদী ভুলের দরুন আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা না করে জনপদ থেকে বের হয়ে পড়েন এবং আযাবের দিন নির্ধারণ করে দেন।'

আবার সূরা আল কালামে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে যে কথা আল্লাহ বলেছেন, তার এক আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী লিখেছেন, 'অর্থাৎ মাছের পেটে প্রবেশকারী পয়গম্বরের (হযরত ইউনুস আলাইহিস সালাম) মতো মিথ্যা আরোপকারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণমনা ও ভীতি-আশংকার প্রকাশ ঘটাবে না।" তারপর একই আয়াতের 'ওয়া হুওয়া মাকযুম' বাক্যাংশের টীকায় তিনি লিখেছেন, অর্থাৎ জাতির বিরুদ্ধে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে দ্রুত আযাবের জন্য দোয়া এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন।'

মুফাস্সিরগণের এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনটি ভুলের কারণে হযরত ইউনুস আলাইহিস্ সালাম-এর ওপর অসন্তোষ ও ক্রোধ নেমে আসে। এক, তিনি নিজেই আযাবের দিন নির্দিষ্ট করে দেন। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের কোন ঘোষণা হয়নি। দুই, সেদিন আসার আগেই হিজরত করে দেশ থেকে বের হয়ে যান। অথচ আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত নবীর নিজ স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়। তিন, সে জাতির ওপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পর তিনি নিজে তাদের মধ্যে ফিরে যাননি।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত যাকারিয়া হযরত ইয়াহ্ইয়া

আলাইহিস সালাম

পবিত্র কোরআন যে যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আলোচনা করেছে, আর তাওরাত যে যাকারিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে, এই দুই যাকারিয়া এক ব্যক্তি নন। পারস্য সম্রাট দারাউসের শাসন আমলে যাকারিয়া নামক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিল, তার সম্পর্কে তাওরাতে আলোচনা করা হয়েছে। আর পবিত্র কোরআন যে যাকারিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে, সে যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম ছিলেন আল্লাহর একজন মহান নবী এবং আল্লাহর আরেকজন নবী হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর পিতা। তাঁর জীবনি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়নি। তবে কোরআনের আলোচনা দৃষ্টে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি তাঁর যুগের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি কিভাবে নিজের জীবিকা অর্জন করতেন, এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম কাঠ কাটার কাজ অর্থাৎ করাতির কাজ করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

অধিক বয়স পর্যন্ত তাঁর কোন সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করেনি এবং সন্তান জন্মগ্রহণ না করার কারণ ছিল, তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। হযরত মারয়াম আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহর ঘর বাইতুল মুকাদ্দাসের খাদেমা হিসাবে উৎসর্গ করা হয়েছিল। তিনি যে মেহরাবে অবস্থান করতেন, সেখানে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ফেরেশতারা এসে হযরত মারয়াম আলাইহিস্ সালাম-কে নানা ধরণের খাদ্য দান করে যেতেন। আল্লাহর নবী হযরত যাকারিয়া এসব দেখতেন।

একদিকে তাঁর কোন সন্তান ছিল না, গোটা জাতির অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাঁর অবর্তমানে এই জাতিকে কে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবে এই চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। এ সমস্ত কারণে তাঁর মনে আকাংখা জেগেছিল, হযরত মারয়াম যেমন আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দাহ, তেমন চরিত্রের তাঁর যদি একটা সন্তান থাকতো, তাহলে সে সন্তান মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতো। এ কারণেই তিনি মহান আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলেন। আল্লাহর ফেরশেতার মাধ্যমে তাঁকে হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদ দান করেছিলেন। এ ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ভাষ্য হলোঃ-

اذ قالت امرات عمرن رب انى نذرت لك ما فى بتطنى

محررا فتقبل منى-انك انت السميع العليم-فلما

وضعتها قالت رب انى وضعتها انثى-والله اعلم بما

ahlussunnah-bd.blogspot.com

وضعت-وليس الذكر كالانثى-وانى سميتها مريم وانى اعيذ ها بك وذريتها من الشيطن الرجيم-فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا-وكفلها زكريا-كلما دخل عليها زكريا المحراب-وجد عند ها رزقا-قال يمريم انى لك هذا-قالت هو من عند الله-ان الله يرزق من يشاء بغير حساب-هنلك دعا زكريا ربه-قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة-انك سميع الدعاء-فنادته الملءكة وهو قاءم يصلى فى المحراب-ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصلحين-قال رب انى يكون لى غلم وقد بلغنى الكبر وامر اتى عاقر-قال كذلك الله يفعل مايشاء-قال رب اجعل لى اية-قال ايتك الا تكلم الناس ثلثة ايام الا رمزا-واذ كر ربك كثيرا وسبح بالعشى والابكار (العمران)

যখন ইমরানের মহিলা বলছিল যে, 'হে আমার রব! আমার এই সন্তানকে-যে এখন আমার গর্ভে রয়েছে-আমি তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। সে তোমার কাজেই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আমার পক্ষ হতে এই নিবেদন তুমি কবুল করো। তুমি সবকিছুই শোন এবং সবকিছুই জান।'

অতঃপর সে যখন সেই সন্তান প্রসব করলো তখন বললো "প্রভু হে, আমার তো কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে-অথচ সে যা প্রসব করেছিল তাহা আল্লাহ্‌র জানা-ই ছিল-আর পুত্র-সন্তান কখনো কন্যা-সন্তানের মত হতে পারেনা। যা হোক, আমি তার

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নাম রাখলাম মরিয়াম এবং আমি তাকে ও তার ভবিষ্যত বংশধরকে মরদূদ শয়তানের ফিতনা হতে রক্ষা করার জন্য তোমারই আশ্রয়ে সোপর্দ করে দিচ্ছি।' শেষ পর্যন্ত তার রব্ এই কন্যা-সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো কন্যা হিসেবে গড়ে তুললেন এবং জাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন। জাকারিয়া যখনই তার কাছে মেহরাবে যেতো, তখনি তার কাছে কিছু -না কিছু খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য দেখতে পেতো। সে জিজ্ঞাসা করতো, মরিয়ম! এসব তুমি কোথায় পেলে ? উত্তর দিতো, এসব আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন বিপুল পরিমাণে দান করেন।

এই অবস্থা দেখে জাকারিয়া রবকে ডাকলো, 'হে আমার রব্ব! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎ-সন্তান দান করো। প্রকৃত পক্ষে তুমিই দোয়া-প্রার্থনা শ্রবণকারী। উত্তরে ফেরেশতাগণ আওয়াজ দিল-যখন সে মেহরাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল-'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে আল্লাহর তরফ হতে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আগমন করবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার বৈশিষ্ট্য থাকবে, পূর্ণমাত্রায় নিয়মানুবর্তিতা থাকবে, নবুয়্যাতের সম্মানে ভূষিত হবে এবং সৎ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।" জাকারিয়া বললো, "হে রব্! আমার পুত্র-সন্তান হবে কেমন করে ? আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা।" উত্তর আসিল "এমনই হবে; আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন।" সে নিবেদন করলো, "হে আমার রব্ব! তাহলে আমার জন্য কোন নিদর্শন ঠিক করে দাও।" তিনি বললেন, "নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত লোকদের সাথে ইশারা-ইংগিত ছাড়া কোন কথাবার্তা বলবে না (অথবা বলতে পারবে না)। এই সময়ের মধ্যে তোমার রবকে খুব বেশী করে স্মরণ করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর 'তসবীহ' করতে থাকবে।"(সূরায়ে ইমরাণ, আয়াত নম্বর ৩৫-৪১)

উল্লেখিত আয়াতে 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরানের স্ত্রী' বুঝানো হয় তবে বুঝতে হবে যে, এ সেই ইমরান নয় যার কথা পূর্বে বলা হয়েছে; বরং এখানে হযরত মরিয়ামের পিতার (তাঁর নাম হয়ত ইমরানই হবে) কথাই বলা হয়েছে। (খৃষ্টান কিংবদন্তিতে মরিয়ামের পিতার নাম 'ইওয়াকীম' (Ioachim) লেখা হয়েছে) পক্ষান্তরে 'ইমরানের মহিলা' বলতে যদি 'ইমরান বংশধরের মহিলা' বুঝায়, তবে এর অর্থ এই হবে যে, হযরত মরিয়ামের মাতা এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই দুই অর্থের মধ্য হতে কোন একটিকে নির্ভুল বলে রায় দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যজ্ঞান আমাদের কাছে নেই বলে আমরা এর কোন একটিকে অগ্রাধিকার দিতে পারছি না। কেননা, হযরত মরিয়ামের পিতা কে ছিলেন এবং তাঁর মাতা কোন্ বংশের মেয়ে ছিলেন, ইতিহাসে তার কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশ্য যদি (একটি বর্ণনা মোতাবেক) এই কথা মেনে নেয়া যায় যে, হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মাতা ও হযরত মরিয়ামের মাতা পরস্পর সম্পর্কে বোন ছিলেন, তা হলে 'ইমরানের মহিলা' হতে ইমরান বংশের মহিলা অর্থ করাই ঠিক হবে। কেননা, লুক লিখিত ইনজীলে সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর মাতা হযরত হারুন আলাইহিস্ সালাম-এর বংশধর ছিলেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হে আমার রব! আমার এই সন্তানকে-যে এখন আমার গর্ভে রয়েছে-আমি তোমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি। সে তোমার কাজেই সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত থাকবে। আমার পক্ষ হতে এই নিবেদন তুমি কবুল করো। তুমি সবকিছুই শোন এবং সবকিছুই জান–অর্থাৎ তুমি তোমার বান্দাহদের দোয়া-প্রার্থনা শুনতে পাও এবং তাদের মনোভাব খুব ভালো করেই জানো।

প্রভু হে, আমার তো কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে-অথচ সে যা প্রসব করেছিল তাহা আল্লাহ্‌র জানা-ই ছিল-আর পুত্র-সন্তান কখনো কন্যা-সন্তানের মত হতে পারেনা–অর্থাৎ পুত্র-সন্তান সাধারণত এমন অনেক প্রকার স্বাভাবিক দুর্বলতা ও সামাজিক বাধ্য-বাধকতা হতে মুক্ত হয়ে থাকে যাতে কন্যা-সন্তান স্বভাবতই বন্দী থাকে। কাজেই পুত্র-সন্তান হলে যে উদ্দেশ্যে আমি আমার সন্তান তোমার পথে নিবেদন করতে আগ্রহী ছিলাম তা অধিক সুষ্ঠরূপে হাসিল করা যেতো।

শেষ পর্যন্ত তার রব্ এই কন্যা-সন্তানকে সন্তুষ্টির সাথে কবুল করে নিলেন, তাকে খুব ভালো কন্যা হিসেবে গড়ে তুললেন এবং জাকারিয়াকে তার পৃষ্ঠপোষক করে দিলেন–এখান থেকে হযরত মরিয়মের পূর্ণ বয়স্কা হওয়ার সময়ের কথা বলা হচ্ছে। এই সময় তাকে বায়তুল মাকদাসের ইবাদতগাহে (হায়কাল) ভর্তি করে দেয়া হয়েছিল। এখানে তিনি দিন-রাত আল্লাহ্‌র যিক্‌র করেই অতিবাহিত করতেন। তাঁকে হযরত জাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর হেফাজতে রাখা হয়েছিল। সম্ভবত তিনি তাঁর সম্পর্কে খালু হতেন এবং ইবাদতখানার পুরোহিতদের অন্যতম ছিলেন। মনে রাখা দরকার যে, বাইবেলের প্রাচীন চুক্তি-নামায় যে জাকারিয়া নবীর হত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে সেই জাকারিয়ার কথা বলা হচ্ছে না।

'মেহরাব' শব্দ শোনা মাত্রই আমাদের মসজিদসমূহে ইমামের দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত মেহরাবের কথা সাধারণভাবে লোকদের মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু এখানে সেই মেহরাবকে বুঝানো হচ্ছে না। গীর্জা, গুরুদ্বার প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূল উপাসনালয় ভবন সন্নিহিত ও সমতলভূমি হতে অনেক উচ্চে যে কক্ষ নির্মিত হয়, যাতে উপাসনালয়ের পুরোহিত, সেবক ও ইতেকাফে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বসবাস করে থাকে, তাকেই মেহরাব বলা হয়। এই ধরনের কোন একটি কক্ষে হযরত মরিয়ম ইতেকাফ করছিলেন।

এই অবস্থা দেখে জাকারিয়া রবকে ডাকলো, 'হে আমার রব্ব! তোমার বিশেষ কুদরতে আমাকে সৎ-সন্তান দান করো। প্রকৃত পক্ষে তুমিই দোয়া-প্রার্থনা শ্রবণকারী–হযরত জাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম তখন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। এই যুবতী নেক কন্যাকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে এই বাসনা জাগলো যে, আল্লাহ তাকেও যদি এইরূপ নেক সন্তান দান করতেন। উপরন্তু আল্লাহ তাঁর নিজ কুদরতে এই কক্ষবাসিনী কন্যাকে যেভাবে রিযিক দান করছেন তা দেখে তাঁর মনে এই আশাবাদ জাগ্রত হয়েছিল যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এই বার্ধক্য অবস্থায়ও তাঁকে সন্তান দান করতে পারেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর নাম বাইবেলে বলা হয়েছে 'যোহন বাপতাইজক' (Jhon the Baptist)। তাঁর জীবন কাহিনী জানার জন্য মথি-৩, ১১ ও ১৪ অধ্যায়, মার্ক-১ ও ৬ অধ্যায় এবং লূক-১ ও ৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সে আল্লাহর তরফ হতে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আগমন করবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার বৈশিষ্ট্য থাকবে, পূর্ণমাত্রায় নিয়মানুবর্তিতা থাকবে, নবুয়্যাতের সম্মানে ভূষিত হবে এবং সৎ লোকদের মধ্যে গণ্য হবে–আল্লাহর 'ফরমান' অর্থ হযরত ইসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম। যেহেতু আল্লাহ্‌র এক অসাধারণ নির্দেশে সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল, এই জন্য কোরআন মজীদে তাঁকে 'কালেমাতুম মিনাল্লাহ' বা 'খোদার ফরমান' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জাকারিয়া বললো, "হে রব্! আমার পুত্র-সন্তান হবে কেমন করে ? আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা।" উত্তর আসিল "এমনই হবে; আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন–অর্থাৎ তোমার বার্ধক্য ও তোমার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ তোমাকে পুত্র-সন্তান দান করবেন।

হে আমার রব্ব! তাহলে আমার জন্য কোন নিদর্শন ঠিক করে দাও–অর্থাৎ এমন একটি নিদর্শন আমাকে বলে দাও যা দ্বারা এক খুনখুনে বুড়া ও বন্ধ্যা বুড়ীর গর্ভে সন্তান হওয়ার মত অত্যাশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হবে। আর তা যেন আমি পূর্ব হতেই জানতে ও বুঝতে পারি।

খৃষ্টানগণ ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম-কে আল্লাহর পুত্র ও মাবুদ বলে বিশ্বাস করে থাকে, এই ধারণা যে মারাত্মক ভুল তা তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়াইএই ভাষণের লক্ষ্য। হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্ সালাম-এর কথা এই জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর জন্ম যেভাবে অত্যন্ত বিস্ময়কর উপায়ে একটি মুজিযার ন্যায় সংঘটিত হয়েছিল, অনুরূপভাবে তারই মাত্র ছয় মাস পূর্বে সেই পরিবারেই হযরত ইয়াহইয়ার জন্মও অপর একটি মোজেযার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। এটা হতে আল্লাহ খৃষ্টানদেরকে এ কথা বুঝাতে চান যে, ইয়াহইয়া যদি তাঁর অস্বাভাবিক ও আশ্চর্যজনক জন্ম দ্বারা মাবূদ' হতে না পেরে থাকেন তবে ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম কিভাবে শুধু একটা অস্বাভাবিক নিয়মে জন্মলাভ করার কারণে মা'বূদ হতে পারেন ?

হযরত লুকমান
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

সমস্ত ইসলামী চিন্তাবিদদের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত লুকমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নবী ছিলেন না। কেননা, আল্লাহর কোরআন একজন নবীর বর্ণনা পেশ করতে গিয়ে যে ধারা অবলম্বন করেছে, তাঁর ব্যাপারে তা অবলম্বন করা হয়নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হযরত লুকমানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ব্যাপক মতানৈক্য মতবিরোধ দেখা যায়। জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে কোন লিখিত ইতিহাসের অস্তিত্ব ছিল না। শতশত বছর থেকে মুখে মুখে শ্রুত যেসব তথ্য স্মৃতির ভান্ডারে লোককাহিনী-গল্প-গাঁথার আকারে সংগৃহীত হয়ে আসছিল সেগুলোর ওপর ছিল এর

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ভিত্তি। এসব বর্ণনার ভিত্তিতে কেউ কেউ হযরত লুকমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে আদ জাতির অন্তরভুক্ত ইয়ামনের বাদশাহ মনে করতো।

মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এসব বর্ণনার ওপর নির্ভর করে তাঁর 'আরদুল কোরআন' নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেছেন যে, আদ জাতির ওপর আল্লাহর আযাব নাজিল হবার পরে হযরত হুদ আলাইহিস্ সালাম -এর সাথে তাদের যে ঈমানদার দলটিকে মহান আল্লাহ হেফাজত করেছিলেন, হযরত লুকমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন তাদেরই বংশোদ্ভূত। ইয়েমেন এই জাতির যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন সে জাতির অন্যতম শাসক ও বাদশাহ।

পক্ষান্তরে কতিপয় প্রবীণ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও তাবেঈদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হযরত লুকমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর সম্পর্কে কিছু বর্ণনা এসেছে, যেগুলো মাওলানা সুলাইমান নদবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বর্ণনাকে সমর্থন করে না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, লুকমান ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইকরিমা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও খালেদুর রাব'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও এই মত সমর্থন করেন। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, হযরত লুকমান ছিলেন নুবার অধিবাসী। হযরত সাঈদ ইবেন মাসাইয়েব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, হযরত লুকমান ছিলেন মিশরের কালো লোকদের অন্তরভুক্ত।

এসব বক্তব্য প্রায় কাছকাছি অবস্থান করছে। কারণ আরবের লোকজন সে সময়ে কালো লোকদেরকে প্রায়ই হাবশী নামে সম্বোধন করতো। হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, লুকমান ছিলেন নুবার অধিবাসী। নুবা হলো মিশরের দক্ষিণে এবং সুদানের উত্তরে অবস্থিত একটি এলাকা। সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনায় একই ব্যক্তিকে নুবার অধিবাসী, মিশরের অধিবাসী ও হাবশী বলা কেবলমাত্র শব্দিক পার্থক্য বা বিরোধ ব্যতীত আর কিছুই নেই। অর্থের দিক দিয়ে এখানে কোন বিরোধ নেই।

এরপর রওদাতুল আনাফে সুহাইলির ও মুরুজুয যাহাবে মাসউদীর বর্ণনা হতে এ সুদানী গোলামের কথা আরবে কেমন করে ছড়িয়ে পড়লো এ প্রশ্নের ওপরেও আলোকপাত হয়। এ উভয় বর্ণনায় বলা হয়েছে, এই লুকমান আসলে ছিলেন নুবী অর্থাৎ নুবার অধিবাসী। কিন্তু তিনি বাসিন্দা ছিলেন মাদয়ান ও আইল যাকে বর্তমানে বলা হয় আকাবাহ এলাকার। এ কারণেই তাঁর ভাষা ছিল আরবী এবং তাঁর জ্ঞানের কথা আরবে বিস্তৃতি লাভ করে। তা ছাড়া আল্লামা সুহাইলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আরো বিস্তারিতভাবে বলেছেন যে, লুকমান হাকিম ও লুকমান ইবেন আদ দু'জন পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। তাদেরকে এক ব্যক্তি ধারণা করা ঠিক নয়। (রওদুল আনাফ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৬৬, মাসউদী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৭)

এই আলোচনায় এ কথাটিও সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার করে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচ্যবিদ ডিরেনবুর্গ (Derenbourg) প্যারিস লাইব্রেরীর যে আরবী পান্ডুলিপিটি

ahlussunnah-bd.blogspot.com

'লুকমান হাকিমের গাঁথা' (Fable De Loqman Sage) নামে প্রকাশ করেছেন সেটি প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা বানোয়াট। 'লুকমানের সহীফা'-এর সাথে এর কোন সাদৃশ্য নেই, কোন দূরতম সম্পর্ক নেই। ত্রয়োদশ ঈসায়ী শতকে এ গাথাগুলো কেউ সংকলন করেছিল। তাঁর আরবী সংস্করণ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলো পড়লে পরিষ্কার অনুভব করা যাবে যে, আসলে অন্য কোন ভাষা থেকে অনুবাদ করে গ্রন্থকার নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোর সম্পর্ক লুকমান হাকিমের সাথে জুড়ে দিয়েছেন।

প্রাচ্যবিদরা এ ধরণের জাল ও বানোয়াট জিনিসগুলো বের করে যে হীন উদ্দেশ্যে সামনে আনেন তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, কোরআনে বর্ণিত কাহিনীগুলোকে যে কোনভাবেই অনৈতিহাসিক কাহিনী প্রমাণ করে অনির্ভরযোগ্য গণ্য করা। যে ব্যক্তিই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামে 'লুকমান' শিরোনামে (B. Heller) হেলারের নিবন্ধটি পড়বেন তাঁর কাছেই তাদের মনোভাব অস্পষ্ট থাকবে না।

বর্তমান যুগের এক শ্রেণীর মানুষের ন্যায় আরবের মানুষগুলো ছিল শিরকে নিমজ্জিত। আল্লাহকে ত্যাগ করে তারা অন্য সব অসার শক্তিকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতার অধিকারী মনে করতো। বর্তমান যুগের কিছু মানুষ যেমন মাজারে শায়িত মৃত মানুষকে প্রয়োজন পূরণের মালিক মনে করে, তাদের মাজারে গিয়ে নিজের মনের আশা আকাংখা ব্যক্ত করে, তাদের কাছে সাহায্য চায়, তাদের নামে মানত করে। আরবের লোকগুলোও তেমনি মূর্তিসহ নানা ধরনের অসার শক্তির কাছে গিয়ে নিজেদের আশা আকাংখার কথা ব্যক্ত করতো। আল্লাহ হলেন সমস্ত কিছুর মালিক। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের মালিকও তিনি।

সুতরাং যে কোন ধরণের প্রয়োজনে মানুষকে আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিতে হবে। এই সহজ সরল কথাটা সে লোকদের মাথায় ঢুকতো না। সূরায়ে লুকমানে এই সহজ কথাটাই প্রথম দিকে মহান আল্লাহ তাদেরকে বুঝিয়েছেন। এই সূরার প্রথম দিকে একটি শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির মাধ্যমে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর এখন আরবের লোকদেরকে এ কথা জানানো হচ্ছে যে, এ যুক্তি সংগত কথা প্রথমবার তোমাদের সামনে তোলা হচ্ছে না, বরং পূর্বেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা এ কথাই বলে গেছেন। তারা এ কথাই বলে এসেছেন এবং তোমাদের নিজেদের বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান আজ থেকে বহুদিন পূর্বে এ কথাই বলে গেছেন।

সুতরাং এ ক্ষেত্রে তোমরা কেমন করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ প্রশ্ন করতে পারো যে, শিরক্ কো অযৌক্তিক বিশ্বাস নয় এবং এটা যদি অযৌক্তিক বিশ্বাস হতো তাহলো তোমার পূর্বে এ কথা কেউ কেন বলেনি? অথচ তোমরা জানো যে, তোমরা যাকে শ্রদ্ধার সাথে সব সময় স্মরণ করো সেই লুকমানও এ কথা বলে গেছে যে, শিরক করা বড় ধরণের জুলুম। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে এ কথা আমার নবীকে বলতে পারো না।

হযরত লুকমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পরিচয় সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তাহলো, একজন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হিসেবে আরবে তিনি ছিলেন বহুল পরিচিত ব্যক্তিত্ব। সেই আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের কবিরা যেমন ইমরুল কায়েস, লবীদ, আ'শা, তারাফাহ প্রমুখ কবিগণ তাদের কবিতায় তার কথা উল্লেখ করেছেন।

amussunnan-pa.blogspot.com

সে সময় আরবে যারা লেখাপড়া জানতো তাদের অনেকের কাছেই 'সহীফা লুকমান' নামে তাঁর জ্ঞান গর্ভ উক্তির সংকলন পাওয়া যেতো। আমরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনীতে দেখতে পাই, হিজরতের তিন বছর পূর্বে মদীনার সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত আদর্শে প্রভাবিত হন তিনি ছিলেন সুওয়াইদ ইবেন সামেত। তিনি হজ্জ সম্পাদন করার জন্য মক্কায় আগমন করেন। সেখানে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন এলাকা হতে আগত হাজীদের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সবাইকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন।

এ সময় সুওয়াইদ ইবেন সামেত যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখের কথা শুনেন, তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, 'আপনি যে ধরণের মূল্যবান কথা বলছেন, এমন ধরণের মূল্যবান বাক্য সম্বলিত একটি কিতাব আমার কাছে আছে।'

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চান, 'কি সেই কিতাব?'

সুওয়াইদ ইবনে সামেত জানালেন, 'সে কিতাব হলো লুকমানের কিতাব।'

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কিতাবের কিছু অংশ পাঠ করে শুনানোর জন্য তাকে অনুরোধ জানালেন। তিনি তা পাঠ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কিতাব শুনে বললেন, 'খুবই সুন্দর কথা! তবে এর চেয়ে সুন্দর কথা আমার কাছে আছে। আপনি কি তা শুনবেন?' সুওয়াইদ ইবনে সামেত তা শুনতে চাইলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কোরআন পাঠ করে শোনালেন। আল্লাহর কোরআন শুনে সুওয়াইদ ইবেন সামেত এতই প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, তিনি স্বীকার করলেন, এই কিতাব লুকমানে কিতাব হতে অনেক ভালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৭-৬৯, উসুদুল গাবাহ, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৭৮)

ঐতিহাসিকগণ বলেছেন, এই সুওয়াইদ ইবনে সামেত তাঁর যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহিত্য ও কাব্য মনীষা এবং বংশ মর্যাদার কারণে মদীনায় অত্যন্ত সম্মানিত ও কামেল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ লাভের পরে তিনি মদীনায় গমন করেন। তারপর বুয়াসের যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং সে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর গোত্রের লোকদের ধারণা ছিল, তিনি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করার পরে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হন।

মাতা-পুত্র গোটা পৃথিবীর জন্য নিদর্শন

হযরত মারয়াম আলাইহিস সালামের গর্ভে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পিতা ব্যতীতই জন্ম হয়েছিল এবং তিনি গোটা পৃথিবীর জন্য মহান আল্লাহর নিদর্শন ছিলেন। হযরত মারয়াম ছিলেন সত্যকার অর্থেই আল্লাহভীরু নারী। তাঁর সতীত্বের সাক্ষ্য মহান আল্লাহ স্বয়ং দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ—

ahlussunnah-bd.blogspot.com

والتى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنها وابنها اية للعلمين (النبياء)

আর সেই মহিলা যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, আমি তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম নিজের রুহ থেকে এবং তাকে ও তার পুত্রকে সারা দুনিয়ার জন্য নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নম্বর ৯১)

পবিত্র কোরআনে যত স্থানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা গবেষণা করলে এ কথা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির পরিবর্তে যখন আল্লাহ কাউকে নিজের আদেশের সাহায্যে অস্তিত্বশীল করে জীবন দান করেন তখন একে 'নিজের রুহ থেকে ফুঁকে দিয়েছি' শব্দাবলীর সাহায্যে বিবৃত করেন। এ রুহের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফুঁকে দেয়াটা অলৌকিক ধরণের। সুতরাং খৃষ্টানদের ধারণা অনুসারে তাঁরা মা ছেলে দু'জনের কেউ-ই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে শরীক ছিলেন না বরং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ছিলেন। তাঁরা কোন অর্থে নিদর্শন ছিলেন তা এ গ্রন্থে সূরা মারয়ামের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ নিদর্শন সম্পর্কে সূরায়ে মুমিনুনে মহান আল্লাহ বলেনঃ-

وجعلنا ابن مريم وامه اية واوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين (المؤمنون)

আর মারয়াম পুত্র ও তার মাকে আমি একটি নিদর্শনে পরিণতে করেছিলাম এবং তাদেরকে রেখেছিলাম একটি সুউচ্চ ভূমিতে, সে স্থানটি ছিল নিরাপদ এবং সেখানে স্রোতস্বিনী প্রবাহমান ছিল (মুমিনুন, আয়াত নম্বর ৫০)

এ আয়াতে এ কথা বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র একটি নিদর্শন ছিল এবং স্বয়ং মারয়াম একটি নিদর্শন ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়নি যে, মারয়াম পুত্র ও তাঁর মাকে দুটো নিদর্শনে পরিণত করেছিলাম। বরং বলা হয়েছে, তাদের দু'জনকে মিলিয়ে একটি নিদর্শনে পরিণত করা হয়েছিল। এ কথার অর্থ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, পিতা ব্যতীত ইবনে মারয়ামের জন্ম হওয়া এবং স্বামীর সাহচর্য ছাড়া মারয়ামের গর্ভধারণ করাই এমন একটি জিনিস যা তাদের দু'জনকে একটি নিদর্শনে পরিণত করে দেয়। যারা পিতা ব্যতীত হযরত ঈসার জন্ম অস্বীকার করে তারা মাতা ও পুত্রের একটি নিদর্শন হবার কি ব্যাখ্যা দান করবেন ? এখানে দুটো কথা আরো ব্যাখ্যা যোগ্য। (এক) হযরত ঈসা ও তাঁর মাতার ব্যাপারটি মূর্খ লোকদের আর একটি দুর্বলতা চিহ্নিত করছে। কোরআনে বিভিন্ন নবীদের কথা আলোচনা করে বলা হয়েছে,

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তাদের প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারটি তো এ বলে অস্বীকার করা হয়েছে যে, তোমরা তো মানুষ আর মানুষ কি কখনো নবী হতে পারে ? কিন্তু লোকগুলো যখন হযরত ঈসার ও তাঁর মায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলো এবং তাদের ভক্ত হয়ে গেলো তখন তাদেরকে মানুষের মর্যাদা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মর্যাদায় পৌছিয়ে দিল। (দুই) যারা হযরত ঈসার অলৌকিক জন্ম এবং দোলনায় শায়িত অবস্থায় তাঁর ভাষণ শুনে তাঁর মুজিযা হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখে নেয়ার পরও ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল এবং হযরত মারয়ামকে অপবাদ দিয়েছিল তাদেরকে এমন শাস্তি দেয়া হয়েছিল যা সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য চিরকালীন শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে যে নিরাপদ স্থানের কথা বলা হয়েছে, বিভিন্ন গবেষক এ আয়াত থেকে বিভিন্ন স্থানের কথা বলেছেন। কেউ বলেন, এ স্থানটি ছিল দামেশ্‌ক। কেউ বলেন, আররমলাহ। কেউ বলেন, বাইতুল মাকদিস আবার কেউ বলেন মিশর। খৃষ্টীয় বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মারয়াম হযরত ঈসার জন্মের পর তাঁর হেফাজতের জন্য দু'বার স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রথম বাদশাহ হিরোডিয়াসের আমলে তিনি তাকে মিশরে নিয়ে যান এবং বাদশাহর মৃত্যু পর্যন্তই সেখানে থাকেন। তারপর আর্খিলাউসের শাসনামলে তাঁকে গালীলের নাসেরাহ শহরে আশ্রয় নিতে হয়। (মথি ২ঃ ১৩-২৩)

পক্ষান্তরে কোরআন কোন স্থানটি নির্দেশ করছে তা নিশ্চয়তা সহকারে বলা কঠিন। কোরআনে 'রাবওয়াহ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আভিধানিক অর্থে 'রাবওয়াহ' এমন সুউচ্চ ভূমিকে বলা হয় যা সমতল এবং আশপাশের এলাকা থেকে উচ্চ। আরবীতে 'যাতি-কারার' মানে হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদী পাওয়া যায় এবং অবস্থানকারী সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন করতে পারে। আর এ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে 'মাঈন' শব্দ। মাঈন মানে হচ্ছে বহমান পানি বা নির্ঝরিণী।

হযরত ঈসার পবিত্র জন্ম

আলাইহিস সালাম

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করবেন এমন এক পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতিতে শুধু তাঁকেই প্রেরণ করা হবে, পৃথিবীরে আর কোন মানুষকে এমন পদ্ধতিতে ইতিপূর্বে না প্রেরণ করা হয়েছিল, আর কিয়ামত পর্যন্ত না প্রেরণ করা হবে। হযরত মারয়াম আলাইহিস সালাম যখন উপযুক্ত বয়সে মহান আল্লাহর দাসত্বে নিমগ্ন ছিলেন, এমন অবস্থায় তাঁর কাছে ফেরেশতা আল্লাহর আদেশে অবতীর্ণ হয়ে সুসংবাদ দান করেছিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছেঃ-

اذ قالت الملئكة يمريم ان الله يبشرك بكلمة منه-

اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا

ahlussunnah-bd.blogspot.com

والاخرة ومن المقربين-ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصلحين-قالت رب انى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر-قال كذلك الله يخلق ما يشاء-اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون-ويعلمه الكتب والحكمة والتورية والانجيل (العمران)

যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মরিয়াম, আল্লাহ তোমাকে তাঁর নিজের এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, তার নাম হবে মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়াম। ইহকাল ও পরকালের সবর্ত্রই সে সম্মানিত হবে। তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদের মধ্যে গণ্য করা হবে। সে লোকদের সাথে দোলনায় থেকেও কথা বলবে এবং বেশী বয়সে উপণীত হলেও। বস্তুত সে একজন কর্মশীল নেক পুরুষ হবে। এ কথা শুনে মরিয়াম বললো, 'হে রব্ব ! আমার গর্ভে সন্তান কিভাবে হবে ? আমাকে তো কোন ব্যক্তি স্পর্শ পর্যন্ত করেনি।' উত্তর এলো, 'এমনই হবে। আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন কাজ করার ফয়সালা করেন তখন শুধু বলেন, হয়ে যাও আর অমনি তা হয়ে যায়'। (ফেরেশতগণ তাদের পূর্বোক্ত করার জের টেনে বললো) এবং আল্লাহ তাকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দান করবেন, তাওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। (সূরায়ে ইমরাণ, ৪৫-৪৮)

মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়মকে যখন জানালেন, তাঁর গর্ভে এক সন্তান জন্ম লাভ করবে, তিনি অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, আমার বিয়ে হয়নি, আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ পর্যন্ত করেনি, তাহলে আমার সন্তান কি করে হবে? আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতা তাঁকে জানালো, যদিও তোমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি, তবুও তোমার গর্ভে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। এ আয়াতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে 'কাযালিকা' অর্থাৎ এমনই হবে। এই শব্দটি হযরত জাকারিয়ার কথার উত্তরেও বলা হয়েছিল। সেখানে এই শব্দের যা ভাবার্থ ছিল, এখানেও তাই হবে। উপরন্তু পরবর্তী বাক্যাংশ–বরং পূর্বাপর সমস্ত ভাষণ থেকেই এই কথার সমর্থন পাওয়া যে, হযরত মরিয়ামকে যৌন মিলন ব্যতিরেকেই সন্তান জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। আর হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মও প্রকৃতপক্ষে এভাবেই হয়েছিল। অন্যথায় মরিয়ামের গর্ভেও যদি পৃথিবীর অন্যান্য মহিলাদের ন্যায় স্বাভাবিকভাবেই সন্তান জন্ম হয়ে থাকে এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মও যদি স্বাভাবিকভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহলে এ সূরায় চর্তুথ রুকু থেকে ষষ্ঠ রুকু পর্যন্ত যে বর্ণনার ধারা চলে এসেছে তা একেবারে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় এবং মসীহ আলাইহিস সালামের জন্ম সম্পর্কে কোরআনের অন্যান্য স্থানে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা সবই অপ্রয়োজনীয়

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হয়ে পড়ে। খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মানুদ ও আল্লাহর পুত্র এ জন্যই মনে করেছিল যে, অস্বাভাবিকভাবে-পিতা ব্যতীরেকেই তার জন্ম সম্ভব হয়েছিল। আর একটি অবিবাহিতা মহিলার সন্তান হওয়ার ঘটনা সবার সামনেই সংঘটিত হয়েছিল বলেই ইয়াহুদীগণ হযরত মরিয়ামের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল। এটা যদি বাস্তব ঘটনাই না হবে তাহলে এই উভয় দলের বিশ্বাস বা আকিদার প্রতিবাদের জন্য শুধু এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, 'তোমরা ভুল বলছো, সে বিবাহিতা মহিলা ছিল, অমুক ব্যক্তি তার স্বামী ছিল এবং তারই ঔরসে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছে।'

এধরণের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট কথা বলার পরিবর্তে এত দীর্ঘ ভূমিকা করার, পেঁচানো কথা বলার এবং স্পষ্টভাবে 'অমুকের পুত্র মসীহ' না বলে 'মরিয়াম পুত্র মসীহ' বলার কি প্রয়োজন ছিল? কেননা এ ধরণের কথা বলার কারণে কথা সহজ না হয়ে বরং আরো জটিল হয়ে পড়ে। অতএব যারা কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলে মানেন ও সেই সঙ্গে হযরত মসীহ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম স্বাভাবিকভাবে পিতা-মাতার ঔরসে হয়েছিল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তারা প্রকারান্তরে এই কথাই প্রমাণ করতে চান যে, আল্লাহ তাঁর নিজের মনের কথাটুকু সঠিকভাবে প্রকাশ করার ব্যাপারে অন্তত এই লোকদের সমানও ক্ষমতা রাখেন না। (নাউযুবিল্লাহ)

পিতা ব্যতীতই হযরত ঈসার আগমন

আলাইহিস সালাম

হযরত মারয়াম প্রথম ফেরেশতা দেখে মানুষ ভেবেছিলেন। কারণ ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর কাছে এসে সংবাদ দিয়েছিল যে, তাঁর গর্ভে মহান আল্লাহ তাঁর নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে প্রেরণ করবেন। এ কথা শুনে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সাথে ফেরেশতার কি ধরণের কথোপকথন হয়েছিল, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছেঃ-

واذكر فى الكتب مريم-اذا نتبذت من اهلها مكانا
شرقيا-فاتخذت من دونهم حجابا-فارسلنا اليها
روحنا فتمثل لها بشرا سويا-قالت انى اعوذ بالرحمن
منك ان كنت تقيا-قال انما انا رسول ربك-لا هب لك
غلما زكيا-قالت انى يكون لى غلم ولم يمسسنى بشر
ولم اك بغيا-قال كذلك-قال ربك هوعلى هين-ولنجعله

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ايـة لـلنـاس ورحـمـة مـنـا-وكـان امـرا مـقـضـيـا-فـحـمـلـتـه فـانـتـبـذت بـه مـكـانـا قـصـيـا-فـاجـاء هـا الـمـخـاض الـى جـذع الـنـخـلـة-قـالـت يـلـيـتـنـى مـت قـبـل هـذا وكـنـت نـسـيـا مـنـسـيـا-فـنـادىهـا مـن تـحـتـهـا الا تـحـزنـى قـد جـعـل ربـك تـحـتـك سـريـا-وهـزى الـيـك بـجـذع الـنـخـلـة تـسـقـط عـلـيـك رطـبـا جـنـيـا-فـكـلـى واشـربـى وقـرى عـيـنـا-فـامـا تـريـن مـن الـبـشـر احـدا-فـقـولـى انـى نـذرت لـلـرحـمـن صـومـا فـلـن اكـلـم الـيـوم انـسـيـا (مـريـم)

আর (হে মুহাম্মদ!) এই কিতাবে মারয়ামের অবস্থা বর্ণনা করো। যখন সে নিজের লোকদের থেকে আলাদা হয়ে পূর্ব দিকে নির্জনবাসী হয়ে গিয়েছিল এবং পর্দা টেনে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিল। এ অবস্থায় আমি তার কাছে নিজের রূহকে অর্থাৎ (ফেরেশতাকে পাঠালাম এবং সে তার সামনে একটি পূর্ণ মানবিক কায়া নিয়ে হাযির হলো। মারয়াম অকস্মাৎ বলে উঠলো, 'তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করো থাকো তাহলে আমি তোমার হাত থেকে করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি।'

সে বললো, 'আমি তো তোমার রবের দূত এবং আমাকে পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করবো।' মারয়াম বললো, আমার পুত্র হবে কেমন করে যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও নই?'

ফেরেশতা বললো, 'এমনটিই হবে, তোমার রব্ব বলেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ আর আমি এটা এ জন্য করবো যে, এই ছেলেকে আমি লোকদের জন্য একটি নির্দশন ও নিজের পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহে পরিণত করবো এবং এ কাজটি হবেই।'

মারয়াম এ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলো এবং এ গর্ভসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেল। তারপর প্রসববেদনা তাকে একটি খেজুর গাছের তলে পৌছে দিল। সে বলতে থাকলো, 'হায়! যদি আমি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাই না থাকতো।' ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে তাকে ডেকে বললো, 'দুঃখ করো না, তোমার রব্ব তোমার নীচে একটি নহর প্রবাহিত করেছেন এবং তুমি

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এ গাছের কান্ডটি একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর ঝরে পড়বে। তারপর তুমি খাও, পান করো এবং নিজের চোখ জুড়াও। তারপর যদি তুমি মানুষের দেখা পাও তাহলে তাকে বলে দাও, আমি করুণাময়ের জন্য রোযার মানত মেনেছি, তাই আজ আমি কারো সাথে কথা বলবো না।' (সূরায়ে মারয়াম, আয়াত ১৬-২৬)

সূরা আলে ইমরাণে এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত মারয়ামের মা তাঁর মানত অনুযায়ী তাঁকে বাইতুল মাকদিসে ইবাদাতের জন্য বসিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত যকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সেখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে, হযরত মারয়াম বাইতুল মাকদিসের একটি মিহ্‌রাবে ই'তিকাফ করছিলেন। এখানে বলা হচ্ছে যে, মিহ্‌রাবটি হযরত মারয়াম ইতিকাফরত ছিলেন সেটি বাইতুল মাকদিসের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল। সেখানে তিনি ইতিকাফকারীদের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি চাদর টাঙ্গিয়ে দিয়ে নিজেকে অন্যদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন। যারা বাইবেলের সাথে সামাঞ্জস্য রাখার জন্য পূর্বাংশ অর্থে নাসেরাহ নিয়েছেন তারা ভুল করেছেন। কারণ 'নাসেরাহ' জেরুশালেমের উত্তর দিকে অবস্থিত, পূর্ব দিকে নয়।

(মেহরাব শব্দ শোনামাত্রই মসজিদ আমাদের মসজিদ সমূহে ইমামের দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত মেহরাবের কথা সাধারণতভাবে লোকদের মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু এখানে সেই মেহরাবকে বুঝানো হচ্ছে না। গীর্জা, গুরদ্বার প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূল উপাসনালয় ভবন সন্নিহিত ও সমতলভূমি থেকে অনেক উচ্চে যে কক্ষ নির্মিত হয়, যাতে উপাসনালয়ের পুরোহিত, সেবক ও ইতেকাফে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বসবাস করে থাকে, একেই মেহরাব বলা হয়। এই ধরণের কোন একটি কক্ষে হযরত মারয়াম ইতেকাফ করছিলেন।)

সন্তান হওয়ার কথা শুনে হযরত মারয়াম আলাইহিস সালাম বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ফেরেশতার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কুমারী মেয়ে, আমার সন্তান হবে কি করে ! ফেরেশতা বলেছিল, এমনটিই হবে। ফেরেশতার বলা কথার অর্থ এটা হতে পারে না যে, পুরুষ তোমাকে স্পর্শ করবে আর তোমার সন্তান হবে। বরং ফেরেশতার বলা কথার পরিষ্কার অর্থ হলো, কোন পুরুষ মানুষ তোমাকে স্পর্শ না করা সত্ত্বেও তোমার গর্ভে সন্তান হবে। আর সে সন্তান হবে পুত্র সন্তান। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রী যখন বয়সের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁরা মহান আল্লাহর কাছে একটি সন্তানের জন্য আবেদন করেছিলেন, তাঁদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ ফেরেশতা প্রেরণ করে যখন সংবাদ দান করেছিলেন যে, তোমাদের সন্তান হবে এবং সে সন্তানের নাম হবে ইয়াহইয়া। সে নবী হবে। তখন হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম ও বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, এ বয়সে আমার সন্তান কি করে হবে ! তাঁর বিস্ময়ের প্রেক্ষিতেও এ কথা বলা হয়েছিল যে, এমনটিই হবে। আবার হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিঃসন্তান বৃদ্ধা স্ত্রী হযরত সারাহ আলাইহিস সালামের কাছে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দান করা হয়েছিল, তোমার সন্তান হবে। তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁকেও ফেরেশতা জবাব দিয়েছিল, 'যালিকা' অর্থাৎ এমনটিই হবে। সুতরাং হযরত মরিয়াম আলাইহিস

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সালামের ক্ষেত্রে যে যালিকা শব্দ এ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ এটা হবে না যে, গোটা পৃথিবীতে মহান আল্লাহ সন্তান জন্ম নেয়ার যে পদ্ধতি দান করেছেন, হযরত মারয়ামের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। অর্থাৎ পুরুষের সাথে তার সম্পর্ক হবে তারপর সন্তান জন্ম নেবে।

কোরআনে উল্লেখিত আয়াতে যালিকা শব্দের যদি এই অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে আয়াতে বলা পরবর্তী কথাটি একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, তোমার রব্ব বলছেন, এমনটি করা আমার জন্য অতি সহজ কাজ এবং আমি ছেলেটিকে একটি নিদর্শন করতে চাই। নিদর্শন শব্দটি এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে মুজিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ বাক্যটি একথাই প্রকাশ করে যে, এমনটি করা আমার জন্য বড়ই সহজ কাজ। সুতরাং আল্লাহ পরিষ্কারভাবে বলছেন যে, আমি এ ছেলেটির সত্তাকে বনী ইসরাঈলের সামনে একটি মুজিযা হিসেবে পেশ করতে চাই। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সত্তাকে কিভাবে বনী ইসরাঈলের সামনে মুজিযা হিসেবে পেশ করা হয় তা পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে, মার্‌য়াম এ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করলো এবং এ গর্ভসহ একটি দূরবর্তী স্থানে চলে গেল–এখানে দূরবর্তী স্থান বলতে বাইতুল লাহ্‌ম–কে বুঝানো হয়েছে বলে তাফসীরকারগণ বলেছেন। ইতিকাফ থেকে উঠে সেখানে যাওয়া হযরত মার্‌য়ামের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন গোত্রের মেয়ে, যিনি আবার বাইতুল মাকদিসে আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য উৎসর্গীত হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ গর্ভধারণ করলেন। এ অবস্থায় যদি তিনি নিজের ইতিকাফের জায়গায় বসে থাকতেন এবং লোকেরা তাঁর গর্ভধারণের কথা জানতে পারতো, তাহলে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যগণই নয়, গোটা সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকজনও তাঁর জীবন ধারণ কঠিন করে দিতো। তাই তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবার পর নীরবে নিজের ইতিকাফ কক্ষ ত্যাগ করে বাইরে বের হয়ে পড়লেন, যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিজ সম্প্রদায়ের তিরস্কার, নিন্দাবাদ ও ব্যাপক দুর্নাম থেকে রক্ষা পান। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম যে পিতা ব্যতীতই হয়েছিল, এ ঘটনাটি নিজেই তার একটি অকাট্য প্রমাণ। যদি তিনি বিবাহিতা হতেন এবং স্বামীর ঔরসে তাঁর সন্তান জন্মলাভের ব্যাপার হতো তাহলে তো সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ে বা পিতৃগৃহে না গিয়ে একাকী একটি দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার কোন কারণই ছিল না।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে হযরত মার্‌য়াম আলাইহিস সালাম যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআন বলছে সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'হায় ! যদি আমি এর আগেই মরে যেতাম এবং আমার নাম-নিশানাই না থাকতো।' তাঁর এ কথাগুলো থেকে সে সময় তাঁর মনে যে কি অস্থিরতা বিরাজ করছিল তা অনুমান করা যেতে পারে। পরিস্থিতির নাজুকতা সামনে রেখে প্রত্যেক ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রসব বেদনার কষ্টজনিত কারণে তাঁর মুখ থেকে এ ধরণের আক্ষেপ বাণী উচ্চারিত হয়নি বরং আল্লাহ তাঁকে যে পরীক্ষার মুখোমুখী করেছিলেন তাতে কিভাবে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবেন এই চিন্তায় তিনি পেরেশান

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হয়ে পড়েছিলেন। গর্ভাবস্থাকে এ পর্যন্ত যে কোনভাবে গোপন করতে সক্ষম হয়েছেন কিন্তু এখন শিশুটিকে তো গোপন করা যাবে না। এখন এ শিশু নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন?

এ সময়ে আল্লাহর ফেরেশতা এসে তাঁকে বললো, 'দুঃখ করো না, তোমার রব্ব তোমার নীচে একটি নহর প্রবাহিত করেছেন এবং তুমি এ গাছের কান্ডটি একটু নাড়া দাও, তোমার ওপর তরতাজা খেজুর ঝরে পড়বে। তারপর তুমি খাও, পান করো এবং নিজের চোখ জুড়াও।' অর্থাৎ তাঁর আহারের ব্যবস্থা হয়ে গেল। ফেরেশতার কথা থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, হযরত মারয়াম কেন এ কথা বলেছিলেন। বিবাহিতা মেয়ের প্রথম সন্তান জন্মের সময় সে যত কষ্টই অনুভব করুক না কেন, তাঁর মনে কোন দুঃখ বা বেদনাবোধ জাগে না, যদিও শারিরীক কষ্ট তাকে কাতর করে তোলে। কুমারী অবস্থায় সন্তানের জন্ম দান, এ কারণেই তাঁর মনে দুঃখ জেগেছিল এবং ফেরেশতা তাঁকে সান্ত্বনা দান করে বলেছিল, দুঃখ করো না। এ কথা থেকেও প্রমাণ হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে পিতা ব্যতীতই এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিল।

এরপর প্রশ্ন দেখা দিল এ শিশু সম্পর্কে তিনি মানুষকে কি বলবেন? মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সমাধান এসে গেল। তাঁকে ফেরেশতার মাধ্যমে জানানো হলো, 'তারপর যদি তুমি মানুষের দেখা পাও তাহলে তাকে বলে দাও, আমি করুণাময়ের জন্য রোযার মানত মেনেছি, তাই আজ আমি কারো সাথে কথা বলবো না।'

অর্থাৎ শিশুর ব্যাপারে তোমার কিছু বলার প্রয়োজন নেই। তার জন্মের ব্যাপারে যে কেউ আপত্তি তুলবে তার জবাব দেবার দায়িত্ব এখন আমার।

এখানে উল্লেখ্য যে, সে সময়ে বনী ইসরাঈলদের ভেতরে মৌনতা অবলম্বনের রোযা রাখার রীতি ছিল। অর্থাৎ এ ধরণের রোযা রাখলে কোন কথা মুখে উচ্চারণ করা যেতো না। হযরত মারয়ামের প্রকৃত অস্থিরতা কি ছিল, এই আয়াত থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও এ বিষয়টিও প্রণিধান যোগ্য যে, বিবাহিতা মেয়ের প্রথম সন্তান যদি পৃথিবীর আবহমান কালের প্রচলিত নিয়মেই জন্মলাভ করে তাহলে তার মৌন ব্রত অবলম্বনের প্রয়োজন কেন দেখা দেবে?

এই মৌনতা ব্রত অবলম্বনের নির্দেশ দানও প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে মহান আল্লাহ পিতা ব্যতীতই এই পৃথিবীতে এনে একটা নিদর্শনে পরিণত করেছিলেন।

শিশু কণ্ঠের কলকাকলী-আমি আল্লাহর নবী

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনা ঘটাচ্ছেন। এর ভেতরে এই ঘটনাটি এমন যে, ইতিপূর্বে পৃথিবীবাসী এমন কোন ঘটনা অবলোকন করার সুযোগ লাভ করেনি, যা করেছিল শিশু নবী হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিশু কণ্ঠে। পিতা ব্যতীত তিনি মাতৃগর্ভ থেকে আল্লাহর আদেশে এই পৃথিবীতে এলেন। মানুষ তাঁর পবিত্র মা সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করবে। মহান

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আল্লাহ এ কারণে তাঁর শিশু কণ্ঠেই বাক শক্তি দান করেছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁর পরিচয় কিভাবে দিয়েছিলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলছেঃ-

فاتت به قومها تحمله-قالوا يمريم لقد جءت شيا ء
فريا-ياخت هرون ماكان ابوك امراسوء وما كانت امك
بغيا-فاشارت اليه-قالوا كيف نكلم من كان فى المهد
صبيا-قال انى عبد الله-اتنى الكتب وجعلنى نبيا-
وجعلنى مبركا اين ما كنت-واوصنى بالصلوة والزكوة
مادمت حيا-وبرا بوالدتى-ولم يجعلنى جبارا شقيا-
والسلم على يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا-ذلك
عيسى ابن مريم-قول الحق الذى فيه يمترون-ماكان
لله ان يتخذ من ولد-سبحنه-اذا قضى امرا فانما يقول
له كن فيكون (مريم)

তারপর সে এই শিশুটি নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এলো। লোকেরা বলতে লাগলো, 'হে মারয়াম ! তুমি তো মহাপাপ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন ! না তোমার বাপ কোন খারাপ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল কোন ব্যভিচারিণী।'

মারয়াম শিশুর প্রতি ইশারা করলো। লোকেরা বললো, 'কোলের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো ?'

শিশু বলে উঠলো, 'আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকাবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি। শান্তি আমার প্রতি যখন আমি জন্ম নিয়েছি ও যখন আমি মরবো এবং যখন আমাকে জীবিত করে উঠানো হবে।'

এ হচ্ছে মারয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সত্তা। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়। (সূরায়ে মারয়াম, আয়াত ২৭-৩৫)

এর পরের ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে, 'তারপর সে এই শিশুটি নিয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এলো। লোকেরা বলতে লাগলো, 'হে মারয়াম ! তুমি তো মহাপাপ করে ফেলেছো। হে হারুনের বোন ! না তোমার বাপ কোন খারাপ লোক ছিল, না তোমার মা ছিল কোন ব্যভিচারিণী।'

লোকজন তাঁকে হারুনের বোন হিসেবে উল্লেখ করে তাঁকে তিরস্কার করছিল, কিন্তু কোরআনের এ আয়াতের দুটো অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এখানে আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, হযরত মারয়ামের হারুন নামে কোন এক ভাই ছিল। আর দ্বিতীয় যে অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহলো, আরবী বাগ্‌ধারা অনুযায়ী 'উখ্‌তা হারুনা' মানে হচ্ছে হারুন পরিবারের মেয়ে। কারণ আরবীতে এটি একটি প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি। যেমন মুদার গোত্রের লোককে 'ইয়া আখা মুদিরা' অর্থাৎ হে মুদারের ভাই এবং হামাদান গোত্রের লোককে 'ইয়া আখা হামাদান' বলে ডাকা হয়। সুতরাং কোরআনের এ আয়াতের প্রথম অর্থটিকে অনেক তাফসীরকার প্রাধান্য দান করেছেন এ কারণে যে, কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে, তাঁর হারুন নামে একজন ভাই ছিল। আবার কোন কোন তাফসীরকার দ্বিতীয় অর্থটিকে একারণে প্রধান্য দান করেছেন যে, সে সময়ের পরিবেশ ও পরিস্থিত এটাই দাবী করে। আরবী ভাষার বাগ্‌ধারা অনুযায়ী যে অর্থ হবে, এখানে সে অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ এ ঘটনার কারণে জাতির মধ্যে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে বাহ্যত জানা যায় না যে, হারুন নামের এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কুমারী বোন শিশু সন্তান কোলে নিয়ে চলে এসেছিল। বরং যে জিনিসটি বিপুল সংখ্যক লোকদেরকে হযরত মারয়ামের চারদিকে সমবেত করে দিয়েছিল, সেটি এ হতে পারতো যে, বনী ইসরাঈলের পবিত্রতম ঘরানা হারুন বংশের একটি মেয়েকে এ অবস্থায় পাওয়া গেছে। যদিও একটি মারুফ হাদীসের উপস্থিতিতে এ আয়াতের অন্য কোন ব্যাখ্যা ও অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে সঠিক হতে পারে না, তবুও মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযীতে এ হাদীসটি যে সব শব্দসহকারে উদ্ধৃত হয়েছে, তা থেকে এ অর্থ বের হয় না যে, হাদীসের অর্থ অবশ্যই 'হারুনের বোনই হবে'। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণিত হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, নাজরানের খৃষ্টানরা হযরত মুগীরার সামনে আপত্তি উত্থাপন করে বলেছিল, 'কোরআনে হযরত মারয়ামকে হারুনের বোন বলা হয়েছে, অথচ হারুন আলাইহিস সালাম মারয়ামের শত শত বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত মুগীরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খৃষ্টানদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি এবং তিনি ফিরে এসে বিষয়টি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছিলেন। ঘটনা শুনে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাকে বলেছিলেন, 'তুমি এ জবাব দাওনি কেন যে, বনী ইসরাঈলীরা নবী ও সৎ লোকদের সাথে যুক্ত করে নিজেদের নাম রাখতো' !

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথা থেকে শুধুমাত্র এতটুকুই পাওয়া যায় যে, খৃষ্টানদের প্রশ্নে একে বারে লা-জওয়াব হওয়ার চেয়ে অন্তত এ জওয়াবটি দিয়ে তাদের আপত্তি দূরা করা যেতে পারতো।

পবিত্র কোরআন বলছে, হযরত মারয়াম যখন শিশু কোলে করে তাঁর পরিচিত লোকদের মধ্যে এলেন তখন তারা তাঁকে তিরস্কার করতে থাকলো। যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্ম অস্বীকার করে তারা এ কথার কি যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা দিতে পারে যে, হযরত মারয়ামকে শিশু সন্তান কোলে নিয়ে আসতে দেখে তার জাতির লোকেরা তাঁকে এক নাগাড়ে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে লাগলো কেন?

যারা কোরআনের অর্থ বিকৃত করতে অভ্যস্থ তারা, 'মারয়াম শিশুর প্রতি ইশারা করলো। লোকেরা বললো, 'কোলের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো?' এই আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছে যে, 'কালকের শিশুর সাথে আমরা কি কথা বলবো?' অর্থাৎ তাদের মতে এ কথা-বার্তা হয়েছিল হযরত ঈসার যৌবনকালে। তখন বনী ইসরাঈলের নেতৃ পর্যায়ের লোকজন বলেছিল, আমরা এ ছেলেটির সাথে কি কথা বলবো যে কালই আমাদের সামনে দোলনায় শুয়েছিল?

কিন্তু পরিবেশে পরিস্থিতি ও পূর্বাপর আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রেখে সামান্য চিন্তা ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারবে যে, এটি নিছক একটি অর্থহীন ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শুধু মাত্র অলৌকিকতাকে এড়িয়ে চলার জন্য এ পথ অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কিছু না হলেও এ জালেমরা অন্তত এতটুকু চিন্তা করতো যে, তারা যে বিষয়টির ওপর আপত্তি জানাতে এসেছিল তাতো শিশুর জন্মের সময়কার ব্যাপার। তার কৈশোর বা যৌবন কালের ব্যাপার নয়।

তাছাড়া সূরা আল ইমরাণের ৪৬ এবং সুরা মায়েদার ১১০ নম্বর আয়াত দুটো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর যৌবনে নয় বরং মায়ের কোলে সদ্যজাত শিশু থাকা অবস্থায় এ কথা বলেছিলেন। প্রথম আয়াতে ফেরেশতা হযরত মারয়ামকে শিশু জন্মের সুসংবাদ দান করে বলছেন যে দোলনায় শায়িত অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলবে এবং যৌবনে পদার্পণ করেও। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ নিজেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বলছেন, তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় লোকদের সাথে কথা বলবে এবং যৌবনকালেও।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম শিশু থাকা অবস্থায় দোলনায় শায়িত থেকে লোকদেরকে বলেছিলেন, 'আমি আল্লাহর বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন ও নবী করেছেন এবং বরকতময় করেছেন যেখানেই আমি থাকি না কেন আর যতদিন আমি বেঁচে থাকাবো ততদিন নামায ও যাকাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। আর নিজের মায়ের হক আদায়কারী করেছেন এবং আমাকে অহংকারী ও হতভাগা করেননি।'

কোরআনের এ আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাঁর কোন পিতা ছিল না। কারণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এ কথা বললেন না যে, 'আল্লাহ আমাকে পিতা-মাতার হক আদায়কারী করেছেন' বরং তিনি বললেন, আমাকে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

মায়ের হক আদায়কারী করেছেন। এ কথাটিও প্রমাণ করে যে, হযরত ঈসার কোন পিতা ছিল না। পবিত্র কোরআনে যেখানেই তাঁর প্রসঙ্গ এসেছে সেখানেই তাঁকে মারয়ামের পুত্র ঈসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে–সুতরাং কোরআনের এসব বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, তাঁর কোন পিতা ছিল না।

তারপর এ কৌশল অবলম্বন করার ফলে বিপুল সংখ্যক লোক যখন হযরত মারয়ামের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো তখন আল্লাহ এই নবজাত শিশুর মুখ দিয়ে কথা বলালেন, যেন এ শিশু বড় হয়ে যখন নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করবে তখন জাতির হাজার হাজার লোক এ মর্মে সাক্ষ্য দেবার জন্য উপস্থিত থাকে যে, এই ছেলের ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারা আল্লাহর একটি বিস্ময়কর অলৌকিকত্ব দেখেছিল। এ ছেলের জন্ম ও শিশুকালে দোলনায় শুয়ে কথা বলার মধ্যে দিয়েই তখন প্রকাশ পেয়েছিল যে, এই ছেলে বড় হয়ে এমন একটা কিছু হবে। এই নিদর্শন দেখার পরও এই জাতি যখন তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করবে এবং তাঁর আনুগত্য করার পরিবর্তে তাকে অপরাধী সাজিয়ে শূলবিদ্ধ করার চেষ্টা করবে তখন তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে যা পৃথিবীতে কোন জাতিকে দেয়া হয়নি। মহান আল্লাহ বলেন, 'এ হচ্ছে মারয়ামের পুত্র ঈসা এবং এ হচ্ছে তার সম্পর্কে সত্য কথা, যে ব্যাপারে লোকেরা সন্দেহ করছে। কাউকে সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র সত্তা। তিনি যখন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।'

এ পর্যন্ত খৃষ্টানদের সামনে যে কথাটি সুস্পষ্ট করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর পুত্র মনে করার যে আকিদা তারা অবলম্বন করেছে তা মিথ্যা। যেভাবে একটি মুজিযার মাধ্যমে হযরত ইয়াহ্ইয়ার জন্মের কারণে তা তাঁকে আল্লাহর পুত্রে পরিণত করেনি ঠিক তেমনিভাবে অন্য একটি মুজিযার মাধ্যমে হযরত ঈসার জন্মও এমন কোন জিনিস নয় যে জন্য তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করতে হবে। খৃষ্টানদের নিজেদের বর্ণনাসমূহেও এ কথা রয়েছে যে, হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা উভয়েই এক এক ধরণের মুজিযার মাধ্যমে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

জাতির প্রতি হযরত ঈসার আহ্বান

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর জাতিকে আহ্বান করে বলেছিলেন, তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো। আর এটাই হলো সহজ সরল পথ। তিনি কখনো তাঁর পূজা করার জন্য বলেননি। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ভাষ্য হলোঃ–

وان الله ربى وربكم فاعبدوه-هذا صراط مستقيم-
فاختلف الاحزاب من بينهم-فويل للذين كفوا من
مشهد يوم عظيم-اسمع بهم وابصر-يوم ياتوننا لكن

ahlussunnah-bd.blogspot.com

الظلمون اليوم فى ضلل مبين-وانذر هم يوم الحرة اذ قضى الامر-وهم فى غفلة وهم لا يؤمنون-انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون (مريم)

আর (ঈসা বলেছিল) 'আল্লাহ আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ।' কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। যারা কুফরী করলো তাদের জন্য সে সময়টি হবে বড়ই ধ্বংসকর যখন তারা একটি মহাদিবস দেখবে। যখন তারা আমার সামনে হাযির হবে সেদিন তাদের কানও খুব স্পষ্ট শুনবে এবং তাদের চোখও খুব স্পষ্ট দেখবে কিন্তু আজ এই জালেমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। হে মুহাম্মদ ! যখন এরা গাফেল রয়েছে এবং ঈমান আনছে না তখন এ অবস্থায় এদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং পরিতাপ করা ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না। শেষ পর্যন্ত আমিই হবো পৃথিবী ও তার সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী এবং সব কিছু আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (সূরায়ে মারয়াম, আয়াত ৩৬-৪০)

পবিত্র কোরআন বলছে, পৃথিবীর সমস্ত নবী ও রাসুল সেই একই ইসলাম প্রচার করেছেন, ইসলামী আদর্শের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও সেই ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান করেছেন। তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে যে দিকে আহ্বান করেছিলেন, সে সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'আর (ঈসা বলেছিল) 'আল্লাহ আমার রব্ব এবং তোমাদেরও রব্ব। কাজেই তোমরা তার বন্দেগী করো। এটিই সোজা পথ।' কিন্তু তারপর বিভিন্ন দল পরস্পর মতবিরোধ করতে থাকলো। যারা কুফরী করলো তাদের জন্য সে সময়টি হবে বড়ই ধ্বংসকর যখন তারা একটি মহাদিবস দেখবে। যখন তারা আমার সামনে হাযির হবে সেদিন তাদের কানও খুব স্পষ্ট শুনবে এবং তাদের চোখও খুব স্পষ্ট দেখবে কিন্তু আজ এই জালেমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। হে মুহাম্মদ ! যখন এরা গাফেল রয়েছে এবং ঈমান আনছে না তখন এ অবস্থায় এদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাও যেদিন ফায়সালা করে দেয়া হবে এবং পরিতাপ করা ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না। শেষ পর্যন্ত আমিই হবো পৃথিবী ও তার সমস্ত জিনিসের উত্তরাধিকারী এবং সব কিছু আমারই দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'

সূরায়ে মারিয়ামে খৃষ্টানদেরকে শুনানোর জন্য যে বক্তব্য ওপরের আয়াতসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, এর গূঢ় অর্থ ও মাহাত্ম্য একমাত্র তখনই অনুধাবন করা যেতে পারে, যখন এই সূরা অবতীর্ণের ঐতিহাসিক পটভূমি গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হবে। এ কারণে আমরা সূরা মারিয়াম কোন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক পটভূমি এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত ঈসা মানুষ ও রাসুল ছিলেন
আলাইহিস সালাম

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যারা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করে, মহান আল্লাহ তাদেরকে কাফের হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেনঃ-

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم-قل فمن يملك من الله شيا ء ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن فى الارض جميعا-ولله ملك السموت والارض وما بينهما-يخلق مايشاء-والله على كل شىء قدير (المائدة)

নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, মরিয়ম পুত্র মসীহ খোদা। হে মুহাম্মদ! আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, আল্লাহ যদি মরিয়ম পুত্র মসীহকে এবং তাঁর মা ও সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা থেকে তাঁকে বিরত রাখার মতো শক্তি কার আছে ? আল্লাহ তো আকাশ ও জমীন এবং এর ভেতরে অবস্থিত সমস্ত জিনিসেরই মালিক, তিনি যা কিছু চান, তাই সৃষ্টি করেন। তাঁর শক্তি প্রতিটি জিনিসেরই ওপর পরিব্যপ্ত রয়েছে। (সূরায়ে মায়েদাহ, ১৭)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্বকে মানুষ এবং খোদার সংমিশ্রণ মনে করে খৃষ্টানগণ প্রথমে যে ভুল করেছিল, এর ফলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্ব একটা রহস্য ও ধুম্রজালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের ধর্ম নেতাগণ বাকপটুতা ও ধারণা-কল্পনার সাহায্যে এ রহস্য উদ্ঘাটনের যত চেষ্টাই করেছে, ততই বিষয়টা জটিল ও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। যেসব লোকের মনে হযরত ঈসার মানুষ হওয়ার দিকটি অধিক প্রভাব পড়েছে, তারা অধিক জোর দিয়ে বলেছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র এবং তিনজন স্থায়ী স্বতন্ত্র আল্লাহর মধ্যে তিনি একজন। পক্ষান্তরে যাদের মনে ঈসা আলাইহিস সালামের আল্লাহ হওয়ার দিকটি অধিক প্রকটভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তারা হযরত ঈসাকে খোদার দৈহিক আত্মপ্রকাশ বলে একেবারে সরাসরি 'আল্লাহ' বানিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহ হিসেবেই তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ইবাদাত করেছে। যারা মধ্যম পথ বের করতে চেষ্টা করেছে তারা এমন সব শব্দ প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছে যে, যার ফলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে মানুষও বলেও চিহ্নিত করা যেতে পারে আবার

ahlussunnah-bd.blogspot.com

সেই সাথে আল্লাহ বলেও ধারণা করা যেতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ ও মসীহ স্বতন্ত্র সত্তাও হতে পারে আবার একক সত্তাও হতে পারে।

ওপরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তো আকাশ ও জমীন এবং এর ভেতরে অবস্থিত সমস্ত জিনিসেরই মালিক, তিনি যা কিছু চান, তাই সৃষ্টি করেন।' এ আয়াতে এক সুক্ষ্ম ইংগিত দিয়ে বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজা ধরণের জন্ম, তাঁর নৈতিক ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতা ও কৃতিত্ব এবং তাঁর সুস্পষ্ট মুজিজাসমূহ দেখে যারা প্রতারিত হয়েছে ও ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলে মনে করেছে, প্রকৃত পক্ষে তারা একেবারে মূর্খ। ঈসা আলাইহিস সালাম তো আল্লাহর অসংখ্য বিস্ময়কর সৃষ্টির মধ্যে একটি নমুনা মাত্র। এজন্য তাঁকে দেখে এই দুর্বল ও ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের চোখ ঝলসে গিয়েছে। তাদের দৃষ্টি কিছুটা উদার উন্মুক্ত হলে তারা দেখতে পেতো যে, আল্লাহ তাঁর সৃজনী ক্ষমতায় এটার অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সৃষ্টি শক্তি কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। সুতরাং কারো মধ্যে সৃষ্টির পূর্ণত্ব দেখে তাকে সৃষ্টিকর্তা বলে ধারণা করা নিতান্ত অদূরদর্শিতা সন্দেহ নেই। যারা সৃষ্টিকর্তার বিরাট বিস্ময়কর শক্তি ও ক্ষমতার নিদর্শনসমূহ দেখে তা থেকে ঈমানের আলো গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে প্রকৃত বুদ্ধিমান।

খৃষ্টানদের ধারণার তীব্র প্রতিবাদ

খৃষ্টানগণ ধারণা করে নিয়েছে যে, আল্লাহ একা নন, তিনি তিন অংশে বিভক্ত। তাদের এ ধারণার কঠোর প্রতিবাদ করে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ-

لقد كفر الذين قالو ان الله هوالمسيح ابن مريم-وقال المسيح يبنى اسرا عيل اعبدوا الله ربى وربكم-انه من يشرك بالله فقد حرم اللهّ عليه الجنة وماوه النار-ومامن اله الاالله واحد-وان لم ينتهوا عما يقرلون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم-افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه-والله غفور رحيم-ما المسيح ابن مريم الا رسول-قد خلت من قبله الرسول-وامه صديقة-كانا ياكلن الطعام-انظر كيف نبين لهم الايت ثم انظر

ahlussunnah-bd.blogspot.com

انى يؤفكون-قل اتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرا ولا نفعا-والله هو السميع العليم-قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم غيوا لحق ولاتتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل (الماعدة)

নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা যারা বলেছে মসীহ ইবনে মরিয়ামই হচ্ছে আল্লাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব করো, যিনি আমারও রব্ব ও তোমারও রব্ব।' বস্তুত লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাওকে শরীক করেছে, আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এসব জালিমের কোন সাহায্যকারী নেই। নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। এ লোকেরা যদি তাদের এসব কথা থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। তারা কি আল্লাহর কাছে তওবা করবে না, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না ? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু। মরিয়াম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না–একজন রাসুল ব্যতীত। তাঁর পূর্বে আরো অনেক রাসুল অতীত হয়ে গিয়েছে। তাঁর মাতা এক পবিত্র সত্য নিষ্ঠ মহিলা ছিল। তাঁরা দু'জনই স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করতো। লক্ষ্য করো, তাদের সম্মুখে সত্যের নিদর্শনসমূহ আমি কিভাবে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি। তারপর এটাও লক্ষ্য করো যে, তারা কিভাবে বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।

তাদেরকে বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে সেই জিনিসের দাসত্ব ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার ?' অথচ সব কিছু শুনার ও সব কিছু জানার ক্ষমতাশালী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। বলো, হে আহলি কিতাব ! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং সেই লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে পথভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে ও অনেক লোককে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছে এবং সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। (সূরায়ে মায়েদাহ, আয়াত নম্বর ৭২-৭৭)

উল্লেখিত আয়াতে হযরত ঈসার আল্লাহ হওয়া সম্পর্কিত খৃষ্টানী ধারণার এত তীব্র ও সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, এটা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

করা সম্ভব নয়। হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন, তা কারো জানার আগ্রহ থাকলে কোরআনের এ আয়াতে বর্ণিত আলামতসমূহ পাঠ করে সন্দেহাতীতরূপে জানতে পারবে যে, তিনি একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। তিনি যে একজন নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর বংশনামা পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। মানুষের মতই তিনি দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। মানুষের মতই কতকগুলো সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ, মানুষের মতই কতকগুলো শর্তের অধীন এবং মানুষের মতই কতকগুলো গুণে গুণান্বিত ছিলেন তিনি।

তিনি ঘুমাতেন, খাদ্য গ্রহণ করতেন, শীত ও গ্রীষ্ম অনুভব করতেন, এমনকি শয়তানের দ্বারা তাঁকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এ ধরণের একজন ব্যক্তি আল্লাহ ছিলেন, অথবা আল্লাহর কাজে শরীক ও অংশীদার ছিলেন–এমন চিন্তা কি কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ধারণা করতে পারে ? কৌতুকের বিষয় হলো, খৃষ্টানরা নিজেদের কিতাবে হযরত ঈসা মসীহের জীবনকে সুস্পষ্টভাবে একজন মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্নই দেখতে পায়, কিন্তু এরপরও তাঁকে খোদায়ী গুণে গুণান্বিত করার জন্য তাদের সীমাহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ ধরণের মানসিকতাকে মানব চিত্তের ভ্রান্ত হওয়ার এক আশ্চর্যজনক প্রবণতা ব্যতীত আর কি-ই বা বলা যেতে পারে ? আসল বিষয় হলো, বাস্তব জগতে আত্মপ্রকাশকারী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে খৃষ্টানরা আদৌ অনুসরণ করে না এবং তাঁকে মানেও না, বরং তারা নিজেদের কল্পনা ও ধারণা অনুমানের সাহায্যে এক কাল্পনিক ঈসা মসীহকে নির্মাণ করে তাকে মহান আল্লাহর আসনে আসীন করেছে।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে আহলি কিতাব ! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং সেই লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে পথভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে ও অনেক লোককে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছে এবং সত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।' যেসব ভ্রষ্ট জাতির কাছ থেকে খৃষ্টানগণ বাতিল দর্শন, বিশ্বাস ও বাতিল কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে, এ আয়াতে সেসব জাতির দিকেই স্পষ্ট ইংগিত দান করা হয়েছে। গ্রীক দর্শনের তীব্র প্রভাবে পড়ে, গ্রীকের বাতিল দর্শনের গড্ডালিকা প্রবাহে খৃষ্টানরা যেভাবে ভেসে গিয়েছিল, উল্লেখিত আয়াতে সেদিকেই বিশেষভাবে ইশারা দেয়া হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রাথমিক পর্যায়ের অনুসারীদের যে বিশ্বাস ছিল, তার অধিকাংশ তাদের কাছে এক বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্য ছিল ও তাদের পথ প্রদর্শকগণই তা প্রচার করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগের খৃষ্টানগণ একদিকে ঈসা-ভক্তি ও তাঁর প্রতি সম্মানবোধের আতিশয্যে এবং অপরদিকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের কুসংস্কার ও দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেদের বিশ্বাসের আতিশয্যমূলক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছিল এবং এক সম্পূর্ণ অভিনব ধর্মমত আবিষ্কার করে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নিয়েছিল। তাদের এই ধর্মমতের সাথে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রচারিত মূল ইসলামের দূরতম সম্পর্কও বিদ্যমান ছিল না। এ পর্যায়ে খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ রেভারেন্ড চার্লস এন্ডারসন স্কট-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার চতুর্দশ সংস্করণে 'ঈসা মসীহ' (Jesus Christ) শিরোনামায় তিনি এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন।

ঈসা আলাইহিস সালামের অভিশাপ

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে যারা স্বয়ং আল্লাহ বলে, তাঁর মাকে আল্লাহর কিছু একটা বলে বা ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর সন্তান বলে, তাদের প্রতি স্বয়ং ঈসা আলাইহিস সালাম অভিশাপ প্রদান করেছেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর জান্নাত হারাম বলে ঘোষনা করেছেন। তিনি তাঁর জাতির কাছে যেসব উক্তি করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছেঃ-

لقد كفر الذين قالو ان الله هوالمسيح ابن مريم-وقال المسيح يبنى اسرا عيل اعبدوا الله ربى وربكم-انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماوهِ النار-ومامن اله الااله واحد-وان لم ينتهوا عما يقرلون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم-افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه-والله غفور رحيم-ما المسيح ابن مريم الا رسول-قد خلت من قبله الرسول-وامه صديقة-كانا ياكلن الطعام-انظر كيف نبين لهم الايت ثم انظر انى يؤفكون-قل اتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضرا ولا نفعا-والله هو السميع العليم-قل ياهل الكتب لاتغلوا فى دينكم غيوا لحق ولاتتبعوا اهواء

ahlussunnah-bd.blogspot.com

قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل-لعن الذين كفروا من بنى اسراعيل على لسان داود وعيسى ابن مريم-ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (المائدة)

নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে মসীহ ইবনে মার্য়ামই হচ্ছে আল্লাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল, 'হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব করো, যিনি আমারও রব্ব তোমাদেরও রব্ব।' বস্তুত যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কারো শরীক করেছে, আল্লাহ তাদের ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এসব জালিমের কেউই সাহায্যকারী নেই। নিশ্চয়ই কুফরী করেছে তারা, যারা বলেছে, আল্লাহ তিনজনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই। এ লোকেরা যদি তাদের এসব কথা থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদান করা হবে। তারা কি আল্লাহর কাছে তওবা করবে না, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে না? বস্তুত আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।

মরিয়াম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না–একজন রাসূল ব্যতীত। তার পূর্বে আরও অনেক রাসুলই অতীত হয়ে গিয়েছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যনিষ্ঠ মহিলা ছিল। তারা দু'জনই স্বাভাবিক নিয়মে খাদ্য গ্রহণ করতো। লক্ষ্য করো, তাদের সম্মুখে সত্যের নিদর্শনসমূহ আমি কিভাবে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরছি। তারপর এটাও লক্ষ্য করো যে, তারা কিভাবে বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।

তাদেরকে বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে সেই জিনিসের ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার? অথচ সব কিছু শুনার ও সব কিছু জানার ক্ষমতাশালী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। বলো, হে আহলি কিতাব ! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং সেই লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে ও অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সত্য সহজ সরল পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যেসব লোক কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়াম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। (সূরা মায়েদাহ, আয়াত নম্বর ৭২-৭৮)

কোরআনের এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আল্লাহ হওয়া সম্পর্কিত খৃষ্টানদের ধারণার এত সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, এর চেয়ে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কঠোর প্রতিবাদের ভাষা আর হতে পারে না। হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম প্রকৃত পক্ষে কি ছিলেন, তা কারো জানার ইচ্ছে হলে উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত আলামতসমূহ থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারবে যে, তিনি একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই ছিলেন না। তিনি যে মহিলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর বংশ নামা পর্যন্ত বর্তমানে রয়েছে। মানুষের মতই তিনি দেহ বিশিষ্ট ছিলেন। মানুষের মতই তিনি কতকগুলো সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন, মানুষের মতই কতকগুলো শর্তের অধীন এবং মানুষের মতই কতকগুলো গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

তিনি নিদ্রা যেতেন, আহার করতেন, শীত গ্রীষ্ম অনুভব করতেন, দুঃখ-বেদনা অনুভব করতেন। শয়তান কর্তৃক তাঁকে কঠিন পরক্ষীয় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এমন একজন মানুষ আল্লাহ ছিলেন, অথবা আল্লাহর কাজে শরীক ও অংশীদার ছিলেন, এমন কোন কথা কোন বুদ্ধিমান মানুষই কি কল্পনা করতে পারে ? সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হলো, খৃষ্টানগণ নিজেদের কিতাবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সম্পূর্ণ জীবনকে পরিষ্কারভাবে একজন মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্নই দেখতে পায়, কিন্তু তারপরও তাঁকে খোদায়ী গুণে গুণান্বিত প্রমাণ করার জন্য তাদের উপর্যুপরি প্রচেষ্টা বর্তমান সময় পর্যন্তও অব্যাহত রয়েছে।

এই ধরণের নীচুমানের প্রবণতাকে মানব চিত্তের ভ্রষ্ট হওয়ার এক আশ্চর্যজনক প্রবণতা ব্যতীত আর কি-ই বা বলা যেতে পারে? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বাস্তব পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশকারী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে খৃষ্টানগণ আদৌ মানে না। বরং তারা নিজেদের কল্পনা ও ধারণা অনুমানের সাহায্যে এক কাল্পনিক মসীহ নির্মাণ করে তাকে তারা আল্লাহর আসনে আসীন করার চেষ্টা করে মাত্র।

কোরআনের উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে ত্যাগ করে সেই জিনিসের ইবাদাত ও পূজা-উপাসনা করো, যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার ? অথচ সব কিছু শুনার ও সব কিছু জানার ক্ষমতাশালী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। বলো, হে আহলি কিতাব ! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং সেই লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে ও অনেক লোককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সত্য সহজ সরল পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যেসব লোক কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়াম পুত্র ঈসার মুখে অভিশাপ করা হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল।'

এ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যেসব জাতি ঐতিহাসিকভাবেই পথ ভ্রষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। এসব পথহারা জাতির কাছ থেকেই খৃষ্টান জগৎ ভুল আকীদা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। গ্রীক দর্শনের কবলে নিমজ্জিত হয়ে কিভাবে খৃষ্টান জগৎ বিভ্রান্ত হয়েছে, এই গ্রন্থের অন্যত্র তা আমরা উল্লেখ করেছি।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মোজেযাসমূহ

হযরত মারয়াম আলাইহিস সালাম যেমন ছিলেন আল্লাহর এক অকাট্য নিদর্শন এবং তাঁর পবিত্র সন্তান হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন তাঁর চেয়েও বড় নিদর্শন। পিতা ব্যতীতই তাঁর জন্ম, শিশুকালে কথা বলা এবং বয়স কালে তাঁর দ্বারা অসম্ভব কার্য সাধন। এসবই ছিল তাঁর নবী হওয়ার অকাট্য দলীল। অথচ তাঁর সম্পর্কে খৃষ্টানদের ধারণা হলো তিনি আল্লাহর সন্তান। এ সম্পর্কে কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেনঃ-

يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا اجبتم-قالوا لاعلم لنا-انك انت علام الغيوب-اذ قال الله يعسى ابن مريم اذكرنعمتى عليك وعلى والدتك-اذ ايدتك بروح القدس-تكلم الناس فى المهد وكهلا-واذ علمتك الكتب والحكمة والتورية والانجيل-واذ تخلق من الطين كهيءة الطير باذنى فتنفخ فيها فتكون طير باذنى وتبرىء الاكمه والابرص باذنى-واذتخرج الموتى باذنى-واذ كففت بنى اسرا عيل عنك اذ جءتهم بالبينت فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين-واذ اوحيت الى الحوا رين ان امنوا بى وبرسولى-قالوا امنا واشهد باننا مسلمون-اذ قال الحوا ريون يعسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا ماءدة من السماء-قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين-قالوا نريد ان ناكل منها وتطمءن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ونكون عليها من الشهدين-قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماعدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك-وارزقنا وانت خير الرزقين-قال الله انى منزلها عليكم-فمّن يكفر بعد منكم فانى اعذ به عذابا لااعذبه احدا من العلمين-واذ قال الله يعسى ابن مريم ء انت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله-قال سبحنك ما يكون لى ان اقول ماليس لى بحق-ان كنت قلته فقد علمته-تعلم ما فى نفسى ولااعلم ما فى نفسك-انك انت علام الغيوب-ماقلت لهم الا ما امرتنى به ان اعبدوا الله ربى وربكم-وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم-فلما توفيتنى كنت انت الرقيب عليهم-وانت على كل شىء شهيد-ان تعذ بهم فانهم عبادك-وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم-قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم-لهم جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها ابدا-رضى الله عنهم ورضوا عنه-ذلك الفوز العظيم-لله ملك السموت والارض وما فيهن-وهو على كل قدير (الماعدة)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

যেদিন আল্লাহ সমস্ত রাসুলকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন যে, 'তোমাদেরকে কী জওয়াব দেয়া হয়েছে ?' তখন তারা বলবে, 'আমরা কিছুই জানি না, তুমিই সমস্ত গোপন সত্য ও নিগূঢ় তত্ত্ব জানো।' সে সময়ের কথা চিন্তা করো, যখন আল্লাহ বলবেন, হে মরিয়াম পুত্র ঈসা ! আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ করো। যা আমি তোমাকে ও তোমার মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক রূহ দিয়ে তোমাকে সাহায্য করেছি। তুমি আমার আদেশে মাটি দিয়ে পাখির আকৃতির পুতুল নির্মাণ করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে আর সেটা আমার আদেশক্রমে পাখি হতো। তুমি আমারই আদেশক্রমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত মানুষদেরকে বের করে আনতে। পরে তুমি যখন বনী ইসরাঈলের কাছে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত নিদর্শন সমূহ নিয়ে পৌছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল, তারা বললো যে, এই নিদর্শনগুলো যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।

তখন আমিই তোমাকে তা থেকে বাঁচিয়েছি। আর আমি যখন হাওয়ারীদেরকে ইশারা করে বললাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসুলের প্রতি ঈমান আনো, তখন তারা বললো, আমরা ঈমান আনলাম আর সাক্ষী থেকো যে, আমরা মুসলিম। হাওয়ারীদের প্রসংগে এই ঘটনাও স্মরণ রেখো যে, তারা যখন বললো, হে মার্য়াম পুত্র ঈসা ! আপনার রব্ব আসমান থেকে খাদ্য-ভরা একটা খাঞ্চা কি আমাদের জন্য অবতীর্ণ করতে পারেন ? তখন ঈসা বললো, আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা মুমিন হও।

তারা বললো, আমরা শুধু এটাই চাই যে, সেই খাঞ্চা থেকে আমরা খাবার খাবো এবং আমাদের হৃদয় শান্ত ও পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জানতে পারবো যে, আপনি আমাদের কাছে যা কিছু বলেছেন, তা সত্য; আমরা এর সাক্ষী রয়েছি। এ সময় ঈসা ইবনে মার্য়াম দোয়া করলো, হে আমাদের রব্ব ! আমাদের পরোওয়ারদেগার ! আমাদের প্রতি আসমান থেকে একটি খাদ্য-ভরা খাঞ্চা অবতীর্ণ করো, যা খুশী ও আনন্দের উপলক্ষ হবে এবং তোমার কাছ থেকে তা একটি নিদর্শন স্বরূপ হবে। আমাদেরকে রিযিক দাও, তুমিই সবচেয়ে উত্তম রিযিকদাতা। আল্লাহ উত্তরে বললেন, আমি তোমাদের প্রতি তা অবতীর্ণ করবো, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, তাকে আমি এমন শাস্তি দান করবো যে, যা পৃথিবীর কাউকে দেইনি।

যাই হোক, (এসব দান অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেন, হে ঈসা ইবনে মার্য়াম ! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মা'কেও ইলাহ বানিয়ে নাও ? তখন উত্তরে সে বলবে, মহান পবিত্র আল্লাহ, এমন কোন কথা বলা আমার কাজ নয়, এ ধরণের বলার কোনই অধিকার আমার ছিল না। এমন কথা যদি আমি বলে থাকতাম, তবে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনি জানেন আমার মনে যা কিছু আছে, কিন্তু আমি জানি না যা কিছু আপনার মনে রয়েছে। আপনি তো সমস্ত গোপন তত্ত্ব কথাই জানেন। আমি তাদেরকে এটা ছাড়া আর কিছুই বলিনি–বলেছি শুধু তাই যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে,

ahlussunnah-bd.blogspot.com

(জনমন্ডলী ! তোমরা) আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি আমারও রব্ব তোমাদেরও রব্ব। আমি সেই সময় পর্যন্ত তাদের তত্ত্বাবধায়ক-পরিচালক ছিলাম, যতক্ষণ তাদের মধ্যে অবস্থান করছিলাম। কিন্তু আপনিই যখন আমাকে ফেরৎ ডেকে পাঠালেন, তখন তো আপনি ছিলেন তাদের সংরক্ষক আর আপনি তো সমগ্র জিনিসের ওপর দৃষ্টিমান। এখন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দাহ আর যদি ক্ষমা করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও অতীব বুদ্ধিমান। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ সেই দিন, যে দিনে সত্যপন্থীদেরকে তাদের সত্যনিষ্ঠা কল্যাণ দান করবে। তাদের জন্য এমন বাগান সজ্জিত হবে, যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। এখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, বস্তুত এটাই বিরাট সাফল্য। আকাশ জগত ও পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহী আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ এবং তিনি প্রতিটি জিনিসেরই ওপর পরাক্রমশালী। (সূরায়ে মায়েদাহ, ১০৯-১২০)

কিয়ামতের দিন প্রাথমিকভাবে সমস্ত নবীকে সমবেতভাবে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা যখন মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলে, তখন পৃথিবীর মানুষ তোমাদেরকে কি জওয়াব দিয়েছিল ? নবী ও রাসুলগণ আল্লাহর কাছে বলবেন, আমরা তো কেবল বাহ্যিক সীমাবদ্ধ জওয়াবকেই জানি, যা আমরা আমাদের জীবন কালে পেয়েছি বলে অনুভূত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমাদের দাওয়াত জ্ঞাপনের প্রতিক্রিয়া কোথায় কিভাবে কতদূর হয়েছে, এর সঠিক জ্ঞান (হে আল্লাহ) তুমি ব্যতীত আর কারো হতে পারে না।

এরপর প্রতিটি নবী ও রাসুলকে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হবে ও তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে সুস্পষ্টভাবে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে যে প্রশ্ন করা হবে, এ আয়াতে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কে মহান আল্লাহ যেসব মুজিযা দান করেছিলেন, তা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে জীবনের অবস্থায় নিয়ে আসতেন। দুরারোগ্য রোগসমূহ তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাময় করতে পারতেন।

এরপর মহান আল্লাহ তাঁকে হাওয়ারীদের প্রসংগে বলেছেন, হাওয়ারীগণ যে তোমার প্রতি ঈমান এনেছিল, তাও ছিল মূলত আমারই অনুগ্রহ ও সুযোগ দানের ফসল। অন্যথায় এই অস্বীকারকারী জনতার মধ্য থেকে তোমাকে সত্য বলে স্বীকার করে এমন একজন লোকও বানিয়ে নেয়ার কোন সামর্থ্যই তোমার ছিল না। কোরআনের এ আয়াত থেকে এটাই পরিষ্কার হলো যে, হাওয়ারীদের আসল আদর্শ ছিল ইসলাম, খৃষ্টানদের ধারণা অনুসারে বর্তমানের খৃষ্টান ধর্ম নয়। আর এটাও সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কাছ থেকে যেসব শিষ্য-শাগরিদ সরাসরি আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হযরত ঈসা মসীহ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আলাইহিস সালাম কে নিছক একজন মানুষ ও আল্লাহর একজন বান্দাহ-ই মনে করতেন এবং তাঁদের এই পথ প্রদর্শক ব্যক্তি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লাহর সাথে শরীক বা আল্লাহর পুত্র, এমন কোন অমূলক ধারণা তাদের সুদূর চিন্তা-কল্পনায়ও স্থান লাভ করেনি। উপরন্তু মসীহ নিজেই নিজেকে তাদের সম্মুখে একজন অক্ষম অসমর্থ মানুষ হিসেবেই পেশ করেছেন।

উল্লেখিত আয়াতে যে খাদ্য-ভরা খাঞ্চার কথা বলা হয়েছে, এই খাদ্য-ভরা খাঞ্চা প্রকৃত পক্ষেই তা অবতীর্ণ হয়েছিল, বা হয়নি, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ নীরব নির্বাক। হাদীস বা অন্য কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমেও এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। গবেষকগণ ধারণা করেছেন যে, তা অবতীর্ণ করা হয়েছিল, আর এমন হওয়ারও সম্ভাবনা আছে যে, মহান আল্লাহ যে ভীতি প্রদর্শন করলেন, এরপর যদি কেউ কুফরী অবলম্বন করে তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দান করা হবে, যা ইতিপূর্বে পৃথিবীর কাউকে দান করা হয়নি। এই বিভীষিকাময় ধমক শুনে তারা হয়ত তাদের দাবী প্রত্যাহার করেছিল।

খৃষ্টানগণ আল্লাহর সাথে সাথে কেবল ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম ও রূহুল কুদ্‌সকে খোদা বানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামের জননী হযরত মারয়ামকেও তারা এক স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু বাইবেলে হযরত মারয়ামের খোদা হওয়া সম্পর্কে সামান্যতম কোন ইশারা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। মসীহ আলাইহিস সালামের প্রাথমিক তিন শত বছর পর্যন্ত খৃষ্টান জগৎ এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে আলেকজান্দ্রিয়ার কোন কোন ধর্ম পন্ডিত সর্ব প্রথমে হযরত মারয়ামকে 'উম্মুল্লাহ' বা খোদার মাতা বলে অভিহিত করতে শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে হযরত মারয়ামকে স্বতন্ত্র একজন খোদা বলে মনে করা ও হযরত মারয়ামের পূজা করার প্রথা খৃষ্টান সমাজে চলতে শুরু করে। কিন্তু প্রথম প্রথম গীর্জা কর্তৃপক্ষ এই প্রথাকে রীতিমত স্বীকার করে নিতে কোন ক্রমেই প্রস্তুত ছিল না। বরং হযরত মারয়ামের পূজাড়ীদেরকে তারা বলতো, 'এরা সম্পূর্ণ ভুল বিশ্বাসের ওপরে চলছে, এরা ভ্রান্ত।' এরপর মসীহের একক সত্তায় দুটো স্বতন্ত্র ব্যক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল এই ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে খৃষ্টান জগতে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া ঝাটির প্রচন্ড তরংগের সৃষ্টি হলো, তখন তারা এ সমস্যার সমাধানার্থে ৪৩১ খৃষ্টাব্দে 'আফসোস' শহরে এক কাউন্সিল বসে এবং সেই কাউন্সিলে প্রথম বার গীর্জার সরকারী ভাষায় হযরত মারয়ামকে উম্মুল্লাহ বা খোদার জননী উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ফলে মারয়াম-পূজার যে রোগ এতদিন পর্যন্ত গীর্জার বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে বর্তমান ছিল, এরপর থেকে তা গীর্জার অভ্যন্তরেও অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। এমনকি কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে হযরত মারয়ামকে খৃষ্টান জগৎ একজন বড় ধরণের দেবী বানিয়ে নিলো। এতবড় দেবী বানানো হলো যে, পিতা, পুত্র ও রূহুল কুদ্‌স-এই তিনজনই মারয়ামের সামনে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

একেবারে নগণ্য হয়ে দেখা দিল। তাঁর প্রতিকৃতি বিভিন্ন স্থানে গীর্জার মধ্যে স্থাপন করা হলো। তাঁর মূর্তির সামনে ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে শুরু করলো। তাঁর কাছে দোয়া প্রার্থনার রীতি চালু করা হলো। তাঁর সম্পর্কে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল করা হলো যে, মারয়ামই ফরিয়াদ শ্রবণকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ বিদূরণকারী এবং অসহায়দের একমাত্র আশ্রয়স্থল। একজন খৃষ্টান বান্দার পক্ষে সবচেয়ে বড় বিশ্বাসের উপকরণ এই ছিল যে, সে আল্লাহর মাতার সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

এমনকি কাইজার জাষ্টনিয়ন স্বীয় এক আইনের ভূমিকায় হযরত মারয়ামকে স্বীয় রাজ্যের সাহায্যকারী ও বন্ধু বলে ঘোষণা করেছিল। তার প্রখ্যাত জেনারেল নার্সীস যুদ্ধের ময়দানে হযরত মারয়ামের কাছে হেদায়েত ও পথ নির্দেশনা কামনা করতো। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগের কাইজার-হেরাকল তার রাজকীয় পতাকার ওপর হযরত মারয়ামের ছবি অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস অনুসারে খোদার মাতার ছবি অঙ্কন করেছিল। তারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতো যে, এই ছবির মহিমায় এই পতাকা কখনো ধূলায় লুণ্ঠিত হবে না। যদিও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে সংশোধন ও সসংস্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রভাবে প্রোটেষ্ট্যন্ট পন্থী খৃষ্টানগণ মারয়ামকে পূজা করার বিরুদ্ধে প্রচন্ড প্রতিবাদের ঝড় তোলে, কিন্তু রোমান ক্যাথলিক গীর্জা আজ পর্যন্তও সেই একই মত অনুসরণ ও বিশ্বাস করে আসছে।

হযরত ঈসার রক্ষাকারী স্বয়ং আল্লাহ

আলাইহিস সালাম

ইসলাম বিরোধিগণ অন্যান্য নবী রাসুলদের ন্যায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়ার ষড়যন্ত্র যখন তারা করেছিল, এ অবস্থায় মহান আল্লাহ তাঁকে কিভাবে রক্ষা করেছিলেন, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছেঃ-

ورسولا الى بنى اسرا عيل-انى قد جءتكم باية من ربكم انى اخلق لكم من الطين كهيءة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله-وابرىء الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله- وانبءكم بما تاكلون وما تدخرون فى بيوتكم-ان فى ذلك لاية لكم ان كنتم مؤمنين-

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ومصدقالما بين يدى من التورة ولاحل لكم بعض الذى
حرم عليكم وجءتكم باية من ربكم-فاتقوا الله
واطيعون-ان الله ربى وربكم فاعبدوه-هذا صراط
مستقيم-فلما احس عيسى منهم الكفر قال من
انصارى الى الله-قال الحواريون نحن انصار الله-امنا
بالله-واشهد بانا مسلمون-ربنا امنا بما انزلت
واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين-ومكروا ومكر
الله-والله خير المكرين-اذ قال الله يعيسى انى
متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيمة-ثم الى
مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون-فاما
الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والاخرة-
وما لهم من نصرين-واما الذين امنوا الصلحت
فيوفيهم اجورهم-والله لايحب الظلمين-ذلك نتلوه
عليك من الايت والذكرالحكيم-ان مثل عيسى عند
الله كمثل ادم-خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون-
الحق من ربك فلاتكن من الممترين-فمن حاجك فيه
من بعد ماجاء ك من العلم فقل تعالوا ندع-ابناء نا

ahlussunnah-bd.blogspot.com

وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم-ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكذبين-ان هذا لهو القصص الحق-ومامن اله الا الله-وان الله لهو العزيز الحكيم-فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين (العمران)

এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি স্বীয় রাসুল হিসেবে নিযুক্ত করবেন। (যখন সে রাসুল হিসেবে বনী ইসরাঈলদের কাছে উপস্থিত হলো, তখন বললো) 'আমি তোমাদের রব্ব-এর তরফ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সম্মুখেই মাটি দিয়ে পাখীর আকারে একটি প্রতিকৃতি বানাই এবং তাতে ফুৎকার প্রদান করি, তা আল্লাহর নির্দেশে পাখী হয়ে যায়। আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে ভালো করে দিই এবং মৃতকে জীবন্ত করি। আমি তোমাদেরকে বলে দেই, তোমরা ঘরে কি খাও, আর কি সঞ্চয় করে রাখো। এতে তোমাদের জন্য যথেষ্ট নিদর্শন রয়েছে, অবশ্য যদি তোমরা ঈমান আনতে প্রস্তুত হয়ে থাকো। এবং তাওরাতের যে শিক্ষা ও পথ নির্দেশনা এখন আমার সম্মুখে বর্তমান আছে আমি তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী হয়ে এসেছি। এ জন্যও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে এমন কতিপয় জিনিস তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করে দিবো। জেনে রেখো, আমি তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়েই উপস্থিত হয়েছি। অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমারও রব্ব, তোমাদেরও রব্ব। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কবুল করো। বস্তুত এটাই সঠিক ও সোজা পথ।

ঈসা যখন অনুভব করলো যে, বনী ইসরাঈলগণ কুফরী ও অস্বীকৃতির জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তখন সে বললো, আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে ? হাওয়ারীগণ উত্তরে বললো, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম-আল্লাহর আনুগত্য আত্মসমর্পণকারী। হে আমাদের রব্ব ! তুমি যে ফরমান অবতীর্ণ করেছো আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রাসুলের অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও। এরপর বনী ইসরাঈলগণ (ঈসা মসীহর বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। আল্লাহও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। আর এ ধরণের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে থাকেন।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

(এটা আল্লাহরই এক গোপন ব্যবস্থাপনা ছিল) যখন তিনি বলেছিলেন, 'হে ঈসা! এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবো এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নিবো। যারা তোমাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের (সংশ্রব, সাহচর্য ও পংকিল পরিবেশ) থেকে তোমাকে পবিত্র করবো। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে, তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী করে রাখবো। অবশেষে তোমাদের সবাইকেই আমার কাছে ফিরিয়ে আসতে হবে। তখন আমি সেসব বিষয়েই মীমাংসা করে দিবো যেসব বিষয়ে তোমাদের মতবিরোধ রয়েছে।

যারা কুফরী ও অস্বীকৃতির ভূমিকা অবলম্বন করেছে তাদেরকে আমি ইহকাল-পরকাল সবর্ত্রই কঠিন শাস্তি দান করবো এবং তারা (এই শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য) কোন সাহায্যকারী পাবে না। পক্ষান্তরে যারা ঈমান ও সৎকার্যের নীতি অবলম্বন করেছে তাদেরকে তাদের প্রতিফল পুরোপুরি দান করা হবে। ভালো করে জেনে রাখো, আল্লাহ জালিমকে মোটেই ভালোবাসেন না। এই যা কিছু আমি তোমাকে শুনাচ্ছি, এটা (আমার) আয়াত এবং যুক্তি ও জ্ঞানময় উপদেশ বিশেষ। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো, এভাবে যে, আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হও আর সে হয়ে গেল। এটাই প্রকৃত ও যথার্থ সত্য কথা, যা তোমার রব্ব-এর তরফ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে। অতএব তোমরা সেসব লোকের মধ্যে শামিল হয়ো না, যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

তোমার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এখন যে কেউ এই ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে, হে মুহাম্মাদ! তাকে বলে দাও, 'এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের ও তোমাদের পুত্রদের ও স্ত্রীদের এবং আমরা ও তোমরা নিজেরাও উপস্থিত হই, এরপর আল্লাহর কাছে দোয়া করি যারা, যে মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক। এটা সম্পর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল ঘটনা আর প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই মাবুদ নেই এবং আল্লাহর পরাক্রম সবকিছুর ওপর পরিব্যপ্ত ও তাঁর প্রাজ্ঞ ব্যবস্থাসমূহ বিশ্বলোকের সর্বত্র কার্যকর। অতএব তারা যদি (এ শর্তে মোকাবিলা করতে) প্রস্তুত না হয়, তবে (তারাই যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তাই প্রমাণিত হবে আর) আল্লাহ তো বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অবস্থা ভালো করেই জানেন। (সূরায়ে ইমরাণ, ৪৯-৬৩)

আমি তোমাদের রব্ব-এর তরফ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন নিয়ে এসেছি–অর্থাৎ এই নিদর্শন তো তোমাদের এই বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, আমি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপালক ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর প্রেরিত। অবশ্য সেজন্য তোমাদের মধ্যে সত্যকে মেনে নেয়ার মতো মনোভাব থাকা ও কোন ধরণের গোঁড়ামী না থাকা একান্তই অপরিহার্য।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এবং তাওরাতের যে শিক্ষা ও পথ নির্দেশনা এখন আমার সম্মুখে বর্তমান আছে আমি তার সত্যতা প্রতিপন্নকারী হয়ে এসেছি–অর্থাৎ আমি যে আল্লাহর প্রেরিত এটা তার আরেকটি প্রমাণ। কারণ আমি যদি তাঁর প্রেরিত না হতাম বরং মিথ্যুক দাবিদার হতাম, তাহলে আমি একটি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ধর্ম-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে নিতাম এবং আমার এসব নিজস্ব ক্ষমতা–বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে তোমাদেরকে পূর্ববর্তী ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে আমার নিজের আবিষ্কৃত ধর্মের দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমি তো আমার পূর্বগামী আল্লাহর প্রেরিত নবীর আদর্শকেই আসল দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাকেই সঠিক বলে মাথা পেতে নিয়েছি।

হযরত মসীহ যে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও তৎপূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের প্রচারিত দ্বীন নিয়েই আগমন করেছিলেন, এ কথা অধুনা প্রচলিত ইনজীলসমূহ থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। যেমন মথির ৫ অধ্যায়ের ১৭ নম্বর শ্লোকের বর্ণনা মতে পাহাড় থেকে প্রদত্ত ভাষণে হযরত ঈসা মসীহ পরিষ্কার ভাষায় বলছেন, 'মনে করো না যে, আমি তাওরাত অথবা নবীদের কিতাবসমূহ বিলোপ করতে এসেছি। আমি তা বিলোপ করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি। (মথি ১৫ঃ ১৭)

একজন ইহুদী আলিম হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, দ্বীনের হুকুম-আহকামের মধ্যে সর্বপ্রাথমিক হুকুম কোনটি ? উত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর-প্রভুকে প্রেম করবে। এদুটো আজ্ঞাতেই (তাওরাতের) সমস্ত ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নবীদের ভাববাদীগ্রন্থও নিহিত রয়েছে।' (মথি ২২ঃ ৩৭-৪০)

এরপর মসীহ তাঁর শিষ্যদেরকে বললেন, 'অধ্যাপক ও ফরীশীরা মোশির (সূরার) আসনে বসেছে। অতএব তারা তোমাদেরকে যা কিছু বলে, তা পালন করবে, মানবে, কিন্তু তাদের কর্মের মতো কর্ম করবে না, কেননা তারা বলে কিন্তু করে না।' (মথি ২৩ঃ ২, ৩)

এ জন্যও এসেছি যে, তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে এমন কতিপয় জিনিস তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করে দিবো–অর্থাৎ তোমাদের মূর্খ জনগণের অমূলক ধারনা বিশ্বাস, তোমাদের আইনবিদদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইন চর্চা, তোমাদের বৈরাগ্যবাদী লোকের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা এবং অমুসলিম জাতিসমূহের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কারণে তোমাদের মূল শরীয়াতের ওপর যে বাধা-বন্ধন বৃদ্ধি করা হয়েছে, আমি তা বতিল করে দিবো এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ যা হালাল ও হারাম করেছেন, আমিও তা-ই হালাল ও হারাম করে দিবো।

অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমারও রব্ব, তোমাদেরও রব্ব। অতএব তোমরা তাঁরই বন্দেগী কবুল করো। বস্তুত এটাই সঠিক ও সোজা পথ–এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, অন্যান্য নবীদের মতোই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরও ইসলামী দাওয়াতের ভিত্তি তিনটি জিনিসের ওপর স্থাপিত ছিল। (১) সার্বভৌমত্ব ও সর্বোচ্চ প্রভুত্ব-ক্ষমতা–যার সম্মুখে বন্দেগী ও দাসত্বের

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ভূমিকা অবলম্বন করা হয় এবং যার আনুগত্যের ভিত্তিতে নৈতিক-চরিত্র ও সমাজ জীবনের সামগ্রিক ব্যবস্থা স্থাপিত হয়–সর্বতোভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।

(২) সেই সার্বভৌম ও সর্বোচ্চ প্রভুত্বের প্রতিনিধি হিসেবে নবীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে হবে।

(৩) মানুষের জীবনকে হালাল হারাম, জায়েয–না-জায়েয প্রভৃতির বন্ধনে একমাত্র আল্লাহর আইন দ্বারাই বন্দী করতে হবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রকারের আইন-কানুন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দিতে হবে।

অতএব মূলত হযরত ঈসা, হযরত মুসা, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবী-রাসুলদের জীবন-লক্ষ্য মিশন ও দাওয়াতের মূল বাণীর দিক দিয়ে পরস্পরের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও পার্থক্য নেই। যারা মনে করে যে, এই নবীদের মিশন ও দাওয়াত নানা ধরণের ছিল এবং উদ্দেশ্য ও প্রকরণের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল, তারা সাংঘাতিক ধরণের ভুল করে। বিশ্ব-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতির কাছ থেকে তাঁর প্রজা-সাধারণের প্রতি যে ব্যক্তিই নির্দেশিত হয়ে আসবে, তার আগমনের উদ্দেশ্য একমাত্র এটাই হতে পারে, এবং এটা ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না–যে, সে প্রজা-সাধারণকে তাঁর নাফরমানী ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে বিরত রাখবে এবং শিরক (অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব ও নিরংকুশ প্রভুত্বের দিকে দিয়ে বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র মালিক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও অংশীদার করা এবং বন্দেগী, আনুগত্য ও দাসত্বের কাজকে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া) থেকে নিষেধ করবে এবং সর্বতোভাবে প্রকৃত রাজাধিরাজ আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্দেগী আনুগত্য এবং উপাসনা-আরাধনার দিকে সমগ্র মানুষকে আহ্বান জানাবে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে ইনজীলসমূহে হযরত মসীহর জীবনাদর্শকে কোরআনের ন্যায় এতদূর সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়নি। তবুও বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ইশারা-ইংগিতে উপরোল্লিখিত মৌলিক ভিত্তিত্রয়ের উল্লেখ তাতে পাওয়া যায়। যেমন হযরত মসীহ আলাইহিস সালাম যে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীতেই বিশ্বাসী ছিলেন, তা তাঁর বাণীতেই উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেঃ–'তোমরা ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তারই আরাধনা করবে।' (মথি ৪ঃ ১০)

তিনি যে কেবল মাত্র আল্লাহরই বন্দেগীতে বিশ্বাসী ছিলেন–তাই নয়, তার জীবন ব্যাপী যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য এই ছিল যে, গোটা আকাশ রাজ্যে যেমন এক আল্লাহর প্রাকৃতিক আইন কার্যকর রয়েছে, আল্লাহর এই পৃথিবীতেও অনুরূপভাবে তারই আইন-কানুন ও আনুগত্য কার্যকর হোক। তিনি বলেছেনঃ–'তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হোক।' (মথি ৬ঃ ১০)

এ ছাড়া হযরত মসীহ আলাইহিস সালাম নিজেকে আল্লাহর নবী ও আসমানী রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই পেশ করতেন এবং এই হিসেবেই তিনি লোকদেরকে

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নিজের আনুগত্য করার আহ্বান জানাতেন। তাঁর বিভিন্ন বাণী থেকে এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। তিনি যখন নিজের জন্মস্থান 'নাছেরা' থেকে প্রথম ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর নিজেরই ভাই-বন্ধু ও এলাকাবাসীগণ তাঁর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে বিরোধিতার ঝড় তোলে। এ সম্পর্কে মথি, মার্ক ও লূক–এই তিন গ্রন্থেরই সম্মিলিত বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলেছেনঃ–'নবী নিজের দেশে জনপ্রিয় হয় না।'

এরপর জেরুজালেম শহরে যখন তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছিলো এবং লোকেরা তাকে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরামর্শ দিল, তখন তিনি বললেন, 'এমন তো হতে পারে না যে, যিরূশালেমের বাইরে কোন ভাববাদী নবী বিনষ্ট (নিহত) হয়।' (লূক ১৩ঃ ৩৩)

সর্বশেষ বারের মতো যখন তিনি জেরুজালেমে প্রবেশ করছিলেন, তখন তার শিষ্যগণ উচ্চকণ্ঠে বলছিলঃ–'ধন্য সেই রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসছেন।' (লূক ১৯ঃ ৩৮) য

এতে ইহুদী আলেমগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং হযরত মসীহ আলাইহিস সালামকে বলে যে, 'আপনার শিষ্যদেরকে ধমক মারুন। উত্তরে তিনি বললেন, এরা যদি চুপ করে থাকে তাহলে পাথরসমূহ চিৎকার করে উঠবে।' (লূক ১৯ঃ ৩৮-৪০)

আরেক সময় তিনি বলেছিলেনঃ–'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল! আমার কাছে এসো। আমি তোমাদেরকে বিশ্রাম দেবো। আমার যোঁয়াল তোমরা নিজের ঘাড়ে উঠিয়ে নাও। আমার যোঁয়াল সহজ ও আমার ভার লঘু।' (মথি ১১ঃ ২৮-৩০)

উপরন্তু হযরত মসীহ আলাইহিস সালাম যে মানব রচিত আইনের পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক ছিলেন, মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকেও তা সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়। মথির বর্ণনা অনুসারে 'ইহুদী আলেমগণ তাঁকে প্রশ্ন করলো, আপনার শিষ্যগণ পূর্ববর্তী খোদাভীরু লোকদের নিয়ম নীতি ও ঐতিহ্যের বিপরীত হাত না ধুয়েই কেন খাদ্য গ্রহণ করে ? উত্তরে মসীহ বলেছিলেন, তোমাদের মতে অহংকারীদের অবস্থা তাই, যার জন্য ইয়াসইয়া নবীর মুখে এই অভিশাপ বাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, 'এই লোকেরা মুখে মুখে আমার সমাদর করে, কিন্তু এদের অন্তঃকরণ আমার স্মরণ থেকে বহু দূরে। এরা অনর্থক আমার আরাধনা করে। কেননা, এপর মানুষের আদেশকে ধর্মসূত্র হিসেবে শিক্ষা দান করে। তোমরা ঈশ্বরের আদেশকে তো বাতিল করে দাও। আর নিজেদের মনগড়া আইনকে অক্ষুন্ন রাখো। ঈশ্বর তাওরাতে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, পিতা-মাতার সম্মান করবে। যে মাতা-পিতাকে মন্দ বলবে, তাকে হত্যা করতে হবে। কিন্তু তোমরা বলো, যে ব্যক্তি নিজের মা অথবা বাপকে বলবে যে, আমি তোমাদের যতটুকু খেদমত করতে পারতাম তা ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গ করেছি, সে ব্যক্তির মা-বাপের কোনই খেদমত না করাকে তোমরা বৈধ বলে মনে করো।' (মথি ১৫ঃ ৩-৯, মার্ক ৭ঃ ৫-১২)

আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে হবে–ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা অপরিহার্য–এটা বুঝানোর জন্য পবিত্র কোরআনের অনেক

ahlussunnah-bd.blogspot.com

স্থানেই 'আল্লাহর সাহায্য করার' কথা বলা হয়েছে। এ কথা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় সন্দেহ নেই। মানব জীবনের ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ-স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেখানে তিনি কুফর অথবা ঈমান–বিদ্রোহ অথবা আনুগত্যের পথ অবলম্বনের ব্যাপারে কাউকেও তার খোদায়ীর শক্তি দ্বারা জোরপূর্বক বাধ্য করেন না। এর পরিবর্তে তিনি যুক্তি ও উপদেশের সাহায্যে মানুষকে এটাই বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, অস্বীকার নাফরমানী ও বিদ্রোহের স্বাধীনতা এবং সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিকর্তার বন্দেগী ও আনুগত্য কবুল করাই তার পক্ষে একমাত্র সত্য ও কল্যাণময়। এভাবে বুঝিয়ে ও উপদেশ দিয়ে লোকদেরকে সত্যের পথে আনার জন্য চেষ্টা করা–মূলত এটাই হচ্ছে আল্লাহর কাজ। আর যেসব বান্দাহ আল্লাহর এ কাজে অংশগ্রহণ করে, আল্লাহ তাদেরকে নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেন। বস্তুত এটা হচ্ছে মানুষের চরম উন্নতির উচ্চতম শিখর। নামাজ, রোযা ও অন্যান্য সকল প্রকার ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষ শুধু আল্লাহর বান্দাহ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তথা চেষ্টা-সাধনায় মানুষ আল্লাহর সাহচর্য, বন্ধুত্ব ও সাহায্যকারী হওয়ার মর্যাদা লাভ করে। আর এ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক উন্নতির এটাই যে সর্বোচ্চ স্থান, তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

বস্তুত আল্লাহ কোন কাজের ব্যাপারে তাঁর কোন সৃষ্টি বান্দার মুখাপেক্ষী এবং এ লোকদেরকে এ কারণেই আল্লাহর সাহায্যকারী বলা হয়েছে–এ ধারণা বড় ধরণের ভুল। বস্তুত জীবনের যে যে ক্ষেত্রে আল্লাহ নিজে মানুষকে কুফর ও ঈমান, আল্লাহর আনুগত্য ও নাফরমানী করার স্বাধীনতা দান করেছেন, সেসব ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা জোর পূর্বক তাদেরকে ঈমানদার ও অনুগত বানান না। বরং তাঁর নবী রাসুল ও নিজের প্রেরিত কিতাবের সাহায্যে তাদেরকে সত্য দ্বীনের পথে পরিচালিত করার জন্য উপদেশ-নসীহত, শিক্ষাদান, বুঝানো ইত্যাদী পন্থা অবলম্বন করেন। এই উপদেশ-নসীহত ও শিক্ষাদানকে যে লোক নিজের সন্তুষ্টি, ইচ্ছা ও আগ্রহে কবুল করে সে মুমিন। যে লোক কার্যত অনুগত হয়, সে মুসলিম, আবেদ ও কানেত। যে লোক আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে সে মুত্তাকী ব্যক্তি। যে লোক নেক কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে যায় সে মুহসিন। আর এসব থেকেও আরো অগ্রসর হয়ে সামনের দিকে গিয়ে যে লোক এই শিক্ষাদান ও উপদেশ নসীহতের সাহায্যে আল্লাহর বান্দাগণের সংশোধন বিধানের জন্য এবং কুফর ও ফাসিকির পরিবর্তে আল্লাহর দান করা জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে আন্দোলন করতে থাকে, তাকে আল্লাহ নিজের সাহায্যকারী বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু এই সাহায্যদানের অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে, এই লোকেরা আল্লাহর নিজের এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করছে যা স্বয়ং আল্লাহ করতে পারেন না বলে এদের প্রতি তিনি নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন। (নাউযুবিল্লাহ) বরং এর অর্থ হলো এই যে, এই লোকেরা যে কাজে অংশগ্রহণ করে, যে কাজ আল্লাহ তাঁর অপ্রতিরোধ্য শক্তির সাহায্যে করার পরিবর্তে নিজের নবী রাসুল ও আসমানী কিতাবসমূহের সাহায্যে সুসম্পন্ন করতে চান।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এরপর বনী ইসরাঈলগণ (ঈসা মসীহর বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। আল্লাহও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। আর এ ধরণের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে থাকেন।

(এটা আল্লাহরই এক গোপন ব্যবস্থাপনা ছিল) যখন তিনি বলেছিলেন, 'হে ঈসা ! এখন আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনবো এবং তোমাকে আমার কাছে তুলে নিবো–পবিত্র কোরআনের মূল আয়াতে 'মুতাওয়াফ্ফীকা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তাওয়াফ্ফা' শব্দের আসল অর্থ হলো 'নেয়া বা আদায় করা।' প্রাণ হরণ করা বুঝানোর জন্য এ শব্দের প্রয়োগ গৌণ, মূল আভিধানিক অর্থ তা নয়। উক্ত আয়াতে 'মুতাওয়াফ্ফীকা' এ শব্দটি ইংরেজী ভাষার (To recall)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোন পদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তার পদ থেকে ফিরিয়ে নেয়া বা প্রত্যাহার করা। কারণ বনী ইসরাঈলগণ কয়েক শতাব্দীকাল থেকে অব্যাহতভাবে কেবল নাফরমানী ও আল্লাহদ্রোহীতা করছিল, আর শাসন, সতর্ককরণ ও উপদেশ দান সত্ত্বেও তাদের জাতীয় চরিত্র ক্রমশই পতনের দিকে যাচ্ছিলো, উপর্যুপরি কয়েকজন নবীকেই তারা হত্যা করেছিল এবং কোন সত্যদর্শী ব্যক্তি তাদেরকে সত্য ও সাধুতা বা আদর্শবাদিতার দিকে আহ্বান জানালে তারা তারই প্রাণের শত্রু হয়ে পড়তো।

এ জন্য মহান আল্লাহ তাদের ওপর ইসলামী দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে পূর্ণ করার ও তাদেরকে শোধরানোর শেষ সুযোগদানের জন্য হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালাম এই দু'মহান নবীকে একই সময়ে প্রেরণ করেন। আর সেই সাথে তাঁদের আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার সুস্পষ্ট ও অনস্বীকার্য নিদর্শন সমূহ দান করা হয়েছিল, যা একমাত্র সত্যের দুশমন ও চরম সত্যবিদ্বেষী ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু বনী ইসরাঈলগণ এই শেষ সুযোগও হারালো। তারা কেবল যে এই বিশিষ্ট নবীদ্বয়ের ইসলামী দাওয়াতকেই প্রত্যাখ্যান করলো তাই নয়, বরং তাদেরই জনৈক প্রধান ব্যক্তির এক নর্তকীর আবদার অনুসারে হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস সালামের ন্যায় মহান নবীর মাথা কেটে নর্তকীকে উপহার দিল এবং তাদের আলেম সমাজ ও ধর্মীয় আইনবিদগণ ষড়যন্ত্র করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে রোমক সম্রাট কর্তৃক মৃত্যুদন্ড দানের চেষ্টা করেছিল। এরপর বনী ইসরাঈলদের উপদেশ দান ও সতর্কীকরণের জন্য অধিক সময় নষ্ট করার কোনই অর্থ ছিল না। এ জন্য আল্লাহ তাঁর নবীকে ফিরিয়ে নিলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলদের উপর লাঞ্ছনার জীবন চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

এখানে এ কথা বুঝে নেয়া আবশ্যক যে, মূলত ঈসা আলাইহিস সালামকে খৃষ্টানদের আল্লাহ বলে ধারণা করার প্রতিবাদ ও এতৎসংক্রান্ত আকীদা ঠিক করার জন্যই কোরআনে এই পূর্ণ ভাষণ উপস্থাপিত হয়েছে। খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মনে করা সম্পর্কিত ধারণা সৃষ্টির তিনটি গুরুত্ব পূর্ণ কারণ রয়েছে। কারণগুলো হলোঃ–

(১) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আশ্চর্যজনকভাবে জন্মগ্রহণ করা।

(২) তাঁর সুস্পষ্ট ও অনুভবযোগ্য মুজিজাসমূহ।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

(৩) হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উর্ধ্ব দিকে উত্থিত হওয়া।

খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থেই এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। পবিত্র কোরআন ১ নম্বর কথাটির সত্যতা স্বীকার করেছে এবং ঘোষণা দিয়েছে যে, পিতা ব্যতীত হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হওয়া আল্লাহর অপরিসীম কুদরতের অবদান ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ যাকে যেভাবে চান সৃষ্টি করেন। এই অস্বাভাবিক জন্ম পদ্ধতি কখনই এ কথা প্রমাণ করে না যে, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ ছিলেন অথবা খোদায়ীর ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্রও অংশ ছিল।

২ নম্বরের কথাটিও কোরআন সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজাসমূহকেও এক-একটি করে উল্লেখ করেছে। কিন্তু সেই সাথে এ কথাও বলে দিয়েছে যে, এই সমস্ত কাজ তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমেই সম্পন্ন করেছিলেন, স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্ষমতাশালী ও স্বাধীন ইচ্ছার মালিক হিসেবে নয়। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মনে করা সম্পর্কিত ধারণার প্রতিবাদ করার জন্য পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া আবশ্যক ছিল যে, তোমরা যাকে আল্লাহ ও আল্লাহ পুত্র বলে মনে করছো, সে তো মরে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। এ সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ থাকলে অমুক স্থানে গিয়ে তার কবর দেখে এসো। কিন্তু কোরআন এমন কথা বলেনি। কোরআন তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে যে পরিষ্কার কিছু বলেনি এবং তাঁকে যে অন্তত জীবিত তুলে নেয়ার কথা বুঝানোর মতো শব্দ ব্যবহার করেছে তাই নয়, বরং বিপরীতভাবে খৃষ্টানদের বলছে যে, ঈসা আলাইহিস সালামকে মোটেও শূলে চড়ানো হয়নি। অর্থাৎ যে লোক শেষকালে 'এইলি এইলি লেমা শাবাকতানি অর্থাৎ প্রভু আমাকে কেন ত্যাগ করলে' বলেছিল এবং যার শূলবিদ্ধ হওয়ার ছবি নিয়ে তোমরা ঘুরে বেড়াও, সে মূলত ঈসা ছিল না। ঈসা আলাইহিস সালামকে তো এর পূর্বেই তুলে নেয়া হয়েছিল।

পবিত্র কোরআনের এ ধরণের সুস্পষ্ট ভাষণের পরও যারা কোরআনের আয়াত থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর কথা বের করার চেষ্টা করে, তারা প্রকারান্তরে এ কথাই বলতে চায় যে, আল্লাহ সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ভাষায় নিজের বক্তব্যটুকুও প্রকাশ করার কৌশল জানেন না। (নাউযুবিল্লাহ)

এরপর বনী ইসরাঈলগণ (ঈসা মসীহর বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। আল্লাহও তাঁর গোপন ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন। আর এ ধরণের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়ে থাকেন।

যারা তোমাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদের (সংশ্রব, সাহচর্য ও পংকিল পরিবেশ) থেকে তোমাকে পবিত্র করবো। আর যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদেরকে, তোমাকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ওপর কিয়ামত পর্যন্ত জয়ী করে রাখবো–এ আয়াতে 'যারা অস্বীকার করেছে' কথাটি ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর 'যারা অনুসরণ করবে' আয়াতের এ কথা দ্বারা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

যদি সঠিকভাবে অনুসরণকারীদের কথা বুঝানো হয়ে থাকে তবে তারা কেবল মুসলমানগণই হতে পারে আর যদি মোটামুটি ভাবে তাকে মেনে নেয়ার কথা বুঝানো হয়, তবে খৃষ্টান ও মুসলমান সবাই তাদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের মতো, এভাবে যে, আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, হও আর সে হয়ে গেল–অর্থাৎ আশ্চর্যজনক উপায়ে জন্মগ্রহণই যদি কারো আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র হওয়ার পক্ষে বড় যুক্তি হয়ে থাকে তবে আদম সম্পর্কেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করা তোমাদের পক্ষে অধিকতর কর্তব্য ছিল। কারণ ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম তো শুধু পিতা ব্যতীত হয়েছিল আর আদমের জন্ম তো মাতা-পিতা ব্যতীতই হয়েছে। তাঁর তো মা বাপ বলতে কেউ-ই ছিল না।

এটাই প্রকৃত ও যথার্থ সত্য কথা, যা তোমার রব্ব-এর তরফ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে। অতএব তোমরা সেসব লোকের মধ্যে শামিল হয়ো না, যারা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে–এ আয়াত পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে যে কয়টি মৌলিক বিষয় খৃষ্টানদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে, তার সারাংশ পর্যায়ক্রমে এখানে উল্লেখ করা হলোঃ–

প্রথম যে কথাটি তাদের মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তাহলো, যেসব কারণে তোমাদের মনে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ মনে করার মত বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে কোন একটি কারণও অনুরূপ বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট নয় এবং সঠিকও নয়। বস্তুত তিনি সম্পূর্ণরূপে একজন মানুষই ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে নিজস্ব বিবেচনায় এক অস্বাভাবিক উপায়ে জন্মদান করার উপযুক্ত মনে করেছেন। তাঁকে নবী হওয়ার সুস্পষ্ট প্রামাণস্বরূপ বহু মুজিজা দান করেছেন এবং সত্যের শত্রুরা তাঁকে যে শূলবিদ্ধ করতে চেয়েছিল, তা তিনি করতে দেননি এবং তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন। বস্তুত এমন করার সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার তাঁরই রয়েছে। তিনি তাঁর যে বান্দাহকে যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। এ ধরণের অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখে এ কথা মনে করা–যে তিনি নিজেই আল্লাহ ছিলেন অথবা আল্লাহর পুত্র অথবা খোদায়ীর ব্যাপারে তার অংশ ছিল–এটা কিভাবে শুদ্ধ, সংগত ও নির্ভুল হতে পারে ?

দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি তাদেরকে বলা হয়েছে তা এই যে, ঈসা আলাইহিস সালাম যে বিষয়ের দাওয়াত দিতে পৃথিবীতে এসেছিলেন, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও ঠিক সেই বিষয়ের দিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। বস্তুত উভয়ের লক্ষ্য ও আদর্শে একবিন্দু পার্থক্য নেই।

এ ভাষণের তৃতীয় মৌলিক বিষয় হলো, ঈসা আলাইহিস সালামের পরে তার হাওয়ারীদের ধর্ম ছিল কোরআনে প্রচারিত এই ইসলাম। পরবর্তী কালে সৃষ্ট খৃষ্টবাদ না ঈসা আলাইহিস সালাম শিক্ষা দিয়েছেন, না তা ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারীদের অনুসৃত নীতির অনুরূপ ছিল।

তোমার কাছে এই জ্ঞান আসার পর এখন যে কেউ এই ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করবে, হে মুহাম্মাদ! তাকে বলে দাও, 'এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের ও

ahlussunnah-bd.blogspot.com

তোমাদের পুত্রদের ও স্ত্রীদের এবং আমরা ও তোমরা নিজেরাও উপস্থিত হই, এরপর আল্লাহর কাছে দোয়া করি যারা, যে মিথ্যাবাদী তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক–এ আয়াতে ফয়সালার জন্য এ পন্থাটি উপস্থাপনের মূলত এ কথা প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, নাজরান প্রতিনিধিদল জেনে বুঝেই এমন গোঁড়ামী করছে। উপরোক্ত ভাষণে যা কিছু বলা হয়েছে তন্মোধ্যে কোন একটি কথারও উত্তর তাদের কাছে ছিল না। খৃষ্টবাদের বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে কোন একটি আকীদাকে মুল ব্যাপারের সাথে সামাঞ্জ্যশীল ও প্রকৃত ঘটনার বিপরীত নয় বলে দৃঢ়তার সাথে দাবি করার মতো কোন বিশ্বাসযোগ্য সনদ তাদের পবিত্র প্রন্থাবলীতে পাওয়া যেতো না এবং সে সম্পর্কে কোনরূপ গভীর আস্থা স্থাপন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা এবং তাঁর কল্যাণমূলক কর্ম দেখে নাজরান প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ লোকই তাঁর নবুয়্যাতের প্রতি মনে মনে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল অথবা অন্ততপক্ষে তারা আর মনে মনে খুব দৃঢ়তার সাথে বিরোধিতা বা অস্বীকার করার মতো জোর পেতো না। এ জন্য যখন তাদেরকে বলা হলো যে, তোমাদের আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তবে এগিয়ে এসো এবং মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হওয়ার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে দোয়া করো, তখন তাদের কেউই এগিয়ে আসার সাহস পেলো না। ফলে সমগ্র আরব দেশে এ কথা প্রচার হয়ে গেল যে, নাজরানের খৃষ্টান নেতা ও পাদ্রী–যাদের পবিত্রতার বিজয় কেতন ও সত্য বিশ্বাসের ডংকা চারদিককে আন্দোলিত করে তুলেছিল–মূলত এমন সব আকীদা পোষণ করে, যার প্রতি স্বয়ং তাদেরই কোন বিশ্বাস নেই বা কোন আস্থা নেই।

বিশ্বনবী ও হযরত ঈসার ঘোষণা

আলাইহিস সালাম

এ কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে কোন নবী বা রাসুল আগমন করেননি। মাঝের ব্যবধান সম্পর্কে বলা হয়েছে ৫৭০ বছর। অর্থাৎ ৫৭০ বছর পূর্বেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মানব জাতির কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমার পরে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসবেন এবং তাঁর নাম হবে আহ্মাদ। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছেঃ–

واذ قال عيسى ابن مريم يبنى اسرا عيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى من توراة ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد–فلما جاء هم بالبينت قالوا هذا سحر مبين(صف)

ahlussunnah-bd.blogspot.com

আর স্মরণ কর মরিয়াম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র পাঠানো রাসূল। আমি সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যে আমার পরে আসবে, যাঁর নাম হবে আহমাদ। কিন্তু কার্যত সে যখন তাদের কাছে সুস্পষ্ট (অকাট্য) নিদর্শনাদি নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন তারা বললো, এটা তো সুস্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। (সূরা আস্-সফ, আয়াত নম্বর-৬)

আমি সত্যতা বিধানকারী সেই তাওরাতের, যা আমার পূর্বে এসেছে–এই বাক্যটির তিনটি অর্থ। এই তিনটি অর্থই এখানে গ্রহণীয় এবং যথাযথ। একটি এই যে, আমি কোন নূতন ও অভিনব ধরনের নবী নই। আমি সেই দ্বীন নিয়েই এসেছি যা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন। আমি তাওরাত প্রত্যাখ্যানকারী হয়ে আসিনি, বরং তাওরাতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য আগমন করেছি। আল্লাহ্‌র রাসূলগণ চিরকাল স্বীয় পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণ ও প্রকাশ করে থাকেন। এটাই চিরন্তন নিয়ম। অতএব তোমরা আমার রিসালাত সম্পর্কে কোনরূপ সংশয় বা দ্বিধাবোধ করবে, তার কোনই কারণ নেই।

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তাওরাতে আমার আগমন সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, এরই বাস্তব রূপ হিসেবে আমি এসেছি। সুতরাং তোমরা আমার বিরোধিতা করবে-তার পরিবর্তে আমার সম্বর্ধনাই তোমাদের করা উচিত। করা উচিত এই হিসেবেও যে, অতীত কালের নবী-রাসূলগণ আমার যে আগমণ সংবাদ দিয়েছিলেন তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, আমি এসে গিয়েছি।

এই বাক্যটিকে পরবর্তী বাক্যসমূহের সাথে মিলিয়ে পড়লে তৃতীয় একটি অর্থ নির্গত হয়। আর তা এই যে, আল্লাহ্‌র রাসূল আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন সম্পর্কে তাওরাতের দেয়া সুসংবাদের সত্যতা ও যথার্থতা ঘোষণা করছি এবং আমি নিজেও তাঁর আগমনের সুসংবাদ শুনাচ্ছি। এই তৃতীয় অর্থের দৃষ্টিতে হযরত ঈসার এই কথাটির ইংগিত সেই সুসংবাদের দিকে যা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নিজ জাতির জনগণকে সম্বোধন করে ভাষণদান প্রসংগে দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেনঃ–

'তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার জন্য আমার সদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে। কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে, যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব্ব পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।' (ধর্মপুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায় ১৮ ঃ শ্লোক ১৫ হইতে ১৯)।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এটা তাওরাতের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো উপর খাটে না। এতে হযরত মূসা নিজের জাতির জনগণকে আল্লাহর এই বাণী শুনায়িছেন যে, আমি তোমার জন্য তোমার ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবী বানাবো। এই কথা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, কোন জাতির 'ভাই' কথার অর্থ সেই জাতিরই কোন গোত্র বা বংশ পরিবার বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ অপর এমন কোন জাতি যার সাথে তার নিকটবর্তী বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। স্বয়ং বনী-ইসরাঈলের কোন নবী আগমন সম্পর্কেই যদি এই সুসংবাদ হতো, তাহলে বলা হতোঃ 'আমি তোমাদের জন্য স্বয়ং তোমাদের মধ্য হইতে একজন নবী প্রতিষ্ঠিত করিব।' কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ঃ 'উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে ....'। কাজেই বনী-ইসরাঈলীদের 'ভাই' বনী-ইসরাঈলই হতে পারে। হযরত ইবরাহীমের বংশধর হওয়ার কারণে এদের সাথে তাদের বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান। উপরন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী বনী-ইসরাঈলের অপর কোন নবী সম্পর্কে প্রয়োজ্য হতে পারে না এই কারণেও যে, হযরত মূসার পর বনী ইসরাঈল বংশে এক দুইজন নয়, বহু সংখ্যক নবী এসেছেন। বাইবেলে তাদের ভুরি ভুরি উল্লেখ রয়েছে।

এই সুসংবাদে দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, 'যে নবী পাঠানো হবে তিনি হযরত মূসার মত হবেন।' কিন্তু আকার-আকৃতি, চেহারা ও জীবন-অবস্থার দিক দিয়ে সাদৃশ্যের কথা যে এটা নয়, তা তো সুস্পষ্ট। কেননা এই সব দিক দিয়ে দুনিয়ার কোন দুই ব্যক্তিই একই রকম হয় না। নিছক নবুয়্যাত সংক্রান্ত গুণাবলীর সাদৃশ্যও এই কথার উদ্দেশ্য নয়। কেননা হযরত মূসার পরে আগত সমস্ত নবীই এই ব্যাপারে অভিন্ন। কাজেই কোন একজন নবীর এমন কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না, যে দিক দিয়ে তিনি তার মত হবেন। এই দুইটি দিকের সাদৃশ্যের কথা বাদ দিলে তৃতীয় কোন সাদৃশ্যের বিষয় হতে পারে এবং সেই দিকের বিশেষত্বে তাঁর অনন্য হওয়ার কথা বোধগম্য। আর তা একমাত্র এটাই হতে পারে যে, সেই নবী এক নবতর স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ শরীয়াতের বিধান নিয়ে আগমনের ব্যাপারে তিনি হযরত মূসার মত হবেন। আর এই বিশেষত্ব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। কেননা তাঁর পূর্বে বনী-ইসরাঈলীদের মধ্যে যত নবীই এসেছেন, তারা সবাই হযরত মূসার আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তাঁদের কেউ-ই কোন স্বতন্ত্র আদর্শ নিয়ে আগমন করেননি।.

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলো থেকে উপরে দেয়া ব্যাখ্যা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। 'কেননা হোরেবে সমাজের দিবসে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এই প্রার্থনাই ত করিয়াছিলে' যথা, আমি যেন আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রব পুনর্বার শুনিতে ও এই মহাগ্নি আর দেখিতে না পাই, পাছে আমি মারা পড়ি। তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, ইহারা ভালই বলিয়াছে। আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উপৎন্ন করিব, তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন।

তাওরাতের এই বাণীতে 'হোরেব' অর্থ সেই পাহাড়, যেখানে হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম ইসলামের বিধান দেয়া হয়েছিল। আর বনী

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ইসরাঈলীদের যে প্রার্থনার কথা তাওরাতে উল্লিখিত হয়েছে তার অর্থ এই যে, 'ভবিষ্যতে আমাদিগকে কোন আদর্শ বা শরীয়াত দেওয়া হইলে তাহা যেন সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দেওয়া না হয়, যাহা হোরেব পর্বতের পাদদেশে শরীয়াত দেওয়ার সময় উদ্ভব করা হইয়াছিল।' কুরআন মজীদেও সেই অবস্থার উল্লেখ রয়েছে আর বাইবেলেও। (আল-বাকারার ৫৫, ৫৬ ও ৬৩; আল-আরাফের ১৫৫, ১৭১; বাইবেলের যাত্রা পুস্তক ১৯ ঃ ১৭ ও ১৮ দ্রষ্টব্য)।

এর জওয়াবে হযরত মূসা বনী ইসরাঈলীদেরকে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এই প্রার্থনা কবুল করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি তাহাদের জন্য এমন এক নবী প্রেরণ করিব, যাহার মুখে আমি আমার বাক্য দিব।' অর্থাৎ ভবিষ্যতে শরীয়াত দেওয়ার সময় সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হবে না, যা হোরেব পাহাড়ের পাদদেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এরপর যে নবী এই পদে অধিষ্ঠিত হবেন, তার মুখে শুধু আল্লাহর কালাম ভরে দেয়া হবে আর তিনি তা সর্বসাধারণকে শুনিয়ে দিবেন।

এই স্পষ্ট কথাগুলো চিন্তা বিবেচনা করার পর এই ব্যাপারে কোনই সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না যে, এই নবী-যার কথা এই প্রার্থনা ও জওয়াবী কথায় বলা হয়েছে-তিনি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ-ই হতে পারে না। হযরত মূসার পর স্বতন্ত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বা শরীয়াত কেবল তাঁকেই দেয়া হয়েছে। তা দেওয়ার সময় হোরেব পর্বতের পাদদেশে বনী-ইসরাঈলীদের যে সমাবেশ হয়েছিল-তেমন কোন জনসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। এবং শরীয়াতের বিধান দেওয়ার সময় অনুরূপ কোন পরিস্থিতিরও উদ্ভব করা হয়নি।

আর সুসংবাদদাতা এমন একজন রাসূলের, যে আমার পরে আসবে, যাঁর নাম হবে আহমাদ–এটা কুরআন মজীদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত। ইসলামের বিরোধিরা এই আয়াত নিয়ে অনেক বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি করেছে। এই জন্য তারা নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কেননা এতে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করে তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এই কারণে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) এই আয়াতে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম 'আহমাদ' বলা হয়েছে। 'আহমাদ' শব্দের দুইটি অর্থ। একটি,-সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রশংসাকারী। দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তি যার সর্বাধিক প্রশংসা করা হয়েছে। অথবা বান্দাহদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক প্রশংসারোগ্য। সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, 'আহমাদ' হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই অপর এক নাম ছিল। মুসলিম, আবু দাউদ তায়ালিসী গ্রন্থে হযরত আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ–

ahlussunnah-bd.blogspot.com

انا محمد وانا احمد والحاشم (مسلم)

'আনা মুহাম্মাদু ওয়া আনা আহ্‌মাদু ওয়াল হাশিম–অর্থাৎ আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমাদ' আমি হাশেম'। হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম হতে ইমাম মালিক, বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিযী ও নাসায়ী এই অর্থেই বহু কয়টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নাম সুপরিচিত ছিল। হযরত হাসসান ইবনে সাবেত-এর কবিতার একটি ছত্র এর সাক্ষীঃ-

صلى الاله ومن نحف بعرشه-والطيبون على

المبارك احمد

আল্লাহ্ এবং তাঁর আরশের চতুস্পার্শ্বে সমেবত অসংখ্য ফেরেশতা ও সব পবিত্র আত্মা মহা বরকতওয়ালা আহ্‌মাদ-এর প্রতি দরুদ পাঠিয়েছেন।

- বিশ্বনবীই শেষ নবী

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছেঃ–

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَااَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ

وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ–وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا

(হে লোকেরা!) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নয় কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসেরই জ্ঞান রাখেন। (সূরা আহযাব, আয়াত ৪০)

বর্তমান এই পৃথিবীতে একটি নতুন দল খতমে নবুওয়ারেত বিরুদ্ধে ফেতনা সৃষ্টি করেছে। এরা উল্লেখিত আয়াতের 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ করে 'নবীদের মোহর'। এরা বুঝাতে চায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তাঁর মোহরাঙ্কিত হযে আরে অনেক নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুওয়াত বিশ্বনবীর মোহরাঙ্কিত না হয়, ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না। পক্ষান্তরে উল্লেখিত আয়াতটি যে পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশ রেখে বিচার করলে, তা থেকে এ অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগই দেখা যায় না। কিন্তু যারা উল্লেখিত অর্থ গ্রহণ করেছে, যদি সে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও

ahlussunnah-bd.blogspot.com

অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর সাথে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানা ধরণের সংশয়-সন্দেহের উত্তর দান করতে গিয়ে সূরা আহযাবের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় সহসা সে আয়াতের মাঝে বলে দেয়া হলো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আগমন করবেন তারা সবাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই মোহরাঙ্কিত হবেন। হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ঘটনার মাঝখানে এ কথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তারই নয়, এ থেকে প্রতিবাদ কারীদেরকে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিলো তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে পারতো যে, আপনি যয়নবকে বিয়ে করে পালক পুত্রের প্রথাটা রহিত করতে নাও পারতেন, এ প্রথা রহিত করতে গিয়ে আজ যে অপবাদের মোকাবিলা আপনাকে করতে হচ্ছে, এ থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পেতেন। কেননা এই অর্থহীন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রথাটা যদি একান্তই বাতিল করার প্রয়োজন হতো, আপনার পরে আপনার মোহরাঙ্কিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, তারাই তো এই প্রথাটি বাতিল করতে পারতেন।

কিন্তু আরবী ভাষার অধিকারী আরববাসী এ ধরণের কোন প্রশ্ন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তুলেনি। 'খাতমুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ যদি বর্তমানে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের অনুরূপ হতো, তাহলে আরবের লোকজন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তেমন কোন প্রশ্ন অবশ্যই ওঠাতো। আরবদের তুলনায় বর্তমানের কাদিয়ানী গোষ্ঠী কি আরবী ভাষায় অধিক দক্ষ ? এই কাদিয়ানী গোষ্ঠী কোরআনের উক্ত আয়াতের আরেকটি অর্থ করেছে যে, 'খাতামুন নাবিয়্যীন'–এর অর্থ হলো, 'আফজালুন নাবিয়্যীন' অর্থাৎ নবুওয়াতের দরোজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

কিন্তু তাদের এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। মূল ঘটনার অগ্রপশ্চাতের সাথে এ ধরনের কোন ব্যাখ্যার সাদৃশ্য নেই। বরং তাদের সে ব্যাখ্যা পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থই প্রকাশ করে। সে সময়ে কাফের ও মুনাফিকরা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে পারতো, 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আপনার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন নবী যখন আপনার পরে আসতেই থাকবে, তখন এ পালক পুত্র রহিতকরণের কাজটা না তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন, এই প্রথাটা যে আপনাকেই শেষ করে যেতে হবে এমন বাধ্যবধকতা তো নেই।'

ahlussunnah-bd.blogspot.com

নবুওয়াতের প্রয়োজনীয়তা আর নেই

নবুওয়াত চেয়ে নেয়ার কোন জিনিস নয়। সাধনা করে লাভ করারও কোন জিনিস নয়। গোটা জীবন ধরে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মতো কাজ করেও নবুওয়াত লাভ করা যায় না। সে ব্যক্তির ভেতরে নবীর গুণাবলী সৃষ্টি হতে পারে না। নবুওয়াতের যোগ্যতা কোন অর্জন করার জিনিস নয়। কোন বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুওয়াত দান করা হয় না। বরং বিশেষ প্রয়োজনের যখন উপস্থিত হয়েছিল বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত, তখনই আল্লাহ এক ব্যক্তিকে নবুওয়াতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি, তখন শুধু শুধু আল্লাহ নবীর পর নবী প্রেরণ করতেও থাকেননি। আল্লাহর কোরআন থেকে যখন আমরা এ কথা অবগত হবার চেষ্টা করি যে, কোন পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে নবী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তখন সেখানে এ ধরণের চারটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়।

(১) কোন বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন আসেনি এবং অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর শিক্ষাও তাদের কাছে পৌছেনি।

(২) নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৩) ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।

(৪) কোন নবীর সাথে সাহায্য সহযোগিতার জন্য আরেকজন নবীর প্রয়োজন হয়।

এখন কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে কোন একটিও আর বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে বিদ্যমান নেই। কোরআন নিজেই বলছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ কথা বলে যে, তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র পৃথিবীতে এমন অবস্থা বিরাজ করছে যে, যাতে করে তাঁর নবুওয়াত সবসময় পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পৌছতে পারে। এরপরেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নবী প্রেরণের প্রয়োজন থাকে না। কোরআন, হাদীস ও সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও এ কথার সাক্ষ্যবহ যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং নির্ভেজাল আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোন প্রকার বিকৃতি বা পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়নি। তাঁর ওপরে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল তার ভেতরে আজ পর্যন্ত একটি শব্দেরও কম-বেশী হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন, তাও আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। সুতরাং নবী আসার কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে না।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পবিত্র কোরআন এ কথা ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণতা দান করা হয়েছে। সুতরাং দ্বীনের পূর্ণতার জন্যও কোন নবী আসার আর প্রয়োজন নেই। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের সহযোগিতা করার জন্য যদি কোন সাহায্যকারী নবীর প্রয়োজন হতো, তাহলে সেটা তাঁর জীবনকালেই আল্লাহ প্রেরণ করতেন। এ ধরণের কোন প্রয়োজন ছিল না বিধায় মহান আল্লাহ তা করেননি। বর্তমানে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, নবীকে পৃথিবীতে আসতেই হবে ? কেউ যদি যুক্তি প্রদর্শন করে যে, মুসলিম জাতি পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এ কারণে তাদের সংস্কারের জন্য একজন নতুন নবীর প্রয়োজন। এই যুক্তি যারা দিতে চায় তাদের কাছে ইসলামী চিন্তাবিদদের জিজ্ঞাসা, নিছক সংস্কারের জন্য পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কি কোন নবী এসেছে যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর আগমন ঘটলো ? ওহী অবতীর্ণ করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা, নবীর কাছেই ওহী অবতীর্ণ করা হয়। আর ওহীর প্রয়োজন পড়ে কোন নতুন পয়গাম দেয়ার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহর কোরআন এবং বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং ওহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গিয়েছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারের প্রয়োজনই অবশিষ্ট রয়েছে, নতুন কোন নবীর নয়।

যখন কোন জাতির মধ্যে নবীর আগমন হবে, তখনই সেখানে প্রশ্ন উঠবে কুফর ও ঈমানের। যারা ঐ নবীকে স্বীকার করে নেবে, তারা এক উম্মাত ভুক্ত হবে এবং যারা তাকে স্বীকার করবে না তারা অবশ্যই একটি পৃথক উম্মাতে শামিল হবে। এই দুই উম্মাতের মতবিরোধ কোন আংশিক মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং এটি এমন একটি বুনিয়াদী মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজের আকিদা-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দু'দল কখনো একত্র হতে পারবে না। এ ছাড়াও কার্যত তাদের প্রত্যেকের জন্য হিদায়াত এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর ওহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দুটোকে তাদের আইনের উৎস হিসেবেই মেনে নিতে প্রথমত অস্বীকার করবে। সুতরাং এই দুই দলের মিলনে একটি সমাজ বা জাতি কোন ক্রমেই সৃষ্টি হতে পারে না। ইতিহাস বলে, এমন কখনো হয়নি।

এই চরম সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোন ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, খত্‌মে নবুওয়াত মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহর বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বিনিময়েই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। এ জিনিসটা মুসলমানদেরকে এখন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতো। সুতরাং যে ব্যক্তি বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত দানকারী এবং একমাত্র অনুসরণীয় নেতা

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোন হিদায়াতের উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না, সে আজ এই ভ্রাতৃত্বের অন্তরভুক্ত হতে পারবে। নবুওয়াতের দরোজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম জাতি কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতো না। কারণ প্রত্যেক নবীর আগমনের পরে এই ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। সাধারণ স্থূলভাবে ভাবনা চিন্তা করলেও মানুষের বিবেক বুদ্ধিও এ কথাই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দ্বীন দিয়ে দেবার এবং তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুওয়াতের দরোজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এই শেষ নবীর অনুগমন করে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মাতের অন্তরভুক্ত থাকতে পারবে এবং বিনা প্রয়োজনে নতুন নতুন নবীদের আগমেন উম্মাতের মধ্যে বার বার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নতুন নবুওয়াতের দাবীদারদের ভাষায় নবী 'যিল্লী অর্থাৎ ছায়া নবী' হোক অথবা বুরুজী নবী হোক, উম্মাতওয়ালা হোক, শরীয়াতওয়ালা হোক বা কিতাবওয়ালা হোক–যে কোন অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাঁকে যারা মেনে নেবে, তারা হবে একটি উম্মাত, আর যারা মানবে না তারা কাফের বলে গণ্য হবে। যখন নবী প্রেরণের সত্যিকারের প্রয়োজন হয়েছিল, তখনই–শুধু মাত্র তখনই এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল, বর্তমানে হয়নি।

পক্ষান্তরে যখন কোন নবী আগমনের কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন আল্লাহর হিকমাত এবং তাঁর রহমতের কাছে কোন ক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে শুধু শুধু কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মাতভুক্ত হবার সুযোগ দিবেন না। সুতরাং কোরআন, সুন্নাহ এবং সাহাবাদের ইজমা ও সমস্ত আলেমদের ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক, বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বরে স্বীকার করে এবং তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে বর্তমানে নবুওয়াতের দরোজা বন্ধ আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

দাজ্জালের আগমন-মঞ্চ প্রস্তুত হচ্ছে

সমস্ত প্রামাণ্য হাদীস থেকেই জানা যায় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্না নির্মূল করার জন্য পাঠানো হবে সে হবে ইহুদী বংশোদ্ভূত। সে নিজেকে মসীহ রূপে পেশ করবে। ইহুদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোন ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর যখন বনী ইসরাঈল ক্রমাগত অবক্ষয় ও পতনের শিকার হতে থাকলো এমন কি অবশেষে ব্যাবিলন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন মসীহ এসে তাদেরকে এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন। এসব ভবিষ্যৎ

ahlussunnah-bd.blogspot.com

বাণীর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং তাদের কেটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাংখাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে মসীহ হয়ে আসলেন এবং কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই আগমন করলেন, তখন ইহুদীরা তাকে মসীহ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো।

সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী জগত সেই প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতিক্ষা (Promised Messiah) করছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই কাংখিত যুগের সুখ-স্বপ্ন-কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমূদ ও রাব্বীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে ছবি তারা অঙ্কন করেছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তারা বুক ভারা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এ প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীলনদ থেকে ফেরাত নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা, যে এলাকাটিকে ইহুদীরা নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা বলে মনে করে, পুনরায় ইহুদীদের দখলে আনবেন এবং গোটা পৃথিবী থেকে ইহুদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন।

বর্তামানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অনুযায়ী ইহুদীদের প্রতিশ্রুত মসীহর ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তর এলাকা থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে। সেখানে ইসরাঈল নামে একটি অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এসে সেখানে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে।

ইহুদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণ তাকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গোটা পৃথিবীর বড় বড় ব্যাবসা আজ ইহুদীদের হাতে। এক কথায় বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ইহুদী শক্তি। ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী ও আবিষ্কারক তারা। জাতি সংঘকে পরিণত করা হয়েছে ইহুদীদের গোলামে। জাতি সংঘ তাদের পোষা কুকুরের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হচ্ছে। মুসলিম নামধারী নেতাদের দিয়ে ইহুদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর জন্য ইহুদীদের অস্ত্র ভান্ডার এক মহাবিপদে পরিণত করেছে।

যেসব মুসলিম দেশ ভবিষ্যতে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে, জাতি সংঘের মাধ্যমে সেসব মুসলিম দেশের সামরিক শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ইহুদীরা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে যে কোন সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইহুদী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ তাদের ধর্মীয় কল্পনার ফানুস 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ' দখল করার আকাংখা মোটেও গোপন না রেখে প্রকাশ করে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোন মুসলিম দেশে তারা যখন তখন হামলা পরিচালনা করছে। দীর্ঘকাল থেকে ভবিষ্যতে ইহুদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে তাতে করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যই তাদের দখলে তারা নিয়ে নেবে। তাদের ধর্মীয় নক্শায় রয়েছে সিরিয়া, লেবানন, জর্দানের সমগ্র এলাকা, ইরাক, তুরস্কের ইস্কান্দারুন, মিশরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা, এবং মদীনাসহ আরবের অন্তরগত হিজায ও নজদের উচ্চভূমি পর্যন্ত, তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার ধর্মীয় আদেশ বাস্তববায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে কোন একটি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টা অবশ্যই করবে এবং কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং এই সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের কাছে এক একটি বছর মনে হবে। এ জন্য তিনি নিজে মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে সাহাবাদের সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দান করেছেন।

এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ কোন মসীলে মসীহকে প্রেরণ করবেন না বা প্রেরণ করেননি। বরং মহান আল্লাহ আসল মসীহ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম-কে প্রেরণ করবেন। ইহুদীরা সে সময়ে যে আসল মসীহ হযরত ঈসাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলবিদ্ধ করে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই আসল মসীহ ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক গ্রামে, অথবা আফ্রিকায় বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না, বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্কে। কারণ তখন সেখানেই মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল থেকে দামেশ্ক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু থেকে সহজেই একথা বোধগম্য হয় যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশ্কের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মূহুর্তে দামেশ্কের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের কাছে সুব্হে সাদেকের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদেরকে নিয়ে দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচন্ড আক্রমনে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে আফিয়েকের পার্থক্য পথ দিয়ে ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পিছু না হটে তার পেছনেই যেতে থাকবেন। অবশেষে লিড্ডা বিমান বন্দরে দাজ্জাল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরহাতে নিহত হবে। এরপর ইহুদীদেরকে প্রতিটি স্থান থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করা হবে ফলে ইহুদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামেরপক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর খৃষ্টান ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাত একীভূত হয়ে যাবে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

এসব হাদীসের এক স্থানে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন বর্শা দিয়ে। আর দাজ্জাল হলো একজন ইহুদী। পক্ষান্তরে বর্তমান পৃথিবীতে ইহুদীরাই হলো সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অধিকারী। ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের আবিষ্কারকও তারা। ভবিষ্যতে তারা আরো ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করবে। তাহলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তরবারী আর বর্শা দিয়ে কিভাবে কম্পিউটারাইজড মারণাস্ত্রের মোকাবিলা করবেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, দুটো বিশ্বযুদ্ধে বর্তমানে আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের ধ্বংস যজ্ঞ দেখে মানুষ এতটাই ভীতগ্রস্থ যে, গোটা পৃথিবী জুড়ে চিৎকার করা হচ্ছে 'অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি করতে হবে।' যে কথাটা মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেও কল্পনা করা যায়নি। তৃতীয় বা চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের বিভিষীকা দেখে এই মানুষই চিৎকার করে 'অস্ত্র নির্মূলকরণ' চুক্তির জন্য দাবী করতে থাকবে। অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী এক সময় আধুনিক অস্ত্রের তান্ডব থেকে মুক্তি লাভ করবে। তখন যদি কারো সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে সেই সাবেক আমলের তরবারী আর বর্শা ব্যতীত যুদ্ধের উপকরণ তো আর থাকবে না। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালাম তরবারী বর্শা দিয়ে যে যুদ্ধ করবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মহান আল্লাহ সে সময়ে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। প্রকৃত সত্য মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

কাদিয়ানী প্রতারকের প্রতারণা

কোন প্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা ব্যতীতই এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও চরম সত্য হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, প্রতিশ্রুত মসীহর নামে কাদিয়ানী কর্তৃক যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, তা একটি বড় ধরণের প্রতারণা ও জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এই প্রতারণার সবচেয়ে হাস্যকর দিকটি হলো, যে জালিম ব্যক্তি নিজেকে হাদীসে উল্লেখিত মসীহ বলে দাবী করেছে, সে নিজেই তার লিখিত পুস্তকে নিজে ঈসা ইবনে মার্য়াম হওয়ার দাবী করে এক অদ্ভূত গল্প ফেঁদেছে। সে লিখেছেঃ–'তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মার্য়াম। অতপর যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত আমি মার্য়ামের গুণাবলী সহকারে লালিত হই, এরপর মার্য়ামের ন্যায় ঈসার রুহ আমার মধ্যে ফুঁৎকারে প্রবেশ করানো এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। অবশেষে কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চেয়ে বেশী হবে না, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লেখিত হয়েছে, আমাকে মার্য়াম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মার্য়াম।' (কিশ্তীয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮-৮৯)

এই জালিমের বক্তব্য অনুসারে প্রথমে সে মরিয়াম হলো তারপর নিজে নিজেই গর্ভবতী হলো। তারপর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মার্য়াম রূপে জন্ম গ্রহণ করলো। তার এ বক্তব্য যে কতটা বালখিল্যতা স্বরূপ, তা একটা শিশুও অনুভব করতে পারে।

ahlussunnah-bd.blogspot.com

পবিত্র হাদীসের বক্তব্য অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন, দামেশ্‌কে। দামেশ্‌ক কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত। ঈসা মসীহ হবার দাবীদার দেখলো যে, তার জন্ম যেহেতু কাদিয়ান নামক গ্রামে। আর সত্যকারের ঈসা আলাইহিস সালামের আসার কথা হাদীসে বলা হয়েছে দামেশ্‌কে। এই জালিম তখন কাদিয়ানকেই দামেশক শহর বানিয়ে ছাড়লো। সে লিখেছেঃ 'উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশ্‌ক শব্দের অর্থ আমার কাছে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশ্‌ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের স্বভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস। এই কাদিয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেশ্‌কের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রাখে।' (এযালায়ে আওহাম, ফুটনোট, ৬৩-৭৩)

এরপরও এই জালিমের সামনে সমস্যা দেখা দিল সাদা মিনারের। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ঈসা ইবনে মার্‌য়াম একটি সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এভাবে যে, প্রতারক এই লোক নিজেই তার গ্রামে একটি সাদা মিনার বানিয়ে দেখিয়েছে যে, হাদীসের বক্তব্য অনুসারে সেই হলো ঈসা মসীহ। এই ধরণের জালিমকে কে বুঝাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসার পূর্বেই দামেশ্‌কে সাদা মিনার মওজুদ থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম লিড্ডায় প্রবেশ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সম্পর্কে প্রতারক মসীহ সাহেব নানা ধরণের ভিত্তিহীন গল্প ফেঁদেছে। কখনো সে লিখেছে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম হলো লিড্ডা। (এযালায়ে আওহাম, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)

নবুওয়াদের দাবীদার এই কাদিয়ানী গোষ্ঠী ইসলাম বিরোধী অমুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়েছে এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের ঐক্য ভাঙ্গন ধরানোর জন্য তারা প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই তাদের অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। কোন কোন দেশে তারা মুসলিম নামধারী সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। অবশ্য গোটা বিশ্বের সমস্ত আলেম সম্প্রদায় এদেরকে কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কতক দেশে মুসলিম জনতার দাবীর মুখে সরকার তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের জন্য মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরা ইসলামের পরিভাষাসমূহ, ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদেরকে যেভাবে ধোকা দিচ্ছে, এর মোকাবিলায় মুসলমানগণ জিহাদী ভূমিকা গ্রহণ না করলে আল্লাহর দরবারে মুক্তি লাভের আশা করা বৃথা।

সমাপ্ত

ahlussunnah-bd.blogspot.com

ahlussunnah-bd.blogspot.com

কাসাসুল আম্বিয়া

মূল : ইমাম আব্দুল গাফুর
অনুবাদ : অধ্যক্ষ মাওলানা আল মুমিন

ISBN - 984-8666-01-X

প্রচ্ছদ
রাজু আহমেদ

শামীম পাবলিশার্স
সিকদার ম্যানশন, ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭১-৭০৬৮৯৬ ফোন : ৭১৬০২৮৮ (অনুঃ)